S118P

আমাদের পক্ষে নব-সাহিত্যের নিন্দা করা যেমন সহজ, প্রশংসা করা তেমনি কঠিন। কেননা খ্যাতনামা লেখকদের বিচার কর্‌বার অধিকার যেখানে কারও নেই, সেখানে অখ্যাতনামা লেখকদের উপরে জজ্‌ হয়ে বসবার অধিকার সকলেরি আছে। জন্মাবধি উঠতে বসতে খেতে শুতে যে বস্তুর সুখ্যাতি শুনে আসছি, সে বস্তু যে মহার্ঘ, এ বিশ্বাস অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। গুরু-জনদের তৈরী মত আমরা বিনাবাক্যে মেনে নেই, কেননা তা মেনে নেবার ভিতর মনের কোনও খাটুনি নেই। যদি আমরাই চিন্তামার্গে ক্লেশ করব তাহলে গুরুর দরকার কি? আর যদি আমরাই পূজা করব তাহলে পুরোহিতের দরকার কি? কেননা গুরুপুরোহিতেরা সমাজের হাতে-গড়া, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক labour saving machines. নব-সাহিত্যের দুর্ভাগ্যই এই যে, তা অতীতের ডিপ্লোমা নিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় না। এ সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করতে হ'লে নিজের অনুভূতি দিয়ে তা যাচাই করতে হয়, নিজের বুদ্ধি দিয়ে তা পরীক্ষা করতে হয়। আমরা ক'জনে সে পরিশ্রমটুকু করতে রাজি? সুতরাং নব-সাহিত্যের প্রশংসার চাইতে নিন্দাই যে বেশীর ভাগ শোনা যায়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কোনও কারণ নেই। এই সকল নিন্দাবাদের বিচারসূত্রেই আমরা প্রকারান্তরে নব-সাহিত্যের গুণাগুণের বিচার কর্‌তে চাই।

নব-সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অপর্য্যাপ্ত ও সস্তা, বিশেষত্বহীন ও প্রতিভাহীন, চুটকি ও নকল। আমি একে একে এই সকল অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

নব-সাহিত্যের পরিমাণ যে অপর্য্যাপ্ত তা অস্বীকার কর্‌বার যো

3964.
5.11.66
CALCUTTA-16

নেই। বর্ত্তমানে এত নিত্য নূতন পুস্তক এবং পুস্তিকা, পত্র এবং পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হচ্ছে যে, এ যুগের তুলনায় "বঙ্গদর্শনের" যুগের বঙ্গ-সরস্বতীকে বন্ধ্যা বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নামে এই অপবাদ ছিল যে, বাঙ্গালী রসনা-সর্ব্বস্ব—বিংশ শতাব্দীতে আমরা যদি কিছু হই ত রচনা-সর্ব্বস্ব। এমন কি এই নব যুগধর্ম্মের শাসনে গত যুগের অনেক পাকা বক্তারা কেঁচে আবার লেখক হয়ে উঠছেন, নইলে যে তাঁদের গাদে পড়ে থাক্‌তে হয়।

এক কথায়, আজকের দিনে বাঙ্গলার সাহিত্য-সমাজ লোকে লোকারণ্য; এবং এ জনতার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আছেন। বঙ্গসাহিত্যের মন্দিরে বঙ্গ-মহিলারা যে শুধু প্রবেশ লাভ করেছেন তা নয়, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছেন। বসেছেন বলা বোধ হয় ঠিক হল না, কারণ এস্থলে এঁরা বসে নেই, পুরুষদের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চল্‌ছেন। ইংরাজি রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে Peaceful penetration, সেই পদ্ধতি অনু-সরণ করে স্ত্রীজাতি আমাদের সাহিত্যরাজ্য ধীরে ধীরে এতটা দখল করে নিচ্ছেন যে, আমার সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয় এ রাজ্য হয়ত ক্রমে নারীরাজ্য হয়ে উঠবে। এ আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নয়, তার প্রমাণ গত মাসের "ভারতবর্ষের" প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌বেন। সাহিত্য-সমাজের এই পরদা-পার্টিতে অন্ততঃ চল্লিশ জন ভদ্রমহিলা যোগদান করে-ছিলেন। যে দেশে স্ত্রীশিক্ষা নেই, সে দেশে স্ত্রীসাহিত্যের এতটা প্রসার ও পশার বৃদ্ধির ভিতর কি একটু রহস্য নেই? এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, এই নব সাহিত্যের মূলে এমন একটি

অজ্ঞাত অবাধ্য এবং অদম্য শক্তি নিহিত আছে, যার স্ফূর্ত্তি কোনরূপ বাহ্য ঘটনার অধীন নয়? বালিকাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, উভয় স্থলেই নব সাহিত্য যে সমভাবে ও সমতেজে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হচ্ছে,—এর থেকে বোঝা উচিত যে, আমাদের জাতীয় মন কোনও নৈসর্গিক কারণে সহসা অসম্ভব রকম উর্ব্বর হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে আশার বীজ বপন করাই সঙ্গত, নিরাশার নয়ন-আসার নয়।

এস্থলে নিজের কৈফিয়ৎ স্বরূপে একটা কথা বলে রাখা আবশ্যক। কেউ মনে করবেন না যে আমি লেখিকাদের উপর কোনরূপ কটাক্ষ করে এসব কথা বলছি। কেননা—তাঁদের প্রবন্ধে এক স্বাক্ষর ব্যতীত, স্ত্রীহস্তের অপর কোনও চিহ্ন নেই। ওসব প্রবন্ধ শ্রী-স্বাক্ষরিত হলে তার থেকে মতিভ্রংশতার পরিচয় কেউ পেতেন না। এদেশে স্ত্রীপুরুষের যে কোনও প্রভেদ আছে তা বঙ্গসাহিত্য থেকে ধরবার যো নেই।

এত বেশী লোক যে এত বেশী লেখা লিখছে, তাতে আনন্দিত হবার অপর কারণও আছে। এই অজস্র রচনা এই সত্যের পরিচয় দেয় যে, বাঙ্গালীজাতি এ যুগে আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়েছে। যদি কেউ এস্থলে একথা বলেন যে, বাঙ্গালীর রচনা যে-পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে, সে-পরিমাণে কিছুই প্রকাশ করছে না—তার উত্তরে আমি বলব যে, বাঙ্গালীর জাতীয় আত্মা আজও গড়ে' ওঠেনি, এবং সে আত্মা গড়ে' তোলবার পক্ষে সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র না হলেও, একটি প্রধান উপায়। মানুষের দেহ যেমন দৈহিক ক্রিয়াগুলির চর্চ্চার সাহায্যে গড়ে' ওঠে, মানুষের

মনও তেমনি মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে গড়ে' ওঠে। জাতীয় আত্মা আবিষ্কার করবার বস্তু নয়, নির্ম্মাণ করবার বস্তু। আত্মাকে প্রকাশ কর্‌বার উদ্যম এবং প্রযত্ন থেকেই আত্মার আবির্ভাব হয়, কেননা সৃষ্টি বহির্মুখী। অবশ্য আমি তাই বলে' এ দাবী করিনে যে, আজকাল যত কথা ছাপায় উঠছে তার সকল কথাই জাতীয় মনের উপর ছাপ রেখে যাবে। "সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর"—ভারতচন্দ্রের এ উক্তি ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষে তেমনি সত্য। সুতরাং বাঙ্গালীজাতি যে অনেক বাক্য বৃথা ব্যয় করছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যে কথা বলবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না, সে কথা বলা হয়েছে' বলেই যে তা' টিঁকে যাবে, এ ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। সাহিত্য-জগৎও যোগ্যতরের উদ্বর্ত্তনের নিয়মের অধীন। কালের নির্ম্মম কবলে পড়ে' যা ক্ষীণজীবী তা অচিরে বিনাশপ্রাপ্ত হবেই হবে। তবে বহু লোকে বহু কথা বল্‌লে, অনেক সত্য কথা উক্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। নানা মুনির নানা মত থাকাটা দুঃখের বিষয় নয়; নানা মুনির মতের ঐক্যটাই সাহিত্য-সমাজে আসল দুঃখের বিষয়। কেননা সে মত যদি ভুল হয় তাহলে সাহিত্যের ষোল কড়াই কাণা হয়ে যায়। এবং মুনিদের যে মতিভ্রম হয়—এ-কথা সংস্কৃতেও লেখা আছে। এ যুগের বঙ্গ-সরস্বতী বহুভাষী হলেও যে বহুরূপী নন্‌, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। তবে আমাদের সাহিত্যের সুর যে একঘেয়ে তার কারণ আমাদের জীবন বৈচিত্র্য-হীন, এবং এই বৈচিত্র্যহীনতার চর্চ্চা আমরা একটা জাতীয় আর্ট করে তুলেছি। উদাহরণ স্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে আমাদের

বদ্ধমূল ধারণা এই যে, নানা যন্ত্র এক সুরে বেঁধে তাতে এক সুর বাজালেই ঐক্যতান হয়। আর্ট-জগতে এই অদ্বৈতবাদের হাত থেকে উদ্ধার না পেলে বঙ্গসাহিত্য মুক্তিলাভ করবে না, এবং যতদিন এ দেশে আবার নূতন চৈতন্যের আবির্ভাব না হবে, ততদিন আমরা এক কথাই একশ-বার বল্‌ব, কেননা সে কথা বলার ভিতরেও মন নেই, শোনার ভিতরেও মন নেই। তাই বলে আমাদের সকল লেখাপড়া একেবারেই অনর্থক নয়,—আমরা আর কিছু করি আর না করি, ভাবী গুণীর জন্য আসর জাগিয়ে রাখছি। পাঠক-সমাজকে ঘুমিয়ে পড়তে না দেওয়াটাও একটা কম কাজ নয়।

আমরা সদলবলে সাহিত্য তৈরি ক'রি আর না করি, সদলবলে পাঠক তৈরি কচ্ছি।

পূর্ব্বে যা বলা গেল, তা অবশ্য সকলের সমান মনঃপূত হবে না, কিন্তু এ কথা আপনারা সকলেই স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে, যে ক্ষেত্রে লেখকের সংখ্যা অগণ্য, সে ক্ষেত্রে কোনও লেখক-এরণ্ড সাহিত্য-দ্রুম স্বরূপে গ্রাহ্য হবেন না,—এ বড় কম লাভের কথা নয়। হাজার অপ্রিয় হলেও একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের কোন কো্ন এরণ্ড এমন মহাবোধিবৃক্ষত্ব লাভ করেছিলেন যে, অদ্যাবধি বঙ্গ-সাহিত্যের পুবোনো পাণ্ডারা তাঁদের গায়ে সিঁদুর লেপে অপরকে পূজা কর্‌তে বলেন। অমুকে কি লিখেছেন কেউ না জানলেও, তিনি যে একজন বড় লেখক তা সকলেই জানেন—এমন প্রথিত-যশঃ প্রবীণ সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে বিরল নয়।

এ সাহিত্যের বিরুদ্ধে চুটকিত্বের যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সে অপবাদের সত্যাসত্য একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ছোট গল্প, খণ্ড-কবিতা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, এবং প্রক্ষিপ্ত দর্শনই এ সাহিত্যের প্রধান সম্বল। সমালোচকদের মতে এই কৃশতাই হচ্ছে এ সাহিত্যের দুর্ব্বলতার লক্ষণ। বিংশ শতাব্দীতে যে কোনও নূতন মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার কিম্বা শকুন্তলা-তত্ত্ব লেখা হয় নি, এ কথা সত্য। এ যুগের কবিদের বাহু যে আজানুলম্বিত নয়, তার জন্য আমাদের লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই। বধ এবং সংহার ছাড়া কাব্যের যে অপর কোনও কর্ত্তব্য নেই, একথা একালে মানা কঠিন। আর যদি এ কথা সত্য হয় যে মার্‌কাট্ ব্যাপার না থাকলে কাব্য মহাকাব্য হয় না—তাহলে বল্‌তে হয় যে, সাহিত্য-জগতের এমন কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই, যার দরুন যুগে যুগে সকলকে শুধু মহাকাব্যই লিখ্‌তে হবে। Paradise Lost-এর পরে ইংরাজি ভাষায় আর দ্বিতীয় মহাকাব্য লেখা হয় নি, এবং ফরাসী ভাষায় ও-শ্রেণীর কাব্য কস্মিনকালেও রচিত হয় নি, তাই বলে ফরাসী সাহিত্য এবং মিল্‌টনের পরবর্ত্তী ইংরাজি সাহিত্যের যে কোনরূপ গৌরব নেই, একথা বলবার দুঃসাহস, কোনও পাশ্চাত্য সমালোচক তাঁদের রক্তমাংসের শরীরে ধারণ করেন না।

তারপর আমরা যে শকুন্তলার চাইতে দ্বিগুণ বড় শকুন্তলা-তত্ত্ব রচনা করিনে, তার জন্য আমাদের কাছে পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তত্ত্ব হচ্ছে বস্তুর সার—অতএব সংক্ষিপ্ত। এ বিশ্বটি এত বিরাট যে, তাকে সচরাচর অনন্ত

ও অসীম বলা হয়ে থাকে, অথচ তাত্ত্বিকেরা বিশ্বতত্ত্ব দুচারটি ক্ষীণ সূত্রেই আবদ্ধ করে থাকেন। সুতরাং আমরা কোনও দৃষ্ট পদার্থের বিষয় দুশ'-হাত তত্ত্বজাল বুনতে সাহসী হইনে, অন্ততঃ কোনও কাব্য-রত্নকে সে জালে জড়াতে চাইনে। কাব্যের আগুনের পরিচয় দেবার জন্য তাকে সমালোচনার ছাই চাপা দেওয়াটা সুবিবেচনার কার্য্য নয়—কেননা সে গুণের পরিচায়ক হচ্ছে অনুভূতি।

এ যুগের রচনার নাতিদীর্ঘতা এই সত্যেরই প্রমাণ দেয় যে, এ কালের লেখকেরা পাঠকদের মান্য করতে শিখেছেন।—হিন্দুস্থানীরা বলেন যে "আক্কেলিকো ইসারা বাস্"। যাঁদের শ্রোতার আক্কেলের উপর কোনও আস্থা নেই, তাঁরাই একটুখানি কথাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে অনেকখানি করে' তুলতে ব্যস্ত।

সমালোচকদের মতে বর্ত্তমানের আর-একটি অপরাধ এই যে, এ যুগে এমন কোনও লেখক জন্মগ্রহণ করেন নি, যাঁর প্রতিভায় দেশ উজ্জ্বল করে রেখেছে। এ আমাদের দুর্ভাগ্য, দোষ নয়; প্রতিভার জন্মের রহস্য কোনও দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক অদ্যাবধি উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। তবে এটুকু আমরা জানি যে, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য চাই। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, নূতন সাহিত্য গড়বার যে সুযোগ গত শতাব্দীর লেখকেরা পেয়েছিলেন—সে সুযোগ আমরা অনেকটা হারিয়েছি।

গত যুগের লেখকেরা সবাই প্রধান না হোন,—সবাই স্বাধীন ছিলেন। তৎপূর্ব্ব-যুগের বঙ্গ-সাহিত্যের চাপের ভিতর থেকে

তাঁদের তেড়ে-ফুঁড়ে উঠতে হয়নি। একটি সম্পূর্ণ নূতন এবং অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যশালী সাহিত্যের সংস্পর্শেই উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য জন্মলাভ করে। সে সাহিত্যের উপর প্রাক্‌ব্রিটিশযুগের বঙ্গসাহিত্যের কোনরূপ প্রভুত্ব ছিল না। অন্নদা-মঙ্গলের ভাষা ও ছন্দের কোনরূপ খাতির রাখলে মাইকেল মেঘনাদবধ রচনা করতেন না, এবং বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনীর কোনরূপ খাতির রাখলে, বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী রচনা করতেন না। Milton এবং Scott যাঁদের গুরু—তাঁদের কাছে ভারতচন্দ্রের ঘেঁসবার অধিকার ছিল না।

কিন্তু আজকের দিনে ইংরাজি সাহিত্য আমাদের কাছে এতটা পরিচিত এবং গা-সওয়া হয়ে এসেছে যে, তার থেকে আমরা আর বিশেষ কোনও নূতন উদ্দীপনা কিম্বা উত্তেজনা লাভ করিনে। আমাদের মনে ইংরাজি সাহিত্যের প্রথম পরিচয়ের চমক্ ভেঙ্গেছে, কিন্তু বিশেষ পরিচয়ের প্রভাব স্থান পায়নি। সুতরাং আমরা গত-যুগের সাহিত্যেরই জের টেনে আস্‌ছি। আমাদের পক্ষে তাই নতুন কিছু করা একরকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিভাশালী লেখকের সাক্ষাৎ আমরা সেই যুগে পাই, যে যুগে একটা নূতন এবং প্রবল ভাবের প্রবাহ, হয় ভিতর থেকে ওঠে, নয় বাইরে থেকে আসে। গত যুগে যে ভাবের জোয়ার বাইরে থেকে এসেছিল, এ যুগে তার তোড় এত কমে এসেছে যে, ভাটা সুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। এদিকে ভিতর থেকেও একটা নূতন কোনও ভাবের উৎস খুলে যায়নি। বরং সমাজের মনের টান আজ পুরাতনের দিকে—এও ত ভাবের প্রবাহের

ভাটার অন্যতম লক্ষণ। এই ভাটার মুখে নতুন কিছু করতে হলে, কালের স্রোতের উজান বইতে হয়—তা করা সহজ নয়। এ অবস্থায় যা করা সহজ তা হচ্ছে সনাতন জ্যাঠামি। সুতরাং নব সাহিত্যকে বিশেষত্বহীন এবং প্রতিভাহীন বলায়, সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় না। আরও বিপদের কথা এই যে, আমরা উভয় সঙ্কটে পড়েছি। কেননা, যদি আমরা গত-শতাব্দীর সাহিত্যের অনুসরণ করি, তাহলে সমালোচকদের মতে আমরা নকল-সাহিত্য রচনা করি—আর যদি অনুকরণ না করি, তাহলে পূর্ব্বোক্ত মতে আমরা কাব্যের উচ্চ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হই। অথচ আসল ঘটনা এই যে, নবযুগ কতক অংশে পূর্ব্ব যুগের অধীন, এবং কতক অংশে স্বাধীন। এই কারণে নবীন সাহিত্যিকেরা গতযুগের সাহিত্যের কোন কোন অংশের অনুকরণ করতে অক্ষম, এবং কোন কোন অংশের অনুসরণ করতে বাধ্য। একালে যে মেঘনাদবধ কিম্বা দুর্গেশনন্দিনীর অনুকরণে গদ্য এবং পদ্য কাব্য রচিত হয় না, তার কারণ, বাঙ্গালী জাতির মনের কলে Scott, Milton, Mill ও Comte-এর চাবির দম ফুরিয়ে এসেছে।—অপর পক্ষে বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিবিস্তৃত এবং অপ্রতিহত, তা অস্বীকার করবার যোও নেই, প্রয়োজনও নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ বলে যে, সে সাহিত্যের কোনও মূল্য কিম্বা মর্য্যাদা নেই, এ কথায় শুধু স্থূলদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়। সুতরাং নব-সাহিত্যকে নকল-সাহিত্য বলার কি সার্থকতা আছে, তাও একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, পরের লেখার অনুকরণ

কিম্বা অনুসরণ করে সাহিত্য রচনা করা যায় না। এ কথাটা ষোল-আনা সত্য নয়। ও উপায়ে অবশ্য কালিদাস হওয়া যায় না, কিন্তু শ্রীহর্ষ হওয়া যায়। "রত্নাবলী" মালবিকাগ্নিমিত্রের ছাঁচে ঢালা, অথচ সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি উপাদেয় নাটক। পৃথিবীর মহাপ্রাণ কবিদের স্পর্শে বহু লেখক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন, এবং এই কারণেই তাঁদের অবলম্বন করেই সাহিত্যের নানা school গড়ে' ওঠে। ফরাসী এবং জর্ম্মান সাহিত্যে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গেটের আনুগত্য স্বীকার করাতে শিলারের প্রতিভার হ্রাস হয় নি। Victor Hugo-র পদাঙ্ক অনুসরণ করে Musset অ-কবির দেশে গিয়ে পড়েন নি। এবং Flaubert-এর কাছে শিক্ষানবিশী করার দরুণ Guy de Maupassant-র গল্প সাহিত্য-সমাজে উপেক্ষিত হয় নি। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যেও এরূপ ঘটনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যাকে আমরা বৈষ্ণব কবিতা বলি, তা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুকরণেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে, জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস লোচনদাস অনন্তদাসের রচনার যে কোন মূল্য নেই, এ কথা কোনও সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না। আর যদি এ কথা সত্য হয় যে, পর-সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্য গঠিত হয় না—তাহলে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় সাহিত্য রচিত হয় নি,—কেননা, গত-শতাব্দীর মধ্যযুগের গল্প এবং উপন্যাস, কাব্য এবং মহাকাব্য, সবই যে সাহিত্যের অনুকরণে রচিত হয়েছিল, সে সাহিত্য আমাদের নিতান্তই পর। তা অপর দেশের, অপর জাতের, অপর ভাষায় লিখিত। এ সত্বেও আমরা গতযুগের এই আহেলা

বিলাতী সাহিত্যকে বাঙ্গলা-সাহিত্য বলে আদর করি। তার কারণ এই যে, যে সাহিত্য উপর-সাহিত্য, তা অপরই হোক্ আর আপনই হোক, মানব-মনের উপর তার প্রভাব অনিবার্য্য।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে এবং অনুসরণে যে কাব্য-সাহিত্য রচিত হয়েছে, তা নকল সাহিত্য বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

এই নব-কবিদের রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ সকল রচনা, ভাষার পারিপাট্যে এবং আকারের পরিচ্ছিন্নতায়, পূর্ব্বযুগের কবিতার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। যেমন কেবলমাত্র মনের আনন্দে গান গাইলে তা সঙ্গীত হয় না, তেমনি কেবলমাত্র মনের আবেগে স্বচ্ছন্দে লিখে গেলেও, তা কবিতা হয় না। মনের ভাবকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতার নামই রচনা-শক্তি। মনের ভাবকে গড়ে' না তুলতে পার্‌লে তা মূর্ত্তি-ধারণ করে না, আর যার মূর্ত্তি নেই তা অপরের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হতে পারে না। কবিতা শব্দকায়। ছন্দ মিল ইত্যাদির গুণেই সে কায়ার রূপ ফুটে ওঠে। মনোভাবকে তার অনুরূপ দেহ দিতে হলে, শব্দজ্ঞান থাকা চাই, ছন্দমিলের কাণ থাকা চাই। এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য সাধনা চাই, কেননা সাধনা ব্যতীত কোন আর্টে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না। নব-কবিরা যে সে সাধনা করে থাকেন, তার কারণ এ ধারণা তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে যে, লেখা জিনিষটে একটা আর্ট। নবীন কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের কবিতাবলী কিম্বা নবীনচন্দ্রের "অবকাশরঞ্জনী"র তুলনা করলে, নবযুগের কবিতা পূর্ব্বযুগের কবিতার অপেক্ষা আর্ট-অংশে

যে কত শ্রেষ্ঠ, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। শব্দের সম্পদে এবং সৌন্দর্য্যে, গঠনের সৌষ্ঠবে এবং সুষমায়, ছন্দে ও মিলে, তালে ও মানে, এ শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যের ইভলিউসানের একধাপ উপরে উঠে গেছে। এ স্থলে হয় ত পূর্ব্বপক্ষ এই আপত্তি উত্থাপন করবেন যে, ভাবের অভাব থেকেই ভাষার এই সব কারিগরি জন্মলাভ করে। যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য্য নেই, তার যে আত্মার ঐশ্বর্য্য আছে,—এ কথা আমি স্বীকার করতে পারিনে। এলোমেলো ঢিলেঢালা ভাষার অন্তরে ভাবের দিব্যমুর্ত্তি দেখবার মত অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই। প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি ও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি একরূপ নয়। ভাব যে কাব্যের আত্মা, এবং ভাষা তার দেহ,—একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাব্যের দেহ থেকে আত্মা পৃথক করা অসম্ভব বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কোথায় দেহের শেষ হয় এবং আত্মার সূত্রপাত হয়, সে সন্ধান কোনও দার্শনিকের জানা নেই। যাঁর রসজ্ঞান আছে তাঁর কাছে এ সব তর্কের কোনও মূল্য নেই। কবিতা-রচনার আর্ট নবীন কবিদের অনেকটা করায়ত্ত হয়েছে—এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁদের লজ্জা পাবার কোনও কারণ নেই। ভারতচন্দ্র মালিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে, এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।" স্বয়ং ভারতচন্দ্রের কবিতার যদি ঠাট্ বাদ দেওয়া যায়, তাহলে যে গুঁড়া অবশিষ্ট থাকে তাতে ফোঁটা দেওয়াও চলে না, কেননা সে গুঁড়া চন্দনের নয়। অথচ ভারতচন্দ্র যে কবি, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। নবীন কবিদের যে ভাব-সম্পদ নেই, একথা বলায় আমার

বিশ্বাস, কেবলমাত্র অন্যমনস্কতার পরিচয় দেওয়া হয়। মহাকবি ভাস বলেছেন যে পৃথিবীতে ভাল কাজ করবার লোক সুলভ, চেনবার লোকই দুর্ল্লভ।

মহাকাব্যের দিন যে চলে গেছে, তার প্রমাণ বর্ত্তমান ইউরোপেও পাওয়া যায়। সে দেশে কবিতা আজও লেখা হয়ে থাকে, কিন্তু হাতে-বহরে সে সবই ছোট। ফরাসী দেশের বিখ্যাত লেখক আঁদ্রে গীদ্ বলেন যে, গীতাঞ্জলি মুষ্টিমেয় না হলে বর্ত্তমান ইউরোপ তা করযোড়ে গ্রহণ করত না। তাঁর ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষে রামায়ণ মহাভারতের চাইতে ছোট কিছু লেখা হয়নি এবং হতে পারে না। এ কথা অবশ্য সত্য নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন একদিকে রামায়ণ মহাভারত আছে, অপরদিকে তেমনি দু-লাইন চার লাইন কবিতারও ছড়াছড়ি। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যা ছিল না, সে হচ্ছে এ দুয়ের মাঝামাঝি কোনও পদার্থ। এ কালে আমরা যে ব্যাস বাল্মীকির অনুকরণ না করে, অমরু, ভর্ত্তৃহরির অনুসরণ করি, সে যুগধর্ম্মের প্রভাবে। যে কারণে ইউরোপে আর মহাকাব্য লেখা হয় না, সেই একই কারণে এ দেশেও মহাকাব্য লেখা স্থগিত রয়েছে। এ যুগের কবিতা হচ্ছে হৃদয়ের স্বগতোক্তি, সুতরাং সে উক্তি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের চাইতে দীর্ঘ হতে পারে না। কিন্তু একালে গল্প আমরা গদ্যে বলি, কেননা আমরা আবিষ্কার করেছি যে দুনিয়ার কথা দুনিয়ার লোকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য গদ্যের পথই প্রশস্ত। সুতরাং গল্পের উত্তরোত্তর দেহ সঙ্কুচিত হওয়াটা ক্রমোন্নতির লক্ষণ নয়। ইউরোপে আজও গদ্যে এমন এমন নভেল লেখা হয়ে থাকে, যা আকারে মহাভারতের

সমান না হলেও, রামায়ণের তুল্যমুল্য। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নভেলিষ্ট Tolstoy-র এক একখানি নভেল এক একখানি মহাকাব্য বিশেষ। ও-দেশের গদ্য-সাহিত্যে যেমন একদিকে ব্যাস বাল্মীকি আছে, অপর দিকে তেমনি অমরু ভর্তৃহরিরও অভাব নেই। যে ক্ষেত্রে হাজার হাজার পাতার দুচারটি গল্প জন্মলাভ করছে—সেই ক্ষেত্রেই আবার দু পাতা চার পাতার হাজার হাজার গল্প জন্মলাভ করছে—এতেই পরিচয় দেয় যে, ইউরোপের মনের ক্ষেত্র কত সরস, কত সতেজ, কত উর্ব্বর। সুতরাং আমাদের নব গদ্য-সাহিত্যে যে ছোট গল্প ছাড়া আর কিছু গজায় না, তাতে অবশ্য এ সাহিত্যের দৈন্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু এ দীনতা ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় যতটা ধরা পড়ে, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যের তুলনায় ততটা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, গত যুগের গল্প-সাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্রের "কণ্ঠমালা" এবং তারক গাঙ্গুলির "স্বর্ণলতা" ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এ যুগের গল্প-লেখকেরা যে সাধারণতঃ ছোট গল্প রচনার পক্ষপাতী তার কারণ এই যে, আমাদের জীবন ও মন এতই বৈচিত্র্যহীন, এবং সে মনে ও সে জীবনে ঘটনা এত অল্পই ঘটে, এবং যা ঘটে তাও এতটা বিশেষত্বহীন যে, তার থেকে কোনও বিরাট-কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করা যায় না। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে Anna Karenina কিম্বা Les Miserables গড়তে বসায় বাচালতার পরিচয় দেওয়া হয়—প্রতিভার নয়।

এ সমাজে যা পাওয়া যায়, এবং সম্ভবতঃ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সে হচ্ছে ছোট গল্পের খোরাক। আমাদের জীবনের

রঙ্গভূমি যতই সঙ্কীর্ণ হোক্ না কেন, তারই মধ্যে হাসি-কান্নার অভিনয় নিত্য চল্‌ছে, কেননা আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করেও নিজেদের মানুষ ছাড়া অপর কোনও শ্রেণীর জীবে পরিণত করতে পারি নি। ভয় আশা, উদ্যম নৈরাশ্য, ভক্তি ঘৃণা, মমতা নিষ্ঠুরতা, ভালবাসা দ্বেষহিংসা, বীরত্ব কাপুরুষতা, এক-কথায় যা নিয়ে এই মানবজীবন—তা miniature-য়ে এ সমাজে সবই মেলে। সুতরাং যখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের গল্প-সাহিত্যের এই নূতন পথটি খুলে দিলেন, তখন আমরা দলে দলে সোৎসাহে সেই পথে এসে পড়লুম। এ অবশ্য আপশোষের কথা নয়। এবং এর জন্যও দুঃখ করবার দরকার নেই যে, এ পথে এখন এমন বহুলোক দেখা যায়, যাদের কাজ হচ্ছে শুধু সে পথের ভিড় বাড়ানো। কি ধর্ম্মে, কি সাহিত্যে, কোনও মহাজন-কর্ত্তৃক একটি নূতন পন্থা অবলম্বিত হলে, সেখানে চিরদিনই এমনি জনসমাগম হয়ে থাকে, তার মধ্যে দুচারজন শুধু এগিয়ে যান। এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, সে পথ বিপথ,—কিন্তু এই প্রমাণ হয় যে, বেশির ভাগ লোক দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। Many are called but few are chosen—বাইবেলের এ কথা হচ্ছে এ সম্বন্ধে শেষ কথা। এ যুগে কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী উপন্যাসকার না থাকলেও এমন অনেক গল্প লেখা হয়ে থাকে যা গত-শতাব্দীর কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের কলম হতে বেরত না। সুতরাং নব-সাহিত্যে যদি chosen few থাকেন, তাহলে আমাদের ভগ্নোদ্যম হবার কারণ নেই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অভিনবের ডায়ারী

রসের অলৌকিকত্ব

দিঙ্নাগ বল্লেন যে, আজকাল ব্যাপার বড় গুরুতর হয়ে উঠেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণ সমস্ত রসাতল যাবার জোগাড় হয়েছে। কিছু ভাল লাগলেই লোকে বলে, আহা কি আনন্দ! কবি যখন কাব্য লেখেন, তিনি বলেন "আমার আনন্দে আমি লিখ্‌ছি, এ আমার লেখা, এ আমার লীলা।" একটা কাব্য ভাল কি মন্দ তার বিচার করতে গিয়ে লোকে বলে, "এটা এমন ভাল লাগ্‌ছে, এটাতে আমরা এত আনন্দ পাচ্ছি, এটা খুব একটা উঁচুদরের কাব্য।" শুধু ভাল লাগার দ্বারা কাব্যের বিচার করতে হবে—এও ত বড় বিপদের কথা হয়ে দাঁড়াল! ভাল লাগার পিছনে, ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট অনেক কারণ রয়েছে। সে সমস্ত কারণের অনুসন্ধান না করে', শুধু ভাল লাগে বলেই কোন কবিতাকে শ্রেষ্ঠ, আর ভাল লাগে না বলেই কোন কবিতাকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। আমার যেটা ভাল লাগে, তোমার সেটা ভাল লাগে না। তোমার যেটা ভাল লাগে, আর একজনের হয় ত সেটা ভাল লাগে না। এ ত এক এক জায়গায় এক এক রকম। ভাললাগার ত কোন একটা মাপ-কাঠি নেই, যার দ্বারা কাব্যের ভালমন্দ বিচার করা চল্‌তে পারে। তর্কের ভূমিতে সেই ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া আর একটা প্রামাণ্যের অস্তিত্ব মান্‌তেই হবে। আনন্দ অনেক

রকমই হতে পারে। কবিতা পড়ে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, তেমনি আবার রসগোল্লা খেয়েও ত আনন্দ পাওয়া যায়। তারপর এক বিষয়ে যখন দশজন আনন্দ পায়, তখন তাদের সকলের আনন্দ কিছু সমান হতে পারে না। আনন্দ পাওয়া, ভাললাগা—এ ত মানুষের ব্যক্তিগত ভাব, তা' দিয়ে কখনও কোন সাহিত্যের বিচার চল্‌তে পারে না। গোড়ায় একটা আনন্দ বস্তু আছে, সেটা সকলের মধ্যেই এক; তারি ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভাললাগা, মন্দলাগার সৃষ্টি হয়। কোন রচনার ভালমন্দ বিচার করতে হলে এই আনন্দ বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার ভালমন্দ বিচার করতে হবে। রসগোল্লা খেতে যে ভাল লাগে, তাকেও ত তাহলে আনন্দ বলা চলে,—এবং সে আনন্দের সঙ্গে কাব্যের আনন্দের তফাৎই বা থাকে কোনখানে? কাব্যের ভাললাগাকে আনন্দ আনন্দ বলে' সকলে যে তাকে একেবারে কুলীন করে তুলেছেন, এটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি।

দেশজ টানে দিঙ্নাগ যখন এক-নিঃশ্বাসে এই পর্য্যন্ত বলে' থাম্‌লেন, তখন ভট্টনায়ক তার কথায় আপত্তি করে উঠ্‌লেন। ভট্টনায়কের মুখখানি একেবারে মুণ্ডিত, দাড়ি গোঁফের চিহ্ন নাই; নাকটা বেশ উঁচু, বড় বড় দুটো চোখ প্রতিভায় জ্বলজ্বল্ করছে। যে বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন, তার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে যায়, অথচ তাঁর কথার ভিতর একটু দার্শনিকতার ঝাঁজও আছে। তিনি বল্লেন,—আপনি এ কি বল্‌চেন। কাব্যে যাকে লোকে বলে "ভাললাগা" সেটা ত রস, সেটাকে ত লোকে চিরকালই আনন্দময় বলে' থাকে। রস স্বগুণেই চিরকাল শ্রেষ্ঠ

3764
5.11.66

কুলীন হয়ে রয়েছে। এ কৌলীন্যে আধুনিকতার গন্ধ বিন্দুমাত্রও নাই। রসও যা' আনন্দও তা'। মনের ভাব উদ্রিক্ত হয়ে যখন একটা প্রকাশময়, আনন্দময় চেতনার মধ্যে আত্মার বিশ্রাম ঘটিয়ে দেয়, তাকেই বলা যায় আনন্দ, তাকেই বলা যায় রস। রস বা আনন্দকে যখন আমরা একটা চল্‌তি ডাকনাম দিতে চাই, তখন তাকে বলি "ভাললাগা"।

ভট্টনায়কের এই কথা শুনে দিঙ্নাগ একটু মুচ্‌কি হেসে বল্লেন, "আমার বুদ্ধিটা কিছু মোটা। আমরা যে সত্যকে আঁকড়ে ধরি তাকে একটু মোটা রকমেই ধরি, আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের এমন শক্তি নেই যে তার সাহায্যে আমরা কোন বস্তুকে চিনে নিতে পারি। তাই আপনাদের ও-সমস্ত হেঁয়ালীর কথা আমরা বুঝতে পারি না। আমরা যেটা পাই সেটা হাতে হাতে পাই। কৌলীন্য ও অকৌলীন্যের উপমার ছায়ায় আশ্রয় নিলে ত কোন লাভ নেই। দেখতে হবে যে "ভাললাগা" জিনিসটা এক রকম ছাড়া দুরকম হতে পারে কিনা? একবার যদি বল্লেন "ভাললাগা", তবে তার মধ্যে অন্য কোনরকমের ভেদ ত আনবার জো নেই। পেটুকের মিষ্টান্ন ভাল লাগে, কৃপণের ধন ভাল লাগে, দাতার দান ভাল লাগে,—এ সবই ত ভাললাগা। ভাললাগা হিসাবে ত এদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কারণ ভাললাগা ত একটা জিনিস, তার মধ্যে তোমরা পার্থক্য আন্‌বে কোনখান থেকে? তবে যে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়, সেটা বস্তুর পার্থক্য। "ভাললাগার" বস্তুর পার্থক্য অনুসারে ভাললাগার পার্থক্য দেখ্‌তে পাই। কিন্তু ভাললাগার মধ্যে

ভাললাগার কোন পার্থক্য নেই। আর যদি কোন ভেদ থাক্‌ত, তবু তা দেখ্‌বার কারও কোন সাধ্য ছিল না, কারণ ভাললাগা মন্দলাগা ত যার তার ব্যক্তিগত; তার ত কোন একটা সামাজিক মানদণ্ড থাক্‌তে পারে না। কাজেই ভাললাগার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করতে গেলে সেটা তার বিষয়কে অবলম্বন করেই করতে হবে।

ভট্টনায়ক উত্তর করলেন, "দেখুন দিঙ্নাগবাবু, যে ভুলটা সকলে সাধারণতঃ করে' থাকে, সেটা আপনিও করেছেন দেখ্‌ছি! কাব্যনাটকের যে রস বা আনন্দ সেটাকে "ভাললাগা" বল্লে এই দোষ হয় যে, লোকে অন্য পাঁচরকম ভাললাগার সঙ্গে সেটাকে ঘুলিয়ে ফেলে একটা মহা গণ্ডগোল বাধিয়ে দেয়। আনন্দ বল্লেই বা রক্ষা কোথায়? কারণ কাব্যের আনন্দটাকে যেমন অপভ্রষ্টভাবে অনেক সময় ভাললাগা বলা হয়ে থাকে, তেমনি ইন্দ্রিয়জ "ভাললাগা"কেও আনন্দ নাম দিয়ে আমরা অনেক সময়ে তার মান বাড়িয়ে দিয়ে থাকি, অথচ এই লৌকিক আনন্দ বা ভাললাগা, আর কাব্যের আনন্দ বা "ভাললাগা"—এ দুয়ের মধ্যে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। কাজেই গোড়াকার সেই কথাটা ঠিক না হয়ে গেলে, এ বিষয়ে আমরা যতই তর্ক করি না কেন, কোনও মীমাংসা হবে না,—শুধু ভাগাসিদ্ধি বা Fallacy of Four terms হয়ে যাবে।

ভট্টনায়কের কথা শেষ হতে না হতেই রুদ্রটবাবু বলে' উঠ্‌লেন যে, "এদিক ওদিক করে' কথা কইলে ত চল্‌বে না, যে কথাটা উঠেছে সেইটার উত্তর দিন। ভাললাগার মধ্যে

আপনারা কেমন করে' ভেদ দেখাতে পারেন, সেটা একবার বুঝিয়ে দিন ত দেখি।" মেঘ্‌লা দিনের গুমট্‌ গরমের মধ্যে দ্বিপ্রহরের মত তার মুখের দীপ্তিতে একটা তাপও ছিল চাপও ছিল, কিন্তু কোন স্নিগ্ধতা ছিল না। প্রচুর পুঁথির চাপে তার মুখখানাকে যেন একটা পিরামিডের মত নিরেট্‌ করে তুলেছিল।

ভট্টনায়ক বল্লেন যে, "হাঁ তাই ত, আমি ত এই বল্‌তেই যাচ্ছিলাম যে, সাধারণতঃ যাকে ইন্দ্রিয়জ "ভাললাগা" বলা যায়, তার মধ্যে কোন বিশেষ তফাৎ নেই—সে কথা ঠিক। রসগোল্লা খেতে ভাললাগাও যা', আর পোলাও খেতে ভাল-লাগাও তা'। অর্থাৎ শুধু ভাললাগার দিক্‌ থেকে দেখ্‌তে গেলে, এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই, কাজেই তাদের মধ্যে পরস্পরের যে প্রভেদ সেটা কেবল বিষয়ের প্রভেদ। এই ইন্দ্রিয়জ "ভাললাগা" বা ভোগের বিচার করতে গেলেই আমরা তার বস্তুর বিচার করে থাকি। এই ইন্দ্রিয়জ ভোগের দ্বারা আমরা জগতের সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপন করি, এবং তাই নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করি।

কাজেই এই ইন্দ্রিয়জ ভোগ সর্ব্বদাই বহির্মুখী। সেখানে শুধু ভাললাগাতেই বিশ্রাম নেই, ভাললাগার বস্তুটি কাছে রাখা চাই, পাওয়া চাই, আপনার' করা চাই। এক বস্তু এক সময়ে দশজনের কাছে থাকতে পারে না। কাজেই এই ভাললাগার বস্তু নিয়ে লোকের মধ্যে পরস্পর বিরোধ বেধে যায়। কাজেই এখানে প্রত্যেকের ভাললাগার জিনিসগুলিকে তার আয়ত্তাধীন

করবার জন্য, কোন্‌খানে ভাললাগা উচিত কোন্‌খানে উচিত নয়, তার একটা সীমা স্থির করবার দরকার হয়। এবং এই বস্তুবিচারই "ভাললাগার" ভালমন্দর মাপকাঠি হয়।

ভাললাগার সঙ্গে বস্তু এত মাখামাখি হয়ে রয়েছে যে, বস্তু বাদ দিলে ভাললাগা ধ্বংস হয়ে যায়। এই ভাললাগাটি বজায় রাখবার জন্য, তার আশ্রয়-বস্তুগুলিকে পরস্পরের মধ্যে আপোষে ভাগাভাগি করে' দেবার জন্য নিয়মের দরকার। এই নিয়মের উপরেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এটা একদিকে যেমন বিধি-নিষেধ বা Morality-র ক্ষেত্র, অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্রসংযম বা State-এর ক্ষেত্র, ধর্ম্ম বা Law-এর ক্ষেত্র। এখানে ভাললাগা মন্দলাগা বা ব্যক্তিগত অনুভূতি দ্বারা কাজের ভালমন্দের বিচার হয় না। ভালমন্দর মাপকাঠি এস্থলে স্বতন্ত্র। কাব্য সম্বন্ধে ত এ কথা বলা চলে না, কারণ এ রাজ্যে ত বস্তুর হুড়াহুড়ি নেই; সেখানে বিশ্রাম হচ্ছে আনন্দে, রসে, মাধুর্য্যে—"সত্ত্বোদ্রেক প্রকাশানন্দময় সংবিদ বিশ্রান্তি সতত্ত্বেন ভোগেন ভুজ্যতে",—এটা একটা আনন্দময়, রসময়, প্রকাশময় বিশ্রাম। কাব্যের রস উপভোগে কারও সহিত কারও কোন দ্বন্দ্ব হতে পারে না, কারণ এ রসের মধ্যেই রসের বিশ্রাম,—বস্তু নিয়ে ত এখানে মারামারি নেই।

কাজেই অন্য বিষয় সম্বন্ধে ভালমন্দ বল্লে যা বুঝা যায়, এখানে ভালমন্দ বল্লে তা বুঝা যায় না।

রুদ্রট। "আপনি কি বলতে চান যে, কাব্যরসের জন্য কোনও বস্তুর দরকার হয় না? এ ত বড় অদ্ভুত কথা বলে'

মনে হচ্ছে। আমরা ত জানি যে অন্য আর পাঁচটা শাস্ত্রে যে সমস্ত বিষয়ের কথা বলা হয়, কাব্যের বিষয়ও তাই। অন্য পাঁচটা শাস্ত্র যেমন বস্তুগত, কাব্যও তেমনি। তবে তফাৎ এই যে, কাব্য সেই কথাগুলিই একটু সরস করে' বলে। শব্দ আর অর্থ নিয়েই ত কাব্য;—বস্তু ছাড়া শব্দও হয় না, অর্থও হয় না। কাজেই বস্তুর সঙ্গে ও কাব্যের সঙ্গে যে সম্পর্ক, সেটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাকে কোন রকমে এড়ান যায় না, তাই অস্বীকার করাও চলে না। এই দেখুন না, অমুকের কবিত্বশক্তি আছে বল্লে আমরা কি বুঝি? না, তার মনে নানারকমের বিষয় বা বস্তু উদয় হয়। আর সেগুলি প্রকাশ করবার মত শব্দ তার চট্‌পট্‌ মনে পড়ে। কাজেই অন্য শাস্ত্রের সঙ্গে কাব্যের যে বড় বেশী একটা তফাৎ আছে, তা নয়। তবে হাঁ, আপনি বল্‌তে পারেন যে, কাব্যে যেটুকু বলা হয়, সেটুকু বেশ সরস করে বলা হয়। এ ছাড়া কাব্য সম্বন্ধে আর অন্য কোনরকম দাবীই আপনারা কর্‌তে পারেন না।

ভট্টনায়ক। বেশ ত, আপনার কথা না হয় মেনে নেওয়া গেল, তাতে আমি কিছু ক্ষতি দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। আপনি বল্‌ছেন যে, অন্য শাস্ত্রের সঙ্গে কাব্যের এইটুকু মাত্র তফাৎ যে, কাব্যের মধ্যে রস আছে। আমিও ত ঠিক সেই কথা বল্‌ছি যে, রস থাক্‌লেই বলব কাব্য, নৈলে শুধু শব্দার্থ যতই চমৎকার হোক্ না কেন, তাকে কখনও কাব্য বলব না। শব্দার্থকে কাব্যের শরীর বলুন, তাতে আমার আপত্তি নেই,—তবে তার প্রাণ হচ্ছে রস। শরীর ছাড়া প্রাণের অভিব্যক্তি দেখ্‌তে পাই না বটে,

তাই বলে' শরীর এবং প্রাণ একই জিনিস, একথা বল্‌তে পারি নে। প্রাণ না থাকলে শরীর একটা পাঞ্চভৌতিক বিকার। সেটা খুব মোটারকমের বস্তু সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে' একথা বলা চল্‌বে না যে, বস্তু থেকে রস হয়েছে, শরীর থেকে প্রাণ হয়েছে। প্রাণ যেমন শরীরের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে, রসও তেমনি শব্দার্থের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে। প্রাণ যেমন নিজের বলে নিজের উপযোগী দেহ নির্ম্মাণ করেছে, তেমনি রসও তার আপন উচ্ছ্বাসে আপনার উপযোগী শব্দার্থের সৃষ্টি করে,—এবং তারই অবলম্বনে আপনাকে প্রকাশ করে থাকে। যেমন প্রাণের আনন্দ থেকে অনন্তজীবদেহের সৃষ্টি হয়, তেমনি কবির আনন্দ বা রস থেকে কাব্যকুঞ্জের বিচিত্রলীলার সৃষ্টি হয়। প্রাণের মধ্যে যেমন প্রাণের আর কোন দেহ নেই, তেমনি রসের মধ্যেও রসের আর কোন দ্বিতীয় দেহ নেই। একে আনন্দ বল্লেও বলা যায়, চিৎ বল্লেও বলা যায়, প্রকাশ বল্লেও বলা যায়, আবার রস বল্লেও বলা যায়। এটা এমন একটা অখণ্ড সত্তা যে, এখানে চিৎ আর আনন্দের কোনও প্রভেদ নেই। এখানে দুই বল্‌তে কিছু নেই, একটা অখণ্ড রসোপলব্ধি আনন্দাস্বাদ ছাড়া আর কিছুই নেই। এই রস ও আনন্দ একই কথা। আপনার খেলার মধ্যে, লীলার মধ্যে এ আপনিই প্রকাশ হয়ে রয়েছে। একে প্রকাশ করবার জন্ম কোন প্রমাণান্তরের আবশ্যক হয় না। একে কেউ উৎপন্নও করে না, প্রকাশও করে না। এর উপর কাহারও কোন হাত নেই —এমন কি, যে কবির মধ্যে এর আবির্ভাব হয়েছে, তারও নয়।

"রাখ কৌতুক নিত্য নূতন,
ওগো কৌতুকময়ী !
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব,
বলে দাও মোরে, অয়ি !
আমি কিগো বীণা যন্ত্র তোমার,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার,
মূর্চ্ছনা ভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্ম্ম মাঝে ?
আমার মাঝারে করিছ রচনা,
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে ?
মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিণী,
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে, ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর সুর !
হবে যবে তব লীলা অবসান,
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
তব রহস্তপুর ?"

এবার দিঙ্নাগ একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠে তাঁর মোটা হাত-খানা টেবিলের উপর চাপ্‌ড়ে বল্লেন যে, কবিতা দিয়ে কবিতার

সমর্থন, এও যেমন এক বিষম argument in a circle, তেমনি রসকে আনন্দ বলাও একটা ভয়ানক আজগুবি ব্যাপার। রস মাত্রই আনন্দাত্মক, এটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তা বলে রসকে কখনও আনন্দ বলা চলে না, কারণ তাহলে রসমাত্রই আনন্দাত্মক না বলে আনন্দমাত্রই আনন্দাত্মক বলা যেতে পারত, কিন্তু সে কথার কোন অর্থ থাকত না। "রসো বৈ সঃ রসোহ্যে বায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"—পরমেশ্বর রসস্বরূপ। পরমেশ্বরের রস পেয়েই জীব আনন্দিত হয়। এখানেও রস আর আনন্দ যে একই বস্তু, এমন বলা হয় নি। পুত্রকে পেয়ে মাতার আনন্দ হয়, তাই বলে কি বলতে হবে যে পুত্রই আনন্দ? বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে পার্থক্য, রস ও আনন্দের মধ্যেও সেই প্রভেদ।

ভট্টনায়ক। রস আনন্দাত্মক বল্লেই যে রস আনন্দ হতে পারে না, এ কথা আপনি কি বুদ্ধিতে ঠিক করলেন! একে সংস্কৃতে বলে বিকল্প—"শব্দজ্ঞানানুপাতীবস্তুশূন্যো বিকল্পঃ"। রস ও আনন্দ এই উভয়ের মধ্যে যে বাস্তবিক কোন পার্থক্য আছে তা নয়, ওটা একটা কথার জের মাত্র। লোকে বলে "রাহুর মাথা" "পুরুষের চৈতন্য", তাই বলে কি রাহু মাথা ছাড়া একটা স্বতন্ত্র বস্তু, না পুরুষ চৈতন্য ছাড়া আর কিছু! রসের আনন্দই বলুন আর রস আনন্দাত্মকই বলুন, ও একই কথা,—এবং ওর মানে এই যে, রসও যা' আনন্দও তা'। "রসং হ্যে বায়ং লব্ধানন্দী ভবতি," এর মানে এ নয় যে, ব্রহ্মের রস পেয়ে লোক আনন্দিত হয়, এবং রস আর আনন্দ এক বস্তু নয়, কারণ আনন্দ ছাড়া যে আর

কোন রসস্বরূপ আছে, তা উপনিষদের সিদ্ধান্ত নয়। "ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ"। তার মানে এই যে, সৎ, চিৎ এবং আনন্দ, এই তিনটিই পরস্পর অভিন্ন এক তত্ত্ব। যাকে রস বলছ, তাকেই আনন্দ বল্‌তে হবে,—কারণ আনন্দ ছাড়া "রসতত্ত্ব" বলে' ব্রহ্মের আর কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নেই। পুত্রকে পেয়ে আনন্দ পাই, অথচ পুত্র আনন্দ নয়, এ সমস্ত ছেলেমানুষী তর্কের আড়ম্বর করে শুধু কথা বাড়াচ্ছেন মাত্র, কারণ আমরা ত বলিনি যে—"রস পেয়ে আমরা আনন্দ পাই"; আমরা বলছি যে, রসও যা' আনন্দও তা', আনন্দময়ত্বই হচ্ছে রসের লক্ষণ। কাজেই কোন রসটা শ্রেষ্ঠ, কোন রসটা নিকৃষ্ট, এ কথা বলা চলে না,—এবং বাহির থেকে একটা রসের আদর্শও খাড়া করা চলতে পারে না,—কারণ সে যে সকলের চেয়ে উঁচুতে, তার ত কোন মাপকাঠিতেই নাগাল পাওয়া যাবে না। সে যে ব্রহ্মস্বাদ সহোদর, অন্য ভাললাগার সঙ্গে ত রসের কোন তুলনা হতে পারে না। অন্য ভাললাগার সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্বন্ধ। কাজেই সেখানে ভাললাগার সঙ্গে একটা মন্দলাগাও রয়েছে, কিন্তু কাব্যের রসের মধ্যে কোন মন্দলাগা নেই। এখানে সর্ব্বদাই স্বর্গ-মন্দাকিনীর রসনির্ঝর উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। তাতে আমাদের দৈনিক পানাবগাহনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, এবং এই জন্য তাকে আমরা এমন বিশেষ করে' আনন্দময় বলে', আর সবরকম আনন্দ বা ভাললাগার থেকে স্বতন্ত্র আসনে বসাতে পারি। কবি এ বিশ্বাসে এতই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ যে, সহস্র আঘাত করলেও তিনি ফুলের মুচকি হাসিতে তার উত্তর দিয়ে থাকেন, কখনও কৈফিয়ৎ দেন না।

"তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে মুচকি"। যে দেহে কবির কৈফিয়ৎ লেখা হয়, সেটা তার মর্ত্ত্যের দেহ,—তাঁর দেবদেহে ছায়ার কলঙ্কটুকুও নেই। সেখানে শুধু আলো, শুধু উৎসব, শুধু আনন্দ। মর্ত্ত্যের দেহে হুল ফোটে বলেই সেখানে কৈফিয়তের ঝাড়পোঁছ করতে হয়।

দিঙ্নাগ। অন্য পাঁচরকম অনুভূতি বা আনন্দ থেকে রসকে তোমরা কেমন করে এমন স্বতন্ত্রভাবে আলৌকিক করে দেখ্‌তে চাও, তা' তোমরাই বুঝতে পার। তোমাদের হেঁয়ালী-ছন্দের আবরণের মধ্যে থেকে শুধু Mysticism-এর বুলি আওড়ালে ত চল্‌বে না। রস যখন অনুভূতিগ্রাহ্য, তখন রসও বস্তু। রসানুভূতির জন্য প্রথম বস্তু চাই, দ্বিতীয় কারণ চাই, তৃতীয় কর্ত্তা চাই। জ্ঞান যেমন বস্তুকে ধরে' জন্মায়, শূন্যকে ধরে' জন্মায় না,—সেইরূপ ভয়, বিস্ময়, করুণা, ঘৃণা, প্রীতি প্রভৃতি রসও বস্তুর আশ্রয়েই জন্মায়। বস্তু আশ্রয় ছাড়া জন্মাতে পারে না। যে বস্তু হতে কোন বিপদের আশঙ্কা একেবারে নেই, তাকে দেখে ভয়ের অনুভূতি হয় না। কবিতাবিশেষ লিখে বা পড়ে' যে আনন্দানুভব হয়, তাতে বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ এবং অতীতের বহুতর স্মৃতি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। রসমাত্রই হয় বর্ত্তমান বস্তুর সাক্ষাৎকার, নাহয় পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ বস্তুর সাক্ষাৎকারের স্মৃতি হতেই উৎপন্ন হয়; শূন্য হতে কিংবা কেবল মনের ভিতর হতে আপনি জন্মায় না। কবিমাত্রেরই যেমন আপনার কৃতিত্বে, এবং আপনার আত্মপ্রকাশে একটা আনন্দ আছে, তেমনি পাঠকমাত্রেরই পূর্ব্বানুভূত বস্তুকে অবলম্বন

করে তার স্মৃতিতে আনন্দ হতে পারে, কিন্তু সে আনন্দ নিতান্তই তার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়,—তার দ্বারা কবিতার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করা যায় না। পদাবলীগান শুনে একজন লম্পট অজস্র অশ্রুপাত করেছিল। সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে যে, কীর্ত্তনীয়া যখন বঁধু বঁধু বলে ডাকছিল তখন আমার এক ব্যক্তির কথা মনে পড়ে' গেল, যে সেও আমাকে ঐ ভাবেই ডাকত।

নানা লোকে নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন কবিতা বা ভিন্ন ভিন্ন কবিকে ভালবাসে। এই সকল কারণের মধ্যে কোন্‌টা রসানুভূতির প্রমাণ, আর কোনটা অবান্তর বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা দ্বারাই কোনটি কাব্য-বিচারে গ্রহণীয় আর কোনটি বা বর্জ্জনীয় তাহা মীমাংসা হবে। কেবল ভাললাগা বা না-লাগার দ্বারা এ বিচার হতে পারে না।

ভট্টনায়ক। আবার "রস" শব্দের অর্থ গুলিয়ে ফেলে ভাগাসিদ্ধি করে' ফেলবার যোগাড় করেছেন দেখছি। আপনি যে বিস্ময় ভয় প্রভৃতিকে রস নাম দিয়ে এখানে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন, সেগুলি অনুভূতি বা Feeling মাত্র। কিন্তু আমরা যে কাব্য-রস সম্বন্ধে এখানে বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি, সেটা হচ্ছে একটা অলৌকিক প্রকাশ। কাব্যে যে বিস্ময়, ভয়, করুণার উদ্রেক হয়, সেগুলি সাধারণ সর্ব্বজনসিদ্ধ লৌকিক বিস্ময় ভয় করুণা নয়। কারণ সেখানে সমস্ত রসের বিশ্রাম হচ্ছে আনন্দে। সেখানে ভয়ে ভীতি নেই, শোকে দুঃখ নেই, রৌদ্রে ক্রোধ নেই,—আছে কেবল তৃপ্তি, আনন্দ। বিয়োগান্ত ব্যাপারের অভিনয়ে আমাদের

চোখে জল আসে বটে, কিন্তু সেটা দুঃখের অশ্রুজল নয়, সেটা অন্তরের একটা সরস ভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। তাতে যদি লোক দুঃখই পাবে, তবে তা শোনবার জন্য লোকের এত আগ্রহ হবে কেন?

করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্
স চেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।
কিঞ্চতেষু যদা দুঃখং ন কোঽপিস্যাত্তু দুন্মুখঃ
অশ্রুপাতাদয়স্তদ্বৎ দ্রুতত্বাৎ চেতৎ সমতাঃ॥

কাজেই লৌকিক বিস্ময় ভয় শোক বল্‌তে যে জিনিসটা বোঝায়, কাব্যের বিস্ময় ভয় শোক বল্‌তে তা বোঝায় না; এটা একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু— কাজেই লৌকিক বিস্ময় ভয় সম্বন্ধে যে কথা খাটে, যা নিয়ে আপনি তর্ক করচেন, তার একটিও এখানে খাট্‌বে না। এই রসানুভূতিকে যে আপনারা কেবলই ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত বলে দোষ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেটা নিতান্তই আপনাদের কপালের দোষ। কারণ রসানুভূতি জিনিসটা একেবারেই ব্যক্তিত্বশূন্য বা Impersonal, ইহার কোন বেদ্য বস্তুও নেই বা জ্ঞাতাও নেই। সেজন্যই প্রাচীনেরা একে বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ এতে কোনও ব্যক্তিগত সাংসারিক সুখদুঃখের লেশমাত্রও নেই। কাব্যের রসবেদনা অপর কোনও ব্যক্তির স্বাভাবিক সুখদুঃখের সত্য কাহিনী নয়, কারণ সেগুলি সমস্তই এমন কাল্পনিক যে, অপরের ব্যথা মনে করে' যে তার সঙ্গে সহানুভূতি করব, তার উপায় নেই। অথচ এটা কবি

বা পাঠকের নিজের দরদও নয়,—তাই ওটা পরেরও বটে, পরেরও নয়,—আবার নিজের হয়েও নিজের নয়। সাধারণতঃ Feeling বা অনুভূতি বল্‌তে আমরা যা বুঝি, তা' সকল সময়েই বাস্তবকে অবলম্বন করে' উৎপন্ন হয়, তা' সকল সময়েই আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েচে, কিন্তু কাব্যের আলম্বন উদ্দীপন ত সেরকম নয়। এখানে সবই অবাস্তব, সবই কাল্পনিক, তারা সত্য বা বাস্তবিক ভাবে স্থূল জগতে নেই বলেই তাদের সম্বন্ধে লৌকিক প্রত্যক্ষ চল্‌তে পারে না, এবং প্রত্যক্ষ চল্‌তে পারে না বলেই তার সম্বন্ধে অনুমান বা স্মৃতিও চল্‌তে পারে না। কীর্ত্তনীয়ার গান শুনে যার নিজের পিয়ারীর কথা মনে হয়ে চোখ দিয়ে জল পড়েছিল, তার সে ব্যাপারটাকে যদি কাব্যরসের আস্বাদন বলা যায়, তাহলে যে-কোনও রকমের স্মরণ হলেই তাকে কাব্য বল্‌তে হয়, কারণ স্মৃতিমাত্রই কোন না কোনও স্মারক বস্তুর ব্যাপারের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত কোন সুখ-দুঃখের স্মৃতিই কাব্যরসের নিয়ামক বা সম্পাদক নয়। বাস্তব বলেই সেগুলিকে আমরা স্মৃতি বল্‌তে বাধ্য। কাব্যরস ত স্মৃতি নয়, কাহারও ত সেটা আপনার জীবনের ব্যক্তিসাক্ষিক ঘটনা নয়। অনেক সময় অবশ্য কাব্যরসের সঙ্গে আরও পাঁচ রকম আনন্দ জড়িত থাকে, হয় ত স্মৃতি জড়িত থাকে, হয় ত বা কোনওখানে পূর্ব্বানুভূত কোনও ঘটনার আভাস থাকে, কোনও খানে বা একটা ধর্ম্মের ভাব মিশ্রিত হয়ে থাকে। তা ত হবেই, সবরকমের ভাবই যে মানুষের মধ্যে সব সময়ে খেল্‌ছে। কিন্তু তাই বলে' সে সমস্তগুলিকেই কাব্য রসের কোঠায় ফেলা

যেতে পারে না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনে যদি কৃষ্ণের কথা মনে হয়ে ভক্তিতে কেউ বিভোর হয়, তাহলে সেটাকে যে আমরা কোনও রকমে কাব্যরসের আস্বাদ বলব, এবং সেই খাতিরে যে কাব্যত্ব হিসাবে পদাবলীর প্রশংসা করব, তার সম্ভাবনা মাত্রও নেই। কিন্তু সেই পদাবলী শুনে যদি অনির্দ্দিষ্টভাবে নরনারীর প্রেমের সঙ্গীতটি প্রাণে বেজে উঠে, তবে সে আনন্দকে আমরা কাব্যরসের আস্বাদ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারিনে। কাব্যরসের বৈচিত্র্যই এই যে, এখানে সমস্ত ব্যক্তিগত বিশেষ ভাব একেবারে লয় পেয়ে নির্ব্বিশেষের মধ্যে বিশেষের আনন্দ-লীলা চলতে থাকে। বিধাতার বাস্তব জগতের অনেক উর্দ্ধে এর স্থান। কবিই সেই জগতের প্রজাপতি, এবং আনন্দপিপাসু রসিকমাত্রই তাঁর প্রজা।

"অপারে কাব্য সংসারে কবিরেবঃ প্রজাপতি
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ত্ততে।"

ভট্টনায়কের এই কথা শেষ হতেই রুদ্রট জিজ্ঞাসা করে' উঠলেন যে, আপনি যা বলছেন তাই যদি হবে, তাহলে কাব্য হোল কি না হোল, তার বিচারক হবে কে? এবং কাব্যের উদ্দেশ্যই বা কি? আকাশে বিদ্রূপের হাসি ঝিক্‌মিক করে' উঠল এবং একটা দম্‌কা বাতাসে রাশিকৃত ঝরা-পাতা আমাদের গায়ে উড়ে এসে পড়ল—সেদিনকার মত কথা বন্ধ হয়ে গেল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত

বলাকা

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল,—যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি',
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে

হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ঐ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির মগন,
শিহরিল দেওদার বন।

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে' বেদনার ঢেউ উঠে জাগি'

সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী !
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে !"

হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা !
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল ।
তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা ।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায় ।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে ।

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনেরাতে
এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে!
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘরে-বাইরে

বিমলার আত্মকথা

সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাংলা দেশের চিত্ত যে কেমন হয়ে গেল তা বল্‌তে পারিনে। ষাটহাজার সগর-সন্তানের ছাইয়ের পরে এক মুহূর্ত্তে যেন ভাগীরথীর জল এসে স্পর্শ করলে। কত যুগযুগান্তরের ছাই, রসাতলে পড়ে ছিল, কোনো আগুনের তাপে জ্বলে না, কোনো রসের মিশালে দানা বাঁধে না; সেই ছাই হঠাৎ একেবারে কথা কয়ে উঠ্‌ল, বল্লে, "এই যে আমি!"

বইয়ে পড়েছি, গ্রীস্‌ দেশের কোন্‌ মূর্ত্তিকর দেবতার বরে আপনার মূর্ত্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু সেই রূপের থেকে প্রাণের মধ্যে একটা ক্রমশঃ বিকাশ, একটা সাধনার যোগ আছে; কিন্তু আমাদের দেশের শ্মশানের ভস্মরাশির মধ্যে সেই রূপের ঐক্য ছিল কোথায়? সে যদি পাথরের মত আঁট শক্ত জিনিস হত, তা হলেও ত বুঝতুম—অহল্যা পাষাণীও ত একদিন মানুষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ যে সব ছড়ানো, এ যে সৃষ্টিকর্ত্তার মুঠোর ফাঁক দিয়ে কেবলি গলে' গলে' পড়ে, বাতাসে উড়ে উড়ে যায়, এ যে রাশ হয়ে থাকে, কিছুতে এক হয় না। অথচ সেই জিনিষ হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের আঙিনার কাছে এসে মেঘগর্জ্জনে বলে উঠ্‌ল, অয়মহং ভো!

তাই আমাদের সেদিন মনে হল, এ সমস্তই অলৌকিক। এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত কোনো সুধারসোন্মত্ত দেবতার মুকুটের থেকে মাণিকের

মত একেবারে আমাদের হাতের উপর খসে পড়ল; আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের এই বর্ত্তমানের কোনো স্বাভাবিক পারম্পর্য্য নেই। এ দিনটি আমাদের সেই ওষুধের মত যা খুঁজে বের করিনি, যা কিনে আনিনি, যা কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া নয়, যা আমাদের স্বপ্নলব্ধ।

সেই জন্যে মনে হল আমাদের সব দুঃখ সব তাপ আপনি মন্ত্রে সেরে যাবে। সম্ভব অসম্ভবের কোনো সীমা কোথাও রইল না। কেবলি মনে হতে লাগ্‌ল, "এই হ'ল বলে,' হ'ল বলে' !"

আমাদের সেদিন মনে হয়েছিল ইতিহাসের কোনো বাহন নেই, পুষ্পক-রথের মত সে আপনি চলে আসে—অন্তত তার মাতলিকে কোনো মাইনে দিতে হয় না; তার খোরাকির জন্য কোনো ভাবনা নেই, কেবল ক্ষণে ক্ষণে তার মদের পেয়ালা ভরতি করে দিতে হয়—আর তার পরেই হঠাৎ একেবারে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি।

আমার স্বামী যে অবিচলিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে তাঁকে যেন একটা বিষাদ এসে আঘাত করত। যেটা সামনে দেখা যাচ্চে তার উপর দিয়েও তিনি যেন আর-একটা কিছুকে দেখ্‌তে পেতেন। মনে আছে সন্দীপের সঙ্গে তর্কে তিনি একদিন বলেছিলেন, সৌভাগ্য হঠাৎ এসে আমাদের দরজার কাছে হাঁক দিয়ে যায়, কেবল দেখাবার জন্যে যে তাকে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের নেই; তাকে ঘরের মধ্যে নিমন্ত্রণ করে বসাবার কোনো আয়োজন আমরা করি নি।

জন্যেই এমন নাস্তিকের মত কথা কও! আমরা প্রত্যক্ষ দেখচি দেবী বর দিতে এসেচেন আর তুমি অবিশ্বাস করচ?

আমার স্বামী বল্‌লেন, আমি দেবতাকে মানি সেই জন্যেই অন্তরের মধ্যে নিশ্চিত জানি তাঁর পূজা আমরা জোটাতে পারলুম না। বর দেবার শক্তি দেবতার আছে কিন্তু বর নেবার শক্তি আমাদের থাকা চাই।

আমার স্বামীর এই রকমের কথায় আমার ভারি রাগ হ'ত। আমি তাঁকে বল্‌লুম, তুমি মনে কর দেশের এই উদ্দীপনা, এ কেবলমাত্র একটা নেশা। কিন্তু নেশায় কি শক্তি দেয় না?

তিনি বল্‌লেন, শক্তি দেয় কিন্তু অস্ত্র দেয় না।

আমি বল্লুম, শক্তি দেবতা দেন, সেইটেই দুর্লভ, আর অস্ত্র ত সামান্য কামারেও দিতে পারে।

স্বামী হেসে বল্লেন, কামার ত অমনি দেয় না, তাকে দাম দিতে হয়।

সন্দীপ বুক ফুলিয়ে বল্লেন, দাম দেব গো দেব!

স্বামী বল্লেন, যখন দেবে তখন আমি উৎসবের রসনচৌকি বায়না দেব।

সন্দীপ বল্লেন, তোমার বায়নার আশায় আমরা বসে নেই। আমাদের নিকড়িয়া উৎসব কড়ি দিয়ে কিন্‌তে হবে না।

বলে' তিনি তাঁর ভাঙা মোটা গলায় গান ধরলেন—

আমার নিকড়িয়া-রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।

আমার দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন, মক্ষিরাণী, গান যখন প্রাণে

আসে তখন গলা না থাকলেও যে বাধে না এইটে প্রমাণ করে দেবার জন্যেই গাইলুম। গলার জোরে গাইলে গানের জোর হাল্কা হয়ে যায়। আমাদের দেশে হঠাৎ ভরপূর গান এসে পড়েচে, এখন নিখিল বসে বসে গোড়া থেকে সারগম সাধতে থাকুক্, ইতিমধ্যে আমরা ভাঙা গলায় মাতিয়ে তুল্‌ব।

আমার ঘর বলে, তুই কোথায় যাবি,
বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি,—
আমার প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব
যাক্ না উড়ে পুড়ে।

আচ্ছা, না হয় আমাদের সর্ব্বনাশই হবে, তার বেশি ত নয়, রাজি আছি, তাতেই রাজি আছি।

ওগো, যায় যদি ত যাক্ না চুকে,
সব হারাব হাসিমুখে,
আমি এই চলেছি মরণসুধা
নিতে পরাণ পূরে।

আসল কথা হচ্ছে নিখিল, আমাদের মন ভুলেচে, আমরা সুসাধ্য-সাধনের গণ্ডির মধ্যে টিঁকতে পারব না, আমরা অসাধ্য সাধনের পথে বেরিয়ে পড়ব।

ওগো, আপন যারা কাছে টানে
এ রস তারা কেই বা জানে,
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে
ডাক দিয়েছে দূরে।

এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা
পড়ুক ভেঙে-চুরে।

মনে হল আমার স্বামীর কিছু বলবার আছে, কিন্তু তিনি বল্লেন না, আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

সমস্ত দেশের উপর এই যে একটা প্রবল আবেগ হঠাৎ ভেঙে পড়ল, ঠিক এই জিনিষটাই আমার জীবনের মধ্যে আর-এক সুর নিয়ে ঢুকেছিল। আমার ভাগ্যদেবতার রথ আসচে, কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দে দিনরাত্রি আমার বুকের ভিতর গুর-গুর করচে। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হতে লাগ্‌ল একটা কি পরমাশ্চর্য্য এসে পড়ল বলে,—তার জন্যে আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। পাপ? যে ক্ষেত্রে পাপ পুণ্য, যে ক্ষেত্রে বিচার বিবেক, যে ক্ষেত্রে দয়া মায়া, সে ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবার পথ হঠাৎ আপনিই যে খুলে গেছে। আমি ত এ'কে কোনো দিন কামনা করি নি, এর জন্যে প্রত্যাশা করে' বসে' থাকি নি, আমার সমস্ত জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখ, এর জন্যে আমার ত কোনো জবাবদিহি নেই! এতদিন এক-মনে আমি যার পূজা করে এলুম বর দেবার বেলা এ যে এল আর-এক দেবতা! তাই, সমস্ত দেশ যেমন জেগে উঠে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছে "বন্দেমাতরং"—আমার প্রাণ তেম্‌নি করে তার সমস্ত শিরা-উপশিরার কুহরে কুহরে আজ বাজিয়ে তুলেচে, বন্দে—কোন্ অজানাকে, অপূর্ব্বকে, কোন্ সকল-সৃষ্টিছাড়াকে!

দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এই মিল! এক-একদিন অনেক রাত্রে আস্তে আস্তে আমার বিছানা থেকে

উঠে খোলা ছাদের উপর দাঁড়িয়েচি। আমাদের বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে আধপাকা ধানের ক্ষেত, তার উত্তরে গ্রামের ঘন গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নদীর জল এবং তারো পরপারে বনের রেখা, সমস্তই যেন বিরাট রাত্রির গর্ভের মধ্যে কোন্-এক ভাবী সৃষ্টির ভ্রূণের মত অস্ফুট আকারে ঘুমিয়ে রয়েচে। আমি সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে পেয়েচি, আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারি মত একটি মেয়ে। সে ছিল আপন আঙিনার কোণে—আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েচে। সে কিছুই ভাববার সময় পেলে না, সে চলেচে সাম্‌নের অন্ধকারে—একটা দীপ জ্বেলে নেবারও সবুর তার সয় নি। আমি জানি এই সুপ্তরাত্রে তার বুক কেমন করে উঠ্‌চে পড়চে। আমি জানি, যে-দূর থেকে বাঁশি ডাক্‌চে ওর সমস্ত মন এমনি করে সেখানে ছুটে গেছে যে ওর মনে হচ্ছে যেন পেয়েচি, যেন পৌঁছেচি, যেন এখন চোখ বুজে চল্লেও কোনো ভয় নেই। না, এ ত মাতা নয়। সন্তানকে স্তন দিতে হবে, অন্ধকারের প্রদীপ জ্বালাতে হবে, ঘরের ধুলো ঝাঁট দিতে হবে, সে কথা ত এর খেয়ালে আসে না। এ আজ অভিসারিকা। এ আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর দেশ। এ ঘর ছেড়েচে কাজ ভুলেচে। এর আছে কেবল অন্তহীন আবেগ—সেই আবেগে সে চলেচে মাত্র, কিন্তু পথে কি কোথায় সে কথা তার মনেও নেই। আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা। আমি ঘরও হারিয়েচি, পথও হারিয়েচি। উপায় এবং লক্ষ্য দুইই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে, কেবল আছে আবেগ আর চলা। ওরে নিশাচরী, রাত যখন রাঙা হয়ে পোহাবে তখন

ফেরবার পথের যে চিহ্নও দেখ্‌তে পাবি নে! কিন্তু ফিরব কেন, মরব। যে কালো অন্ধকার বাঁশি বাজাল সে যদি আমার সর্ব্বনাশ করে, কিছুই যদি সে আমার বাকি না রাখে তবে আর আমার ভাবনা কিসের? সব যাবে, আমার কণাও থাকবে না, চিহ্নও থাক্‌বে না, কালোর মধ্যে আমার সব কালো একেবারে মিশিয়ে যাবে, তার পরে কোথায় ভালো কোথায় মন্দ, কোথায় হাসি কোথায় কান্না!

সেদিন বাংলা দেশে সময়ের কলে পূরো ইষ্টিম দেওয়া হয়েছিল। তাই যা সহজে হবার নয় তা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ধাঁধাঁ করে হয়ে উঠ্‌ছিল। বাংলা দেশের যে কোণে আমরা থাকি, এখানেও কিছুই আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না এমনি মনে হতে লাগ্‌ল। এত দিন আমাদের এদিকে বাংলা দেশের অন্য অংশের চেয়ে বেগ কিছু কম ছিল। তার প্রধান কারণ, আমার স্বামী বাইরের দিক থেকে কারো উপর কোনো চাপ দিতে চান না। তিনি বল্‌তেন, দেশের নামে ত্যাগ যারা করবে তারা সাধক, কিন্তু দেশের নামে উপদ্রব যারা করবে তারা শত্রু; তারা স্বাধীনতার গোড়া কেটে স্বাধীনতার আগায় জল দিতে চায়।

কিন্তু সন্দীপবাবু যখন এখানে এসে বসলেন তাঁর চেলারা চারদিক থেকে আনাগোনা করতে লাগল, মাঝে মাঝে হাটে বাজারে বক্তৃতাও হতে থাক্‌ল, তখন এখানেও ঢেউ উঠতে লাগল। একদল স্থানীয় যুবক সন্দীপের সঙ্গে জুটে গেল। তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা গ্রামের কলঙ্ক। উৎসাহের দীপ্তির দ্বারা তারাও ভিতরে বাহিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। এটা বেশ বোঝা গেল, দেশের হাওয়ার মধ্যে যখন আনন্দ বইতে থাকে

তখন মানুষের বিকৃতি আপনি সেরে যায়। মানুষের পক্ষে সুস্থ, সরল, সবল হওয়া বড় কঠিন যখন দেশে আনন্দ না থাকে।

এই সময়ে সকলের চোখ পড়ল আমার স্বামীর এলাকা থেকে বিলিতি নুন, বিলিতি চিনি, বিলিতি কাপড় এখনো নির্ব্বাসিত হয় নি। এমন কি, আমার স্বামীর আম্‌লারা পর্য্যন্ত এই নিয়ে চঞ্চল এবং লজ্জিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে আমার স্বামী যখন এখানে স্বদেশী জিনিষের আমদানি করেছিলেন তখন এখানকার ছেলে বুড়ো সকলেই তা নিয়ে মনে মনে এবং প্রকাশ্যে হাসাহাসি করেছিল। দিশি জিনিষের সঙ্গে যখন আমাদের স্পর্দ্ধার যোগ ছিল না তখন তাকে আমরা মনে প্রাণে অবজ্ঞা করেচি। এখনো আমার স্বামী তাঁর সেই দিশি ছুরিতে দিশি পেন্সিল কাটেন, খাগড়ার কলমে লেখেন, পিতলের ঘটিতে জল খান এবং সন্ধ্যার সময়ে শামাদানে দিশি বাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করেন—কিন্তু তাঁর এই অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে আমরা মনের মধ্যে কোনো রস পাইনি। বরঞ্চ তখন তাঁর বসবার ঘরে আস্‌বাবের দৈন্যে আমি বরাবর লজ্জা বোধ করে এসেছি, বিশেষতঃ বাড়িতে যখন ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা আর কোনো সাহেব-সুবোর সমাগম হত। আমার স্বামী হেসে বল্‌তেন, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি অত বিচলিত হচ্চ কেন?

আমি বল্‌তুম, ওরা যে আমাদের অসভ্য অজ্‌বুগ মনে করে যাবে।

তিনি বল্‌তেন, তা যখন মনে করবে তখন আমিও এই কথা মনে করব ওদের সভ্যতা চাম্‌ড়ার উপরকার সাদা পালিশ পর্য্যন্ত, বিশ্বমানুষের ভিতরকার লাল রক্তধারা পর্য্যন্ত পৌঁছয় নি।

ওঁর ডেস্কে একটি সামান্য পিতলের ঘটিকে উনি ফুলদানি করে ব্যবহার করতেন। কতদিন কোনো সাহেব আস্‌বার খবর পেলে আমি লুকিয়ে সেটিকে সরিয়ে বিলিতি রঙীন কাঁচের ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রেখেচি।

আমার স্বামী বল্‌তেন, দেখ বিমল, ফুলগুলি যেমন আত্মবিস্মৃত আমার এই পিতলের ঘটিটিও তেমনি। কিন্তু তোমার ঐ বিলিতি ফুলদানি অত্যন্ত বেশি করে জানায় যে ও ফুলদানি, ওতে গাছের ফুল না রেখে পশমের ফুল রাখা উচিত।

তখন এ সম্বন্ধে তাঁর একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন, মেজরাণী। তিনি একেবারে হাঁপিয়ে এসে বল্‌তেন, ঠাকুরপো, শুনেচি আজকাল দিশি সাবান উঠেচে নাকি—আমাদের ত ভাই সাবান মাখার দিন উঠেই গেচে, তবে ওতে যদি চর্ব্বি না থাকে তাহলে মাখ্‌তে পারি। তোমাদের বাড়িতে এসে অবধি ঐ এক অভ্যেস হয়ে গেচে। অনেক দিন ত ছেড়েই দিয়েচি তবু সাবান না মেখে আজো মনে হয় যেন স্নানটা ঠিকমত হল না।

এতেই আমার স্বামী ভারি খুসি। বাক্স বাক্স দিশি সাবান আস্‌তে লাগ্‌ল। সে কি সাবান, না সাজিমাটির ড্যালা! আমি বুঝি জানিনে? স্বামীর আমলে মেজরাণী যে বিলিতি সাবান মাখ্‌তেন আজও সমানে তাই চল্‌চে, একদিনও কামাই নেই; ঐ দিশি সাবান দিয়ে তাঁর কাপড়কাচা চল্‌তে লাগ্‌ল।

আর একদিন এসে বল্লেন, ভাই ঠাকুরপো, দিশি কলম নাকি উঠেচে, সে ত আমার চাই। মাথা খাও আমাকে এক বাণ্ডিল—

ঠাকুরপো মহা উৎসাহিত। কলমের নাম ধরে যত রকমের

দাঁতনের কাঠি তখন বেরিয়েছিল সব মেজরাণীর ঘরে বোঝাই হতে লাগ্‌ল। ওতে ওঁর কোনো অসুবিধে ছিল না, কেননা লেখাপড়ার সম্পর্ক ওঁর ছিল না বল্লেই হয়। ধোবার বাড়ির হিসেব সজ্‌নের ডাঁটা দিয়ে লেখাও চলে। তাও দেখেচি লেখবার বাক্সের মধ্যে ওঁর সেই পুরোনো কালের হাতির দাঁতের কলমটি আছে, যখন কালে ভদ্রে লেখার সখ যায় তখন ঠিক সেইটেরই উপরে হাত পড়ে।

আসল কথা, আমি যে আমার স্বামীর খেয়ালে যোগ দিইনে সেইটের কেবল জবাব দেবার জন্যেই উনি এই কাণ্ডটি করতেন। অথচ আমার স্বামীকে ওঁর এই ছলনার কথা বল্‌বার জো ছিল না। বল্‌তে গেলেই তিনি এমন মুখ করে চুপ করে থাক্‌তেন যে বুঝতুম যে, উল্টো ফল হল। এ সব মানুষকে ঠকানোর হাত থেকে বাঁচাতে গেলেই ঠক্‌তে হয়।

মেজরাণী সেলাই ভালোবাসেন ; একদিন যখন সেলাই করচেন তখন আমি স্পষ্টই তাঁকে বল্লুম, এ তোমার কি কাণ্ড! এদিকে তোমার ঠাকুরপোর সাম্‌নে দিশি কাঁচির নাম করতেই তোমার জিব দিয়ে জল পড়ে ওদিকে সেলাই করবার বেলা বিলিতি কাঁচি ছাড়া যে তোমার এক দণ্ড চলে না!

মেজরাণী বল্লেন, তাতে দোষ হয়েচে কি, কত খুসি হয় বল্‌দেখি? ছোটবেলা থেকে ওর সঙ্গে যে একসঙ্গে বেড়েচি, তোদের মত ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারিনে। পুরুষ মানুষ, ওর আর ত কোনো নেশা নেই—এক, এই দিশি দোকান নিয়ে খেলা, আর, ওর এক সর্ব্বনেশে নেশা তুই—এইখেনেই ও মজ্‌বে!

আমি বল্লুম, যাই বল, পেটে এক মুখে এক ভালো নয়।

মেজরাণী হেসে উঠ্‌লেন, বল্লেন, ওলো সরলা, তুই যে দেখি বড্ড বেশি সিধে, একেবারে গুরুমশায়ের বেত কাঠির মত—মেয়েমানুষ অত সোজা নয়—সে নরম বলেই অমন একটু-আধটু নুয়ে থাকে, তাতে দোষ নেই।

মেজরাণীর সেই কথাটি ভুল্‌ব না, "ওর এক সর্ব্বনেশে নেশা তুই, এইখেনেই ও মজ্‌বে!"

আজ আমার কেবলি মনে হয়, পুরুষমানুষের একটা নেশা চাই কিন্তু সে নেশা যেন মেয়েমানুষ না হয়।

আমাদের শুকসায়রের হাট এ জেলার মধ্যে মস্ত বড় হাট। এখানে জোলার এধারে নিত্য বাজার বসে, আর জোলার ওধারে প্রতি-শনিবারে হাট লাগে। বর্ষার পর থেকেই এই হাট বেশি করে জমে। তখন নদীর সঙ্গে জোলার যোগ হয়ে যাতায়াতের পথ সহজ হয়ে যায়। তখন সুতো এবং আগামী শীতের জন্যে গরম কাপড়ের আমদানি খুব বেড়ে ওঠে।

সেই সময়টাতে দিশি কাপড় আর দিশি নুন-চিনির বিরোধ নিয়ে বাংলা দেশের হাটে হাটে তুমুল গণ্ডগোল বেধেছে। আমাদের সকলেরই খুব একটা জেদ চড়ে গেচে। আমাকে সন্দীপ এসে বল্লেন এত বড় হাট বাজার আমাদের হাতে আছে এটাকে আগাগোড়া স্বদেশী করে তুলতে হবে, এই এলাকা থেকে বিলিতি অলক্ষ্মীকে কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করা চাই।

আমি কোমর বেঁধে বল্লুম, চাই বইকি।

সন্দীপ বল্লেন, এ নিয়ে নিখিলের সঙ্গে আমার অনেক কথা-

কাটাকাটি হয়ে গেছে, কিছুতে পেরে উঠ্‌লুম না। ও বলে, বক্তৃতা পর্য্যন্ত চল্‌বে কিন্তু জবরদস্তি চল্‌বে না।

আমি একটু অহঙ্কার করেই বল্লুম, আচ্ছা, সে আমি দেখ্‌চি।

আমি জানি আমার উপর আমার স্বামীর ভালোবাসা কত গভীর। সেদিন আমার বুদ্ধি যদি স্থির থাক্‌ত তাহলে আমার পোড়া মুখ নিয়ে এমন দিনে সেই ভালোবাসার উপর দাবী করতে যেতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেত। কিন্তু সন্দীপকে যে দেখাতে হবে আমার শক্তি কত! তাঁর কাছে আমি যে শক্তিরূপিণী! তিনি তাঁর আশ্চর্য্য ব্যাখ্যার দ্বারা বার-বার আমাকে এই কথাই বুঝিয়েচেন যে, পরমাশক্তি এক-একজন বিশেষ মানুষের কাছে এক-একজন বিশেষ মানুষেরই রূপে দেখা দেন ;—তিনি বলেন, আমরা বৈষ্ণবতত্ত্বের হ্লাদিনীশক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখবার জন্যেই এত ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি, যখন কোথাও দেখ্‌তে পাই তখনি স্পষ্ট বুঝতে পারি আমার অন্তরের মধ্যে যে ত্রিভঙ্গ বাঁশি বাজাচ্ছেন তাঁর বাঁশির অর্থটা কি। বল্‌তে বল্‌তে এক একদিন গান ধরতেন,—

যখন দেখা দাওনি রাধা তখন বেজেছিল বাঁশি।
এখন চোখে চোখে চেয়ে সুর যে আমার গেল ভাসি'!
তখন নানা তানের ছলে
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে,
এখন আমার সকল কাঁদা রাধার রূপে উঠ্‌ল হাসি'।

এই সব কেবলি শুন্‌তে শুন্‌তে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি বিমলা। আমি শক্তিতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব, আমার কোনো বন্ধন নেই, আমার মধ্যে সমস্তই সম্ভব, আমি যা-কিছুকে স্পর্শ করচি

তাকেই নূতন করে সৃষ্টি করচি;—নূতন করে সৃষ্টি করেছি আমার এই জগৎকে, আমার হৃদয়ের পরশমণি ছোঁয়াবার আগে শরতের আকাশে এত সোনা ছিল না, আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমি নূতন করচি ঐ বীরকে, ঐ সাধককে, ঐ আমার ভক্তকে, ঐ জ্ঞানে উজ্জ্বল, তেজে উদ্দীপ্ত, ভাবের রসে অভিষিক্ত অপূর্ব্ব প্রতিভাকে;—আমি যে স্পষ্ট অনুভব করচি, ওর মধ্যে প্রতিক্ষণে আমি নূতন প্রাণ ঢেলে দিচ্চি, ও আমার নিজেরই সৃষ্টি। সেদিন অনেক অনুরোধ করে সন্দীপ তাঁর একটি বিশেষ ভক্ত বালক অমূল্যচরণকে আমার কাছে এনেছিলেন, একদণ্ড পরেই আমি দেখ্‌তে পেলুম, তার চোখের তারার মধ্যে একটা নূতন দীপ্তি জ্বলে উঠ্‌ল, বুঝলুম সে আদ্যাশক্তিকে দেখ্‌তে পেয়েচে, বুঝতে পারলুম ওর রক্তের মধ্যে আমারি সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়েচে। পরদিন সন্দীপ আমাকে এসে বল্লেন, এ কি মন্ত্র তোমার, ও বালক ত আর সেই বালক নেই, ওর পল্‌তেয় এক মুহূর্ত্তে শিখা ধরে গেছে। তোমার এ আগুনকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌বে কে? একে একে সবাই আস্‌বে। একটি একটি করে প্রদীপ জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে একদিন যে দেশে দেয়ালির উৎসব লাগ্‌বে!

নিজের এই মহিমার নেশায় মাতাল হয়েই আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম, ভক্তকে আমি বরদান করব। আর এও আমার মনে ছিল আমি যা চাইব তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সেদিন সন্দীপের কাছ থেকে ফিরে এসেই চুল খুলে ফেলে আমি নতুন করে চুল বাঁধলুম। ঘাড়ের থেকে এঁটে চুলগুলকে মাথার উপরের দিকে টেনে তুলে আমার মেম আমাকে এক রকম

খোঁপা বাঁধতে শিখিয়েছিলেন আমার স্বামী আমার সেই খোঁপা খুব ভালোবাসতেন—তিনি বলতেন, ঘাড় জিনিষটা যে কত সুন্দর হতে পারে তা বিধাতা কালিদাসের কাছে প্রকাশ না করে' আমার মত অকবির কাছে খুলে দেখালেন,—কবি হয়ত বলতেন, পদ্মের মৃণাল, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, যেন মশাল, তার ঊর্দ্ধে তোমার কালো খোঁপার কালো শিখা উপরের দিকে জ্বলে উঠেচে। এই বলে তিনি আমার সেই চুল তোলা ঘাড়ের উপর—হায় রে সে কথা আর কেন?

তার পরে তাঁকে ডেকে পাঠালুম। আগে এমন ছোটখাটো সত্য মিথ্যা নানা ছুতোয় তাঁর ডাক পড়ত—কিছুদিন থেকে ডাকবার সব উপলক্ষ্যই বন্ধ হয়ে গেছে; বানাবার শক্তিও নেই।

নিখিলেশের কথা

পঞ্চুর স্ত্রী যক্ষ্মায় ভুগে ভুগে মরেচে। পঞ্চুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সমাজ হিসেব করে বলেচে খরচ লাগ্‌বে সাড়ে তেইশ টাকা।

আমি রাগ করে বল্লুম, নাই বা করলি প্রায়শ্চিত্ত, তোর ভয় কিসের?

সে ক্লান্ত গোরুর মত তার ধৈর্য্যভারপূর্ণ চোখ তুলে বল্লে, মেয়েটি আছে বিয়ে দিতে হবে। আর, বউয়েরও ত গতি করা চাই।

আমি বল্লুম, পাপই যদি হয়ে থাকে এতদিন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত ত কম হয় নি!

সে বল্লে, আজ্ঞে কম কি! ডাক্তার-খরচায় জমি-জমা কিছু

বিক্রী আর বাকি সমস্ত বন্ধক পড়ে গেচে। কিন্তু দান-দক্ষিণে ব্রাহ্মণ-ভোজন না হলে ত খালাস পাইনে।

তর্ক করে' কি হবে? মনে মনে বল্লুম, যে-ব্রাহ্মণ ভোজন করে, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে হবে?

একে ত পঞ্চু বরাবরই উপবাসের ধার ঘেঁসে কাটিয়েচে, তার উপরে এই স্ত্রীর চিকিৎসা এবং সৎকার উপলক্ষে সে একেবারে অগাধ জলে পড়ল। এই সময়ে কোনো রকম করে একটা সান্ত্বনা পাবার জন্যে সে এক সন্ন্যাসী সাধুর চ্যালাগিরি সুরু করলে। তাতে হল এই, তার ছেলেমেয়েরা যে খেতে পাচ্চে না সেইটে ভুলে থাকবার একটা নেশায় সে ডুবে রইল। বুঝে নিলে সংসারটা কিছুই না—সুখ যেমন নেই, তেমনি দুঃখটাও স্বপ্নমাত্র। অবশেষে একদিন রাত্রে ছেলে মেয়ে চারিটিকে ভাঙা ঘরে ফেলে রেখে সে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এ সব কথা আমি কিছুই জানতুম না। আমার মনটার মধ্যে তখন সুরাসুরের মন্থন চলছিল। মাষ্টার মশায় যে পঞ্চুর ছেলে মেয়েগুলিকে নিজের বাসায় রেখে মানুষ করচেন সে কথাও আমাকে জানান নি। তখন তাঁর নিজের ছেলে তার বৌকে নিয়ে রেঙ্গুন চলে গেছে; ঘরে তিনি একলা, তাঁর আবার সমস্ত দিন ইস্কুল।

এমনি করে একমাস যখন কেটে গেছে তখন একদিন সকাল বেলায় পঞ্চু এসে উপস্থিত। তার বৈরাগ্যের ঘোর ভেঙেচে। যখন তার বড় ছেলে মেয়ে দুটি তার কোলের কাছে মাটির উপর বসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, বাবা তুই কোথায় গিয়েছিলি, সব-ছোট ছেলেটি তার কোল দখল করে বসলে, আর সেজ মেয়েটি পিঠের

উপর পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে, তখন কান্নার পর কান্না, কিছুতে তার কান্না থামতে চায় না। বলতে লাগল, মাষ্টার বাবু, এগুলোকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়াব সে শক্তিও নেই, আবার এদের ফেলে রেখে দৌড় মারব সে মুক্তিও নেই, এমন করে বেঁধে মার কেন? আমি কি পাপ করেছিলুম?

এদিকে যে ব্যবসাটুকু ধরে কোনোমতে তার দিন চলছিল তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রথম দিনকতক ঐ যে মাষ্টার-মশায়ের ওখানে সে বাসা পেলে, সেইটেকেই সে টেনে চলতে লাগল, তার নিজের বাড়িতে নড়বার নাম করতেও চায় না। শেষকালে মাষ্টার মশায় তাকে বল্লেন, পঞ্চু, তুমি বাড়িতে যাও নইলে তোমার ঘর দুয়ারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তোমাকে কিছু টাকা ধার দিচ্চি, তুমি কাপড়ের ব্যবসা করে অল্প অল্প করে শোধ দিয়ো।

প্রথমটা পঞ্চুর মনে একটু খেদ হল—মনে করলে দয়াধর্ম্ম বলে একটা জিনিষ জগতে নেই। তারপরে টাকাটা নেবার বেলায় মাষ্টার মশায় যখন হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিলেন তখন ভাবলে, শোধ ত করতে হবে এমন উপকারের মূল্য কি! মাষ্টারমশায় কাউকে বাইরের দিকে দান করে ভিতরের দিকে ঋণী করতে নিতান্ত নারাজ—তিনি বলেন, মনের ইজ্জৎ চলে গেলে মানুষের জাত মারা হয়।

হ্যাণ্ডনোটে টাকা নেওয়ার পর পঞ্চু মাষ্টার মশায়কে খুব বড় করে প্রণাম করতে আর পারলে না, পায়ের ধুলোটা বাদ পড়ল। মাষ্টার মশায় মনে মনে হাসলেন, তিনি প্রণামটা খাটো করতে

পারলেই বাঁচেন। তিনি বলেন, আমি শ্রদ্ধা করব আমাকে শ্রদ্ধা করবে মানুষের সঙ্গে এই সম্বন্ধই আমার খাঁটি, ভক্তি আমার পাওনার অতিরিক্ত।

পঞ্চু কিছু ধুতি সাড়ি কিছু শীতের কাপড় কিনে আনিয়ে চাষীদের ঘরে ঘরে বেচে বেড়াতে লাগ্‌ল। নগদ দাম পেত না বটে, তেমনি কিছু বা ধান কিছু বা পাট কিছু বা অন্য ফসল যা হাতে হাতে আদায় করে আন্‌ত সেটা দামে কাটা যেত না। দুমাসের মধ্যেই সে মাষ্টার মশায়ের এককিস্তি সুদ এবং আসলের কিছু শোধ করে দিলে এবং এই ঋণশোধের অংশ প্রণামের থেকে কাটান্ পড়ল। পঞ্চু নিশ্চয় মনে করতে লাগ্‌ল, মাষ্টার মশায়কে সে যে একদিন গুরু বলে ঠাউরেছিল, ভুল করেছিল, লোকটার কাঞ্চনের প্রতি দৃষ্টি আছে।

এই রকমে পঞ্চুর দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময় স্বদেশীর বান খুব প্রবল হয়ে এসে পড়ল। আমাদের এবং আশপাশের গ্রাম থেকে যে সব ছেলে কলকাতার স্কুলে কলেজে পড়ত তারা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এল, তাদের অনেকে স্কুল কলেজ ছেড়ে দিলে; তারা সবাই সন্দীপকে দলপতি করে স্বদেশী প্রচারে মেতে উঠল। এদের অনেকেই আমার অবৈতনিক স্কুল থেকে এণ্ট্রেন্স পাস করে গেছে, অনেককেই আমি কলকাতায় পড়বার বৃত্তি দিয়েচি। এরা একদিন দল বেঁধে আমার কাছে এসে উপস্থিত। বল্লে আমাদের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো র‍্যাপার প্রভৃতি একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে।

আমি বল্লুম, সে আমি পারব না।

তারা বল্লে, কেন, আপনার লোকসান হবে?

বুঝলুম, কথাটা আমাকে একটু অপমান করে বলবার জন্যে। আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম, আমার লোকসান নয়, গরীবের লোকসান।

মাষ্টার মশায় ছিলেন, তিনি বলে উঠ্‌লেন, হাঁ, ওঁর লোকসান বই কি, সে লোকসান ত তোমাদের নয়!

তারা বল্লে, দেশের জন্যে—

মাষ্টার মশায় তাদের কথা চাপা দিয়ে বল্লেন, দেশ বল্‌তে মাটি ত নয়, এই সমস্ত মানুষইত। তা তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেচ? আর আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কি নুন খাবে আর কি কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেচ, এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন?

তারা বল্লে, আমরা নিজেও ত দিশি নুন, দিশি চিনি, দিশি কাপড় ধরেচি!

তিনি বল্লেন, তোমাদের মনে রাগ হয়েচে, জেদ হয়েচে, সেই নেশায় তোমার যা করচ খুসি হয়ে করচ—তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দুপয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিন্‌চ, তোমাদের সেই খুসিতে ওরা ত বাধা দিচ্চে না! কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্চ সেটা কেবল জোরের উপরে। ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাঁচনের টানাটানিতে পড়ে' ওদের শেষ-নিশ্বাস পর্য্যন্ত লড়চে কেবলমাত্র কোনোমতে টিঁকে থাকবার জন্যে—ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না,—ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়? জীবনের মহলে বরাবর তোমরা এক-

কোঠায় ওরা আর-এক কোঠায় কাটিয়ে এসেচে—আর আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও, তোমাদের রাগের ঝাল ওদের দিয়ে মিটিয়ে নেবে? আমি ত এ'কে কাপুরুষতা মনে করি। তোমরা নিজে যতদূর পর্য্যন্ত পার কর, মরণ পর্য্যন্ত, আমি বুড়োমানুষ, নেতা বলে তোমাদের নমস্কার করে পিছনে পিছনে চল্‌তে রাজি আছি, কিন্তু ঐ গরীবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয়পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার!

তারা প্রায় সকলেই মাষ্টার মশায়ের ছাত্র, স্পষ্ট কোনো কটু কথা বল্‌তে পারল না, কিন্তু রাগে তাদের রক্ত গরম হয়ে বুকের মধ্যে ফুটতে লাগল। আমার দিকে চেয়ে বল্লে, দেখুন, সমস্ত দেশ আজ যে ব্রত গ্রহণ করেচে কেবল আপনি তাতে বাধা দেবেন?

আমি বল্লুম, আমি বাধা দিতে পারি এমন সাধ্য আমার কি আছে! আমি বরং প্রাণপণে তার আনুকূল্য করব।

এম্ এ ক্লাসের ছাত্রটি বাঁকা হাসি হেসে বল্লে, কি আনুকূল্যটা করচেন?

আমি বল্লুম, দিশি মিল্ থেকে দিশি কাপড় দিশি সুতো আনিয়ে আমাদের হাটে রাখিয়েচি—এমন কি, অন্য এলাকার হাটেও আমার সুতো পাঠাই—

সে ছাত্রটি বলে উঠ্‌ল, কিন্তু আমরা আপনার হাটে গিয়ে দেখে এসেচি, আপনার দিশি সুতো কেউ কিন্‌চে না।

আমি বল্লুম, সে আমার দোষ নয়, আমার হাটের দোষ নয়; তার একমাত্র কারণ, সমস্ত দেশ তোমাদের ব্রত নেয় নি।

মাষ্টার মশায় বল্লেন, শুধু তাই নয়, যারা ব্রত নিয়েচে তারা বিব্রত করবারই ব্রত নিয়েচে। তোমরা চাও, যারা ব্রত নেয়নি তারাই ঐ সুতো কিনে', যারা ব্রত নেয়নি এমন জোলাকে দিয়ে, কাপড় বোনাবে, আর যারা ব্রত নেয়নি তাদের দিয়ে এই কাপড় কেনাবে। কি উপায়ে? না তোমাদের গায়ের জোরে, আর জমিদারের পেয়াদার তাড়ায়! অর্থাৎ ব্রত তোমাদের, কিন্তু উপবাস করবে ওরা, আর উপবাসের পারণ করবে তোমরা!

সায়ান্স ক্লাসের ছাত্রটি বল্লে, আচ্ছা বেশ উপবাসের কোন্ অংশটা আপনারাই নিয়েচেন শুনি!

মাষ্টার মশায় বল্লে, শুন্‌বে? দিশি মিল্ থেকে নিখিলের সেই সুতো নিখিলকেই কিন্‌তে হচ্চে, নিখিলই সেই সুতোয় জোলাদের দিয়ে কাপড় বোনাচ্চে, তাঁতের ইস্কুল খুলে বসেচে, তারপরে বাবাজির যে রকম ব্যবসা-বুদ্ধি তাতে সেই সুতোয় গামছা যখন তৈরী হবে তখন তার দাম দাঁড়াবে কিঙখাবের টুকরোর মত, সুতরাং সে গামছা নিজেই কিনে উনি ওঁর বসবার ঘরের পরদা খাটাবেন, সে পর্দ্দায় ওঁর ঘরের আব্রু থাক্‌বে না; ততদিনে তোমাদের যদি ব্রত সাঙ্গ হয় তখন দিশি কারুকার্য্যের নমুনা দেখে তোমরাই সব চেয়ে চেঁচিয়ে হাসবে; আর, কোথাও যদি সেই রঙীন গামছার অর্ডার এবং আদর মেলে সে ইংরেজের কাছে।

এতদিন ওঁর কাছে আছি, মাষ্টার মশায়ের এমনতর শান্তিভঙ্গ

হতে আমি কোনোদিন দেখি নি। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কিছুদিন থেকে ওঁর হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা নিঃশব্দে জমে আসচে—সে কেবল আমাকে ভালোবাসেন বলে। সেই বেদনাতেই ওঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে দিয়েচে।

মেডিকাল-কলেজের ছাত্র বলে উঠ্‌ল, আপনারা বয়সে বড়, আপনাদের সঙ্গে তর্ক আমরা করব না। তা হলে এক কথায় বলুন, আপনাদের হাট থেকে বিলিতি মাল আপনারা সরাবেন না?

আমি বল্লুম, না সরাব না, কারণ, সে মাল আমার নয়।

এম্ এ ক্লাসের ছাত্রটি ঈষৎ হেসে বল্লে, কারণ, তাতে আপনার লোকসান আছে?

মাষ্টার মশায় বল্লেন, হাঁ তাতে ওঁর লোকসান আছে সুতরাং সে উনিই বুঝবেন।

তখন ছাত্রেরা সকলে উচ্চৈস্বরে "বন্দেমাতরং" বলে চীৎকার করে বেরিয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই মাষ্টার মশায় পঞ্চুকে আমার কাছে নিয়ে এসে উপস্থিত। ব্যাপার কি?

ওদের জমিদার হরিশকুণ্ডু পঞ্চুকে একশো টাকা জরিমানা করেচে।

কেন, ওর অপরাধ কি?

ও বিলিতি কাপড় বেচেচে। ও জমিদারকে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বল্লে, পরের কাছে ধার-করা টাকায় কাপড় ক'খানা কিনেচে এইগুলো বিক্রী হয়ে গেলেই ও এমন কাজ আর কখনো

করবে না। জমিদার বল্লে, সে হচ্চে না, আমার সামনে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্ তবে ছাড়া পাবি। ও থাক্‌তে না পেরে হঠাৎ বলে ফেল্লে, আমার ত সে সামর্থ্য নেই, আমি গরীব; আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। শুনে জমিদার লাল হয়ে উঠে বল্লে, হারামজাদা, কথা কইতে শিখেচ বটে, —লাগাও জুতি! এই বলে এক চোট অপমান ত হয়েই গেল, তার পরে একশো টাকা জরিমানা! এরাই সন্দীপের পিছনে পিছনে চীৎকার করে বেড়ায় বন্দেমাতরং! এরা দেশের সেবক!

কাপড়ের কি হল?

পুড়িয়ে ফেলেচে।

সেখানে আর কে ছিল?

লোকের সংখ্যা ছিল না, তারা চীৎকার করতে লাগ্‌ল বন্দেমাতরং। সেখানে সন্দীপ ছিলেন তিনি এক মুঠো ছাই তুলে নিয়ে বল্লেন, ভাই সব, বিলিতি ব্যবসার অন্ত্যেষ্টি সৎকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বল্‌ল--এই ছাই পবিত্র—এই ছাই গায়ে মেখে ম্যানচেষ্টারের জাল কেটে ফেলে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের সাধনা করতে বেরতে হবে!

আমি পঞ্চুকে বল্লুম, পঞ্চু তোমাকে ফৌজদারী করতে হবে।

পঞ্চু বল্লে, কেউ সাক্ষি দেবে না।

কেউ সাক্ষি দেবে না? সন্দীপ! সন্দীপ!

সন্দীপ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে, কি, ব্যাপারটা কি?

এই লোকটার কাপড়ের বস্তা ওর জমিদার তোমার সামনে পুড়িয়েচে তুমি সাক্ষি দেবে না?

সন্দীপ হেসে বল্লে, দেব বই কি। কিন্তু আমি যে ওর জমিদারের পক্ষে সাক্ষী!

আমি বল্লুম, সাক্ষি আবার জমিদারের পক্ষে কি! সাক্ষি ত সত্যের পক্ষে!

সন্দীপ বল্লে, যেটা ঘটেচে সেটাই বুঝি একমাত্র সত্য?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অন্য সত্যটা কি?

সন্দীপ বল্লে, যেটা ঘটা দরকার। যে সত্যকে আমাদের গড়ে তুল্‌তে হবে সেই সত্যের জন্যে অনেক মিথ্যে চাই, যেমন মায়া দিয়ে এই জগৎ গড়া হচ্চে। পৃথিবীতে যারা সৃষ্টি করতে এসেচে তারা সত্যকে মানে না, তারা সত্যকে বানায়।

অতএব—

অতএব তোমরা যাকে মিথ্যে সাক্ষি বল আমি সেই মিথ্যে সাক্ষি দেব। যারা রাজ্য বিস্তার করেচে, সাম্রাজ্য গড়েচে, সমাজ বেঁধেচে, ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করেচে, তারাই তোমাদের বাঁধা সত্যের আদালতে বুক ফুলিয়ে মিথ্যে সাক্ষি দিয়ে এসেচে। যারা শাসন করবে তারা মিথ্যেকে ডরায় না, যারা শাসন মানবে তাদের জন্যেই সত্যের লোহার শিকল। তোমরা কি ইতিহাস পড়নি? তোমরা কি জান না, পৃথিবীর বড় বড় রান্নাঘরে যেখানে রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হচ্চে সেখানে মস্‌লাগুলো সব মিথ্যে!

জগতে অনেক খিচুড়ি পাকানো হয়েচে এখন—

না গো, তোমরা খিচুড়ি পাকাবে কেন, তোমাদের টুঁটি চেপে ধরে খিচুড়ি গেলাবে। বঙ্গবিভাগ করবে, বল্‌বে তোমাদের

সুবিধের জন্যেই; শিক্ষার দরজা এঁটে বন্ধ করতে থাক্‌বে, বল্‌বে তোমাদেরই আদর্শ অত্যুচ্চ করে তোলবার সদভিপ্রায়ে; তোমরা সাধু হয়ে অশ্রুপাত করতে থাক্‌বে আর আমরা অসাধু হয়ে মিথ্যের দুর্গ শক্ত করে বানাব। তোমাদের অশ্রু টিঁক্‌বে না কিন্তু আমাদের দুর্গ টিঁক্‌বে।

মাষ্টার মশায় আমাকে বল্লেন, এসব তর্ক করবার কথা নয় নিখিল। আমাদের ভিতরেই এবং সকলের মূলেই যে একটি বিরাট সত্য আছে একথা যে-লোক নিজের ভিতর থেকেই উপলব্ধি না করতে পারে সে লোক কেমন করে' বিশ্বাস করবে যে সেই অন্তরতম সত্যকেই সমস্ত আবরণ মোচন করে' প্রকাশ করাই মানুষের চরম লক্ষ্য, বাইরের জিনিষকে স্তূপাকার করে তোলা লক্ষ্য নয়।

সন্দীপ হেসে উঠে বল্লে, আপনার এ কথা মাষ্টার মশায়ের মত কথাই হয়েছে! এ সকল কেবল বইয়ের পাতায় দেখা যায়, চোখের পাতায় দেখ্‌চি বাইরের জিনিষকে স্তূপাকার করে তোলাই মানুষের চরম লক্ষ্য, আর সেই লক্ষ্যকে যারা বড়রকম করে' সাধন করেচে তারা ব্যবসার বিজ্ঞাপনে প্রতিদিন বড় অক্ষরে মিথ্যা কথা বলে, তারা রাষ্ট্রনীতির সদর খাতায় খুব মোটা কলমে জাল হিসাব লেখে, তাদের খবরের কাগজ মিথ্যার বোঝাই জাহাজ, আর মাছি যেমন করে সান্নিপাতিক জ্বরের বীজ বহন করে তাদের ধর্ম্মপ্রচারকেরা তেমনি করে মিথ্যাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ায়। আমি তাদেরই শিষ্য—আমি যখন কন্‌গ্রেসের দলে ছিলুম তখন আমি বাজার বুঝে আধ-সের সত্যে সাড়ে-পনেরো

সের জল মেশাতে কিছুমাত্র লজ্জা করি নি, আজ আমি সে দল থেকে বেরিয়ে এসেচি আজও আমি এই ধর্ম্মনীতিকেই সার জেনেচি যে সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্চে ফললাভ।

মাষ্টার মশায় বল্লেন, সত্যফল লাভ।

সন্দীপ বল্লে, হাঁ সেই ফসল মিথ্যের আবাদে তবে ফলে। পায়ের নীচের মাটি একেবারে চিরে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়ে তবে সেই ফসল ফলে। আর যা সত্য, যা আপ্‌নি জন্মায় সে হচ্চে আগাছা, কাঁটাগাছ, তার থেকেই যারা ফলের আশা করে তারা কীটপতঙ্গের দল।

এই বলেই সন্দীপ বেগে বেরিয়ে চলে গেল। মাষ্টার মশায় একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, জান নিখিল, সন্দীপ অধার্ম্মিক নয় ও বিধার্ম্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ; চাঁদই বটে কিন্তু ঘটনা ক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকে গিয়ে পড়েচে।

আমি বল্লুম, সেই জন্যে চিরদিনই ওর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই কিন্তু ওর প্রতি আমার স্বভাবের আকর্ষণ আছে। ও আমার অনেক ক্ষতি করেচে, আরো করবে, কিন্তু ওকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারিনে।

তিনি বল্লেন, সে আমি ক্রমে বুঝতে পারচি। আমি অনেক-দিন আশ্চর্য্য হয়ে ভেবেচি, সন্দীপকে এতদিন তুমি কেমন করে সহ্য করে আছ। এমন কি, এক-একদিন আমার সন্দেহ হয়েচে এর মধ্যে তোমার দুর্ব্বলতা আছে। এখন দেখ্‌তে পাচ্চি ওর সঙ্গে তোমার কথারই মিল নেই কিন্তু ছন্দের মিল রয়েচে।

আমি কৌতুক করে বল্লুম, মিত্রে মিত্রে মিলে অমিত্রাক্ষর!

হয় ত আমাদের ভাগ্যকবি প্যারাডাইস্ লষ্ট-এর মত একটা এপিক লেখবার সঙ্কল্প করেচেন।

মাষ্টারমশায় বল্লেন, এখন পঞ্চুকে নিয়ে কি করা যায়?

আমি বল্লুম, আপনি বলেছিলেন, যে-বিঘেকয়েক জমির উপর পঞ্চুর বাড়ি আছে সেটাতে অনেকদিন থেকে ওর মৌরসি স্বত্ব জন্মেছে, সেই স্বত্ব কাঁচিয়ে দেবার জন্যে ওর জমিদার অনেক চেষ্টা করচে—ওর সেই জমিটা আমি কিনে নিয়ে সেইখানেই ওকে আমার প্রজা করে রেখে দিই।

আর ওর একশো টাকার জরিমানা?

সে জরিমানার টাকা কিসের থেকে আদায় হবে? জমি যে আমার হবে।

আর ওর কাপড়ের বস্তা?

আমি আনিয়ে দিচ্চি। আমার প্রজা হয়ে ও যেমন ইচ্ছে বিক্রি করুক্, দেখি ওকে কে বাধা দেয়?

পঞ্চু হাত জোড় করে বল্লে, হুজুর রাজায় রাজায় লড়াই, পুলিশের দারোগা থেকে উকিল ব্যারিষ্টর পর্য্যন্ত শকুনি গৃধিনীর পাল জমে যাবে, সবাই দেখে আমোদ করবে কিন্তু মরবার বেলায় আমিই মরব।

কেন তোর কি করবে?

ঘরে আমার আগুন লাগিয়ে দেবে, ছেলে মেয়ে সুদ্ধ নিয়ে পুড়ব।

মাষ্টার মশায় বল্লেন, আচ্ছা, তোর ছেলেমেয়েরা কিছুদিন আমার ঘরেই থাক্‌বে, তুই ভয় করিস্ নে—তোর ঘরে বসে তুই

যেমন ইচ্ছে ব্যবসা কর্ কেউ তোর গায়ে হাত দিতে পারবে না। অন্যায়ের কাছে তুই হার মেনে পালাবি এ আমি হতে দেব না। যত সইব বোঝা ততই বাড়বে।

সেই দিনই পঞ্চুর জমি কিনে রেজেষ্ট্রি করে আমি দখল করে বস্‌লুম। তার পর থেকে ঝুটোপুটি চল্‌ল।

পঞ্চুর বিষয়-সম্পত্তি ওর মাতামহের। পঞ্চু ছাড়া তার ওয়ারেশ কেউ ছিল না, এই কথাই সকলের জানা। হঠাৎ কোথা থেকে এক মামী এসে জুটে জীবনস্বত্বের দাবী করে তার পুঁটুলি, তার প্যাট্‌রা, হরিনামের ঝুলি এবং একটি প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা ভাইঝি নিয়ে পঞ্চুর ঘরের মধ্যে উপস্থিত।

পঞ্চু অবাক্ হয়ে বল্লে, আমার মামী ত বহুকাল হল মারা গেছে।

তার উত্তর, প্রথম-পক্ষের মামী মারা গেছে বটে, দ্বিতীয়-পক্ষের অভাব হয় নি।

কিন্তু মামার মৃত্যুর অনেক পরে যে মামী মরেচে, দ্বিতীয় পক্ষের ত সময় ছিল না।

স্ত্রীলোকটি স্বীকার করলে দ্বিতীয়-পক্ষটি মৃত্যুর পরের নয় মৃত্যুর পূর্ব্বের। সতীনের ঘর করবার ভয়ে বাপের বাড়ি ছিল, স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রবল বৈরাগ্যে সে বৃন্দাবনে চলে যায়; কুণ্ডু-জমিদারের আম্‌লারা এসব কথা কেউ কেউ জানে, বোধকরি প্রজাদেরও কারো কারো জানা আছে, আর জমিদার যদি জোরে হাঁক দেয় তবে বিবাহের সময় যারা নিমন্ত্রণ খেয়েছিল তারাও বেরিয়ে আস্‌তে পারে।

সেদিন দুপুর-বেলা পঞ্চুর এই দুর্গ্রহ নিয়ে যখন আমি খুব ব্যস্ত আছি এমন সময় অন্তঃপুর থেকে বিমলা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম, জিজ্ঞাসা করলুম, কে ডাক্‌চে?

বল্লে, রাণীমা।

বড় রাণীমা?

না, ছোট রাণীমা।

ছোটরাণী? মনে হল একশো বছর ছোটরাণী আমাকে ডাকেনি।

বৈঠকখানা ঘরে সবাইকে বসিয়ে রেখে আমি অন্তঃপুরে চল্লুম। শোবার ঘরে গিয়ে বিমলাকে দেখে আরো আশ্চর্য্য হলুম যখন দেখা গেল, সর্বাঙ্গে, বেশি নয়, অথচ বেশ একটু সাজের আভাস আছে। কিছুদিন এই ঘরটার মধ্যেও যত্নের লক্ষণ দেখিনি, সব এমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল যে, মনে হত যেন ঘরটা সুদ্ধ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। ওরি মধ্যে আগেকার মত আজ একটু পারিপাট্য দেখতে পেলুম।

আমি কিছু না বলে বিমলার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিমলার মুখ একটু লাল হয়ে উঠ্‌ল, সে ডান হাত দিয়ে তার বাঁ হাতের বালা দ্রুতবেগে ঘোরাতে ঘোরাতে বল্লে, দেখ, সমস্ত বাংলা দেশের মধ্যে কেবল আমাদের এই হাটটার মধ্যেই বিলিতি কাপড় আসচে এটা কি ভালো হচ্চে?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কি করলে ভালো হয়?

ঐ জিনিষগুলো বের করে দিতে বল না!

জিনিষগুলো ত অমার নয়!

কিন্তু হাট ত তোমার?

হাট আমার চেয়ে তাদের অনেক বেশি যারা ঐ হাটে জিনিষ কিন্‌তে আসে।

তারা দিশি জিনিষ কিনুক না।

যদি কেনে ত আমি খুসি হব, কিন্তু যদি না কেনে?

সে কি কথা? ওদের এত বড় আস্পর্দ্ধা হবে? তুমি হলে—

আমার সময় অল্প, এ নিয়ে তর্ক করে কি হবে? আমি অত্যাচার করতে পারব না।

অত্যাচার ত তোমার নিজের জন্যে নয়, দেশের জন্যে,—

দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা। সে কথা তুমি বুঝতে পার্‌বে না।

এই বলে আমি চলে এলুম। হঠাৎ আমার চোখের সামনে সমস্ত জগৎ যেন দীপ্যমান হয়ে উঠ্‌ল। মাটির পৃথিবীর ভার যেন চলে গেছে, সে যে আপনার জীবপালনের সমস্ত কাজ করেও আপনার নিরন্তর বিকাশের সমস্ত পর্য্যায়ের ভিতরেও একটি অদ্ভুত শক্তির বেগে দিন রাত্রিকে জপমালার মত ফেরাতে ফেরাতে যুগে যুগে আকাশের মধ্যে ছুটে চলেচে সেইটে আমি আমার রক্তের মধ্যে অনুভব করলুম। কর্ম্মভারের সীমা নেই অথচ মুক্তি-বেগেরও সীমা নেই! কেউ বাঁধবে না, কেউ বাঁধবে না, কিছুতেই বাঁধবে না। অকস্মাৎ আমার মনের গভীরতা থেকে একটা বিপুল আনন্দ যেন সমুদ্রের জলস্তম্ভের মত আকাশের মেঘকে গিয়ে স্পর্শ করলে।

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করলুম, হঠাৎ তোমার এ হ'ল কি? প্রথমটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না, তার পরে পরিষ্কার বুঝলুম, এই কয়দিন যে বন্ধন দিনরাত আমার মনের ভিতরে এমন পীড়া দিয়েচে আজ তার একটা মস্ত ফাঁক দেখা গেল। আমি ভারি আশ্চর্য্য হলুম আমার মনের মধ্যে কোনো ঘোর ছিল না। ফোটোগ্রাফের প্লেটে যে রকম করে ছবি পড়ে আমার দৃষ্টিতে বিমলার সমস্ত-কিছু তেমনি করে অঙ্কিত হল। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম বিমলা আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করবার জন্যে বিশেষ করে সাজ করেছে। আজকের দিনের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আমি কখনই বিমলাকে এবং বিমলার সাজকে তফাৎ করে দেখিনি। আজ ওর বিলিতি খোঁপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী বলেই দেখ্‌লুম—শুধু তাই নয়, একদিন এই খোঁপা আমার কাছে অমূল্য ছিল, আজ দেখি এ সস্তা দামে বিকোবার জন্যে প্রস্তুত।

সন্দীপের সঙ্গে আমার দেশ নিয়ে পদে পদে বিরোধ হয়, কিন্তু সে সত্যকার বিরোধ;—কিন্তু বিমলা দেশের নাম করে যে কথাগুলো বল্‌চে সে কেবলমাত্র সন্দীপের ছায়া দিয়ে গড়া, আইডিয়া দিয়ে নয়,--এই ছায়ার যদি বদল হয়, ওর কথারও বদল হবে। এই সমস্তই আমি খুব স্বচ্ছ করে দেখ্‌লুম, লেশমাত্র কুয়াসা কোথাও ছিল না।

আমার সেই শোবার ঘরের ভাঙা খাঁচাটির ভিতর থেকে যখন সেই হেমন্ত মধ্যাহ্নের খোলা আলোর মধ্যে বেরিয়ে এলুম, তখন একদল শালিখ আমার বাগানের গাছের তলায় অকস্মাৎ কি কারণে

ভারি উত্তেজনার সঙ্গে কিচিমিচি বাধিয়েচে; বারান্দার সাম্‌নে দক্ষিণে খোয়া-ফেলা রাস্তার দুইধারে সারি সারি কাঞ্চন গাছ অজস্র গোলাপী ফুলের মুখরতায় আকাশকে অভিভূত করে দিয়েছে; অদূরে মেঠো পথের প্রান্তে শূন্য গোরুর গাড়ি আকাশে পুচ্ছ তুলে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আছে, তারই বন্ধনমুক্ত জোড়া গোরুর মধ্যে একটা, ঘাস খাচ্চে, আর-একটা রৌদ্রে শুয়ে পড়ে আছে, আর তার পিঠের উপর একটা কাক ঠোকর মেরে মেরে কীট উদ্ধার করচে—আরামে গোরুটার চোখ বুজে এসেচে। আজ আমার মনে হল, বিশ্বের এই যা-কিছু খুব সহজ অথচ অত্যন্ত বৃহৎ আমি ভারি স্পন্দিত বক্ষের খুব কাছে এসে বসেচি, তারই আতপ্ত নিশ্বাস ঐ কাঞ্চন ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে আমার হৃদয়ের উপরে এসে পড়চে। আমার মনে হল, আমি আছি এবং সমস্তই আছে, এই দুইয়ে মিলে আকাশ জুড়ে যে সঙ্গীত বাজচে সে কি উদার, কি গভীর, কি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর।

তার পরে মনে পড়ল, দারিদ্র্য এবং চাতুরীর ফাঁদে আট্‌কা-পড়া পঙ্গু; সেই পঙ্গুকে যেন দেখ্‌লুম আজ হেমন্তের রৌদ্রে বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ বাট জুড়ে ঐ গোরুটার মত চোখ বুজে পড়ে আছে—কিন্তু আরামে নয়, ক্লান্তিতে, ব্যাধিতে, উপবাসে। সে যেন বাংলার সমস্ত গরীব রায়তের প্রতিমূর্ত্তি। দেখ্‌তে পেলুম পরম আচারনিষ্ঠ ফোঁটাকাটা স্থূলতনু হরিশকুণ্ডু। সেও ছোট নয়, সেও বিরাট্, সে যেন বাঁশবনের তলায় বহুকালের বদ্ধ পচা দীঘির উপর তেলা সবুজ একটা অখণ্ড সরের মত এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিষ বুদ্বুদ উদ্গার করচে।

যে প্রকাণ্ড তামসিকতা একদিকে উপবাসে কৃশ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর-একদিকে মুমূর্ষুর রক্তশোষণে স্ফীত হয়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত করে পড়ে আছে, শেষ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে,—এই কাজটা মুলতবি হয়ে পড়ে রয়েচে শত শত বৎসর ধরে'। আমার মোহ ঘুচুক, আমার আবরণ কেটে যাক্, আমার পৌরুষ অন্তঃপুরের স্বপ্নের জালে ব্যর্থ হয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন! আমরা পুরুষ, মুক্তিই আমাদের সাধনা, আইডিয়ালের ডাক শুনে আমরা সামনের দিকে ছুটে চলে যাব, দৈত্যপুরীর দেয়াল ডিঙিয়ে বন্দিনী লক্ষ্মীকে আমাদের উদ্ধার করে আনতে হবে—যে মেয়ে তার নিপুণ হাতে আমাদের সেই অভিযানের জয়পতাকা তৈরী করে দিচ্চে সেই আমাদের সহধর্ম্মিণী, আর ঘরের কোণে যে আমাদের মায়াজাল বুনচে, তার ছদ্মবেশ ছিন্ন করে' তার মোহমুক্ত সত্যকার পরিচয় যেন আমরা পাই,—তাকে আমাদের নিজেরই কামনার রসে-রঙে অপ্সরী সাজিয়ে তুলে যেন নিজের তপস্যা ভঙ্গ করতে না পাঠাই! আজ আমার মনে হচ্চে আমার জয় হবে,—আমি সহজের রাস্তায় দাঁড়িয়েচি, সহজ চোখে সব দেখ্‌চি —আমি মুক্তি পেয়েচি, আমি মুক্তি দিলুম, যেখানে আমার কাজ সেইখানেই আমার উদ্ধার।

আমি জানি বেদনায় বুকের নাড়ীগুলো আবার এক-একবার টনটন্ করে উঠ্‌বে। কিন্তু সেই বেদনাকেও আমি এবার চিনে নিয়েচি—তাকে আমি আর শ্রদ্ধা করতে পারব না। আমি জানি সে কেবলমাত্রই আমার—তার দাম কিসের? যে দুঃখ বিশ্বের

সেই ত আমার গলার হার হবে। হে সত্য, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও,—কিছুতেই আমাকে ফিরে যেতে দিয়োনা ছলনার ছদ্ম-স্বর্গলোকে। আমাকে একলা পথের পথিক যদি কর সে পথ তোমারই পথ হোক্—আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তোমার জয়ভেরী বেজেচে আজ!

সন্দীপের আত্মকথা

সেদিন অশ্রুজলের বাঁধ ভাঙে আর কি। আমাকে বিমলা ডাকিয়ে আন্‌লে কিন্তু খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বের হল না, তার দুই চোখ ঝকঝক করতে লাগল। বুঝলুম নিখিলের কাছে কোনো ফল পায়নি। যেমন করে হোক ফল পাবে সেই অহঙ্কার ওর মনে ছিল কিন্তু সে আশা আমার মনে ছিল না। পুরুষেরা যেখানে দুর্ব্বল, মেয়েরা সেখানে তাদের খুব ভালো করেই চেনে, কিন্তু পুরুষেরা যেখানে খাঁটি পুরুষ মেয়েরা সেখানকার রহস্য ঠিক ভেদ করতে পারে না। আসল কথা, পুরুষ, মেয়ের কাছে রহস্য, আর মেয়ে, পুরুষের কাছে রহস্য, এই যদি না হবে, তাহলে এই দুটো জাতের ভেদ জিনিষটা প্রকৃতির পক্ষে নেহাৎ একটা অপব্যয় হত।

অভিমান! যেটা দরকার সেটা ঘটল না কেন, সে হিসেব মনে নেই, কিন্তু, আমি যেটা মুখ ফুটে চাইলুম সেটা কেন ঘটল না এইটেই হ'ল খেদ। ওদের ঐ আমির দাবিটাকে নিয়ে যে কত রং কত ভঙ্গী, কত কান্না কত ছল, কত হাবভাব তার আর অন্ত নেই; ঐটেতেই ত ওদের মাধুর্য্য। ওরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ব্যক্তিবিশেষ। আমাদের যখন বিধাতা তৈরি করছিলেন তখন

ছিলেন তিনি ইস্কুলমাষ্টার, তখন তাঁর ঝুলিতে কেবল পুঁথি আর তত্ত্ব; আর ওদের বেলা তিনি মাষ্টারিতে জবাব দিয়ে হয়ে উঠেচেন আর্টিষ্ট; তখন তুলি আর রঙের বাক্স!

তাই সেই অশ্রুভরা অভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্য্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জলভরা আগুনভরা রাঙা মেঘের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে আমার ভারি মিষ্টি দেখ্‌তে লাগ্‌ল। আমি খুব কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলুম; সে হাত ছাড়িয়ে নিলে না, থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল। বল্‌লুম, মক্ষি, আমরা দুজনে সহযোগী, আমাদের এক লক্ষ্য। বস তুমি।

এই বলে বিমলাকে একটা চৌকিতে বসিয়ে দিলুম। আশ্চর্য্য! এতখানি বেগ কেবল এইটুকুতে এসে ঠেকে গেল। বর্ষার যে পদ্মা ভাঙতে ভাঙতে ডাক্‌তে ডাক্‌তে আস্‌চে, মনে হয় সামনে কিছু-আর রাখ্‌বে না, সে হঠাৎ একটা-জায়গায় যেন বিনা কারণে তার ভাঙনের সোজা লাইন ছেড়ে একেবারে এপার থেকে ওপারে চলে গেল। তার তলার দিকে কোথায় কি বাধা লুকিয়েছিল মকরবাহিনী নিজেও তা জান্‌ত না। আমি বিমলার হাত চেপে ধরলুম, আমার দেহ-বীণার ছোট বড় সমস্ত তার ভিতরে ভিতরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু ঐ আস্থায়ীতেই কেন থেমে গেল, অন্তরা পর্য্যন্ত কেন পৌঁছল না? বুঝতে পারলুম জীবনের স্রোতঃপথের গভীরতম তলাটা বহুকালের গতি দিয়ে তৈরি হয়ে গেচে, ইচ্ছার বন্যা যখন প্রবল হয়ে বয় তখন সেই তলার পথটাকে কোথাও বা ভাঙে, আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়! ভিতরে একটা সঙ্কোচ কোথাও রয়ে গেচে, সেটা কি? সে কোনো-একটা জিনিষ নয়, সে

অনেকগুলোতে জড়ানো। সেই জন্যে তার চেহারা স্পষ্ট বুঝতে পারিনে, এই কেবল বুঝি সেটা একটা বাধা। এই বুঝি, আমি আসলে যা তা আদালতের সাক্ষ্য দ্বারা কোনোকালে পাকা দলিলে প্রমাণ হবে না। আমি নিজের কাছে নিজে রহস্য, সেই জন্যেই নিজের উপর এমন প্রবল টান; ওকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ চিনে ফেল্লেই ওকে টান মেরে ফেলে দিয়ে একেবারে তুরীয় অবস্থা হয়ে যেত।

চৌকিতে বসে দেখতে-দেখতে বিমলার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মনে মনে সে বুঝলে তার একটা ফাঁড়া কেটে গেল। ধূমকেতু ত পাশ দিয়ে সোঁ করে চলে গেল কিন্তু তার আগুনের পুচ্ছের ধাক্কায় ওর মনপ্রাণ কিছুক্ষণের জন্য যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। আমি এই ঘোরটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে বল্লুম, বাধা আছে কিন্তু তা নিয়ে খেদ করব না, লড়াই করব! কি বল রাণী।

বিমলা একটু কেশে তার বদ্ধ স্বরকে কিছু পরিষ্কার করে নিয়ে শুধু বল্লে, হাঁ।

আমি বল্লুম, কি করে কাজটা আরম্ভ করতে হবে তারি প্ল্যানটা একটু স্পষ্ট করে ঠিক করে নেওয়া যাক্।

বলে' আমি আমার পকেট থেকে পেন্সিল কাগজ বের করে নিয়ে বল্লুম। কলকাতা থেকে আমাদের দলের যে সব ছেলে এসে পড়েচে তাদের মধ্যে কি রকম কাজের বিভাগ করে দিতে হবে তারি আলোচনা করতে লাগলুম—এমন সময়ে হঠাৎ মাঝখানে বিমলা বলে উঠল, এখন থাক্, সন্দীপ বাবু, আমি পাঁচটার সময় আস্‌ব, তখন সব কথা হবে।—এই বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

বুঝলুম, এতক্ষণ চেষ্টা করে কিছুতে আমার কথায় বিমলা মন দিতে পারছিল না ; নিজের মনটাকে নিয়ে এখন কিছুক্ষণ ওর একলা থাকা চাই। হয়ত বিছানায় পড়ে ওকে কাঁদতে হবে।

বিমলা চলে গেলে ঘরের ভিতরকার হাওয়া যেন আরও বেশি মাতাল হয়ে উঠল। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তবে যেমন আকাশের মেঘ রঙে রঙে রঙীন হয়ে ওঠে, তেমনি বিমলা চলে যাওয়ার পরে আমার মনটা রঙিয়ে রঙিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। মনে হতে লাগ্‌ল ঠিক সময়টাকে বয়ে যেতে দিয়েচি। এ কি কাপুরুষতা! আমার এই অদ্ভুত দ্বিধায় বিমলা বোধ হয় আমার পরে অবজ্ঞা করেই চলে গেল! করতেও পারে।

এই নেশার আবেশে রক্তের মধ্যে যখন ঝিম্‌ঝিম্ করচে এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে অমূল্য আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ক্ষণকালের জন্য ইচ্ছে হল তাকে এখন বিদায় করে দিই,—কিন্তু মন স্থির করবার পূর্ব্বেই সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল।

তারপর নুন চিনি কাপড়ের লড়াইয়ের খবর। তখনি ঘরের হাওয়া থেকে নেশা ছুটে গেল। মনে হল স্বপ্ন থেকে জাগ্‌লুম। কোমর বেঁধে দাঁড়ালুম। তার পরে চল রণক্ষেত্রে! হর হর ব্যোম্ ব্যোম্!

খবর এই, হাটে কুণ্ডুদের যে সব প্রজা মাল আনে তারা বশ মেনেচে। নিখিলের পক্ষের আমলারা প্রায় সকলেই গোপনে আমাদের দলে। তারা অন্তর্ টিপুনি দিচ্চে! মাড়োয়ারিরা বল্‌চে, আমাদের কাছ থেকে কিছু দণ্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন, নইলে ফতুর হয়ে যাব। মুসলমানেরা কিছুতেই বাগ মানচে না।

একটা চাষী তার ছেলে মেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জর্ম্মন শাল কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের দলের এখানকার গ্রামের একজন ছেলে তার সেই শাল ক'টা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েচে। তাই নিয়ে গোলমাল চল্‌চে। আমরা তাকে বলচি তোকে দিশি গরম কাপড় কিনে দিচ্চি; কিন্তু সস্তা দামের দিশি গরম কাপড় কোথায়? রঙীন কাপড় ত দেখিনে। কাশ্মিরী শাল ত ওকে কিনে দিতে পারিনে; সে এসে নিখিলের কাছে কেঁদে পড়েচে। তিনি সেই ছেলেটার নামে নালিশ করবার হুকুম দিয়েচেন। নালিশের ঠিকমত তদ্বির যাতে না হয় আমলারা তার ভার নিয়েচে, এমন কি, মোক্তার আমাদের দলে।

এখন কথা হচ্চে, যার কাপড় পোড়াব তার জন্যে যদি দিশি কাপড় কিনে দিতে হয়, তার পরে আবার মামলা চলে, তাহলে তার টাকা পাই কোথায়? আর ঐ পুড়তে পুড়তে বিলিতি কাপড়ের ব্যবসা যে গরম হয়ে উঠবে। নবাব যখন বেলোয়ারী ঝাড়-ভাঙার শব্দে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ঘরে ঝাড় ভেঙে বেড়াত তখন ঝাড়ওয়ালার ব্যবসার খুব উন্নতি হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সস্তা অথচ দিশি গরম কাপড় বাজারে নেই। শীত এসে পড়েচে এখন বিলিতি শাল র‍্যাপার মেরিনো রাখ্‌ব কি তাড়াব?

আমি বল্লুম, যে লোক বিলিতি কাপড় কিনবে তাকে দিশি কাপড় বখশিশ দেওয়া চল্‌বে না। দণ্ড তারই হওয়া চাই, আমাদের নয়। মাম্‌লা যারা করতে যাবে তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেব, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না। ওহে অমূল্য,

অমন চম্‌কে উঠলে চল্‌বে না। চাষীর খোলায় আগুন দিয়ে রোসনাই করায় আমার সখ নেই। কিন্তু এ হল যুদ্ধ। দুঃখ দিতে যদি ডরাও তাহলে মধুর রসে ডুব মার, রাধাভাবে ভোর হয়ে ক বল্‌তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়।

আর বিলিতি গরম কাপড়? যত অসুবিধেই হোক্ ও কিছুতেই চল্‌বে না। বিলিতির সঙ্গে কোনো কারণেই কোনো খানেই রফা করতে পারব না। বিলিতি রঙীন র‍্যাপার যখন ছিল না তখন চাষীর ছেলে মাথার উপর দিয়ে দোলাই জড়িয়ে শীত কাটাত এখনো তাই করবে। তাতে তাদের সখ মিটবে না জানি, কিন্তু সখ মেটাবার সময় এখন নয়।

হাটে যারা নৌকো আনে তাদের মধ্যে অনেককে ছলে বলে বাধ্য করবার পথে কতকটা আনা গেছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় হচ্চে মিরজান, সে কিছুতেই নরম হল না। এখানকার নায়েব কুলদাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, ওর ঐ নৌকোখানা ডুবিয়ে দিতে পার কিনা? সে বল্লে, সে আর শক্ত কি, পারি; কিন্তু দায় ত শেষকালে আমার ঘাড়ে পড়বে না?—আমি বল্‌লুম দায়টাকে কারো ঘাড়ে পড়বার মত আল্‌গা জায়গায় রাখা উচিত নয়, তবু—নিতান্তই যদি পড়-পড় হয় ত আমিই ঘাড় পেতে দেব।

হাট হয়ে গেলে মিরজানের খালি নৌকো ঘাটে বাঁধা ছিল। মাঝিও ছিল না। নায়েব কৌশল করে একটা যাত্রার আসরে তাদের নিমন্ত্রণ করিয়েছিল। সেই রাত্রে নৌকোটাকে খুলে স্রোতের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ফুটো করে তার মধ্যে রাবিশের বস্তা চাপিয়ে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল।

মীরজান সমস্তই বুঝলে। সে একেবারে আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বল্লে, হুজুর গোস্তাকি হয়েছিল, এখন—

আমি বল্লুম, এখন সেটা এমন স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে কি করে?

তার জবাব না দিয়ে সে বল্লে, সে নৌকোখানার দাম দু হাজার টাকার কম হবে না, হুজুর! এখন আমার হুঁস হয়েচে—এবারকার মত কসুর যদি মাপ করেন—

বলে সে আমার পায়ে জড়িয়ে ধরল। তাকে বল্লুম, আর দিন দশেক পরে আমার কাছে আস্‌তে। এই লোকটাকে যদি এখন দু হাজার টাকা দেওয়া যায় তা হলে এ'কে কিনে রাখতে পারি। এরই মত মানুষকে দলে আন্‌তে পারলে তবে কাজ হয়। কিছু বেশি করে টাকার যোগাড় করতে না পারলে কোনো ফল হবেনা।

বিকেলবেলায় বিমলা ঘরে আস্‌বামাত্র চৌকী থেকে উঠে তাকে বল্লুম, রাণী, সব হয়ে এসেচে, আর দেরি নেই, এখন টাকা চাই।

বিমলা বল্লে, টাকা? কত টাকা?

আমি বল্লুম, খুব বেশি নয়, কিন্তু যেখান থেকে হোক্‌ টাকা চাই!

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, কত চাই বলুন!

আমি বল্লুম, আপাতত কেবল পঞ্চাশ হাজার মাত্র।

টাকার সংখ্যাটা শুনে বিমলা ভিতরে ভিতরে চম্‌কে উঠলে কিন্তু বাইরে সেটা গোপন করে গেল। বার বার সে কি করে বল্‌বে, যে, পারব না।

আমি বল্লুম, রাণী, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পার তুমি!

করেওচ। কি যে করেচ যদি দেখাতে পারতুম ত দেখতে। কিন্তু এখন তার সময় নয়; একদিন হয় ত সময় আস্‌বে। এখন টাকা চাই।

বিমলা বল্লে, দেব।

আমি বুঝ্‌লুম, বিমলা মনে মনে ঠিক করে নিয়েচে ওর গয়না বেচে দেবে। আমি বল্‌লুম, তোমার গয়না এখন হাতে রাখতে হবে, কখন কি দরকার হয় বলা যায় না।

বিমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বল্‌লুম, তোমার স্বামীর টাকা থেকে এ টাকা নিতে হবে।

বিমলা আরো স্তম্ভিত হয়ে গেল। খানিক পরে সে বল্লে, তাঁর টাকা আমি কেমন করে নেব?

আমি বল্‌লুম, তাঁর টাকা কি তোমার টাকা নয়?

সে খুব অভিমানের সঙ্গেই বল্লে, নয়!

আমি বল্‌লুম, তা হলে সে টাকা তারও নয়। সে টাকা দেশের। দেশের যখন প্রয়োজন আছে তখন এ টাকা নিখিল দেশের কাছ থেকে চুরি করে রেখেচে।

বিমলা বল্লে, আমি সে টাকা পাব কি করে?

যেমন করে হোক্। তুমি সে পারবে। যাঁর টাকা তুমি তাঁর কাছে এনে দেবে। বন্দেমাতরং! বন্দেমাতরং এই মন্ত্রে আজ লোহার সিন্দুকের দরজা খুলবে, ভাণ্ডার-ঘরের প্রাচীর খুল্‌বে, আর যারা ধর্ম্মের নাম করে সেই মহাশক্তিকে মানে না তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে! মক্ষি, বল বন্দেমাতরং!

বন্দেমাতরং। ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার তুমি

যে চোখে তোমারে, প্রিয়ে, দেখে সর্ব্বজন
সে চোখে তোমারে যদি আমি হেরিতাম
তা হলে তোমার পায়ে জীবন যৌবন
সব কি গো নির্ব্বিচারে দিতে পারিতাম ?
তুমি যে আমার চোখে কি মহারতন
দর্পণ কখনো তার পায় কি আভাস ?
বিশ্ব যদি পেত কভু আমার নয়ন
আমার "তোমা"কে নিয়ে হ'ত সে উদাস।
আমার অন্তরচক্ষু, দেহের নয়নে
লুপ্ত করিয়াছে, রবি চন্দ্রেরে যেমন,
অন্তর হেরিছে তার অন্তরের ধনে,
এ যেন ঋষির মহামন্ত্রের দর্শন।
আমার "তুমিটি" সে যে সবার "তোমাকে"
নিত্য মোর আনন্দের অন্তরালে ঢাকে।

শ্রীকালিদাস রায়।

সবুজ পত্র

নূতন বসন

সর্ব্বদেহের ব্যাকুলতা কি বল্‌তে চায় বাণী,
তাই আমার এই নূতন বসনখানি।
নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে, দেখ্‌তে কি পায় কেউ?
সেই নূতনের ঢেউ
অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নূতন বসনখানি।
দেহ-গানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি।

আপনাকে ত দিলেম তা'রে, তবু হাজার বার
নূতন করে দিই যে উপহার।
চোখের কালোয় নূতন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে,
নূতন হাসি ফোটে,
তারি সঙ্গে, যতন-ভরা নূতন বসনখানি
অঙ্গ আমার নূতন করে' দেয় যে তা'রে আনি।

চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনছায়ার পানে
বেদন-ভরা শুধু চোখের গানে।
মিল্‌ব তখন বিশ্বমাঝে আমরা দোঁহে একা,
যেন নূতন দেখা।
তখন আমার অঙ্গ ভরি নূতন বসনখানি
পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে করবে কানাকানি।

ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারি আকাশ,
রঙের নেশায় মেটেনা তার আশ।
তাই ত বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানী,
কখনো জাফ্‌রাণী,
আজ তোরা দেখ্‌ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ যেন নবীন আস্‌মানী।

অকূলের এই বর্ণ, এ যে দিশাহারার নীল,
অন্য পারের বনের সাথে মিল।
আজকে আমার সকল দেহে বইচে দূরের হাওয়া
সাগর পানে ধাওয়া।
আজকে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খানি
বৃষ্টি-ভরা ঈশান কোণের নব মেঘের বাণী॥

পদ্মা
১২ই অগ্রহায়ণ
১৩২২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘরে-বাইরে

সন্দীপের আত্মকথা

আমরা পুরুষ, আমরা রাজা, আমরা খাজনা নেব। আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীকে লুঠ করচি। আমরা যতই তার কাছে দাবী করেচি ততই সে আমাদের বশ মেনেচে। আমরা পুরুষ আদিকাল থেকে ফল পেড়েচি, গাছ কেটেচি, মাটি খুঁড়েচি, পশু মেরেচি, পাখী মেরেচি, মাছ মেরেচি। সমুদ্রের তলা থেকে, মাটির নীচে থেকে, মৃত্যুর মুখের থেকে আদায়, আদায়, আমরা কেবলই আদায় করে এসেচি—আমরা সেই পুরুষ জাত। বিধাতার ভাণ্ডারে কোনো লোহার সিন্ধুককে আমরা রেয়াৎ করি নি—আমরা ভেঙেচি আর কেড়েচি।

এই পুরুষদের দাবী মেটানোই হচ্চে ধরণীর আনন্দ। দিনরাত সেই অন্তহীন দাবী মেটাতে মেটাতেই পৃথিবী উর্ব্বরা হয়েচে, সুন্দরী হয়েচে, সার্থক হয়েচে, নইলে জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়ে সে আপনাকে আপনি জান্‌ত না। নইলে তার হৃদয়ের সকল দরজাই বন্ধ থাকত; তার খনির হীরে খনিতেই থেকে যেত, তার শুক্তির মুক্তো আলোতে উদ্ধার পেত না।

আমরা পুরুষ কেবল আমাদের দাবীর জোরে মেয়েদের আজ উদ্ঘাটিত করে দিয়েচি। কেবলি আমাদের কাছে আপনাকে দিতে দিতে তারা ক্রমে ক্রমে আপনাকে বড় করে বেশি করে পেয়েচে। তারা তাদের সমস্ত সুখের হীরে এবং দুঃখের মুক্তো আমাদের

রাজকোষে জমা করে দিতে গিয়েই তবে তার সন্ধান পেয়েছে। এমনি করে পুরুষের পক্ষে নেওয়াই হচ্চে যথার্থ দান, আর মেয়েদের পক্ষে দেওয়াই হচ্চে যথার্থ লাভ।

বিমলার কাছে খুব একটা বড় হাঁক হেঁকেচি। মনের ধর্ম্মই না কি আপনার সঙ্গে না-হক্ ঝগড়া করা, তাই প্রথমটা একটা খট্‌কা লেগেছিল। মনে হয়েছিল, এটা বড় বেশি কঠিন হল। একবার ভাবলুম, ওকে ডেকে বলি, না, তোমার এ সব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে কাজ নেই, তোমার জীবনে কেন এমন অশান্তি এনে দেব? ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গিয়েছিলুম, পুরুষ জাত এইজন্যেই ত সকর্ম্মক, আমরা অকর্ম্মকদের মধ্যে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে অশান্তি ঘটিয়ে তাদের অস্তিত্বকে সার্থক করে তুল্‌ব যে। আমরা আজ পর্য্যন্ত মেয়েদের যদি কাঁদিয়ে না আস্‌তুম তা হলে তাদের দুঃখের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের দরজা যে আঁটাই থাক্‌ত। পুরুষ যে ত্রিভুবনকে কাঁদিয়ে ধন্য করবার জন্যই! নইলে তার হাত এমন সবল, তার মুঠো এমন শক্ত হবে কেন?

বিমলার অন্তরাত্মা চাইচে যে, আমি সন্দীপ তার কাছে খুব বড় দাবী করব, তাকে মরতে ডাক দেব। এ না হলে সে খুসি হবে কেন? এতদিন সে ভালো করে কাঁদতে পায়নি বলেই ত আমার পথ চেয়ে বসেছিল। এতদিন সে কেবলমাত্র সুখে ছিল বলেই ত আমাকে দেখবামাত্র তার হৃদয়ের দিগন্তে দুঃখের নববর্ষা একেবারে নীল হয়ে ঘনিয়ে এল। আমি যদি দয়া করে তার কান্না থামাতেই চাই তাহলে জগতে আমার দরকার ছিল কি!

আসলে আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি খট্‌কা বেধেছিল তার প্রধান কারণ এটা যে টাকার দাবী। টাকা জিনিষটা যে পুরুষ

মানুষের। ওটা চাইতে যাওয়ার মধ্যে একটু ভিক্ষুকতা এসে পড়ে। সেইজন্যে টাকার অঙ্কটাকে বড় করতে হল। এক আধ হাজার হলে সেটাতে অত্যন্ত চুরির গন্ধ থাকে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজারটা হল ডাকাতি।

তা ছাড়া, আমার খুব ধনী হওয়া উচিত ছিল। এতদিন কেবলমাত্র টাকার অভাবে আমার অনেক ইচ্ছা পদে পদে ঠেকে গেচে, এটা, আর যাকে হোক্, আমাকে কিছুতেই শোভা পায় না। আমার ভাগ্যের পক্ষে এটা অন্যায় যদি হত তাকে মাপ করতুম কিন্তু এটা রুচিবিরুদ্ধ সুতরাং অমার্জ্জনীয়। বাসা ভাড়া করলে মাসে মাসে আমি যে তার ভাড়ার জন্যে মাথায় হাত দিয়ে ভাবব, আর রেলে চাপবার সময় অনেক চিন্তা করে টাকার থলি টিপে টিপে ইণ্টারমিডিয়েটের টিকিট কিন্‌ব এটা আমার মত মানুষের পক্ষে ত দুঃখকর নয়, হাস্যকর। আমি বেশ দেখতে পাই নিখিলের মত মানুষের পক্ষে পৈতৃক সম্পত্তিটা বাহুল্য। ও গরীব হলে ওকে কিছুই বেমানান্ হ'ত না। তাহলেও অনায়াসে অকিঞ্চনতার স্যাকরা গাড়িতে ওর চন্দ্রমাষ্টারের জুড়ি হতে পারত।

আমি জীবনে অন্তত একবার পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতে নিয়ে নিজের আরামে এবং দেশের প্রয়োজনে দুদিনে সেটা উড়িয়ে দিতে চাই। আমি আমীর, আমার এই গরীবের ছদ্মবেশটা দুদিনের জন্যেও ঘুচিয়ে একবার আয়নায় আপনাকে দেখে নিই, এই আমার একটা সখ্ আছে।

কিন্তু বিমলা পঞ্চাশ হাজারের নাগাল সহজে কোথাও পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। হয়ত শেষকালে সেই দুচার হাজারেই ঠেক্‌বে। তাই সই। অর্দ্ধংত্যজতি পণ্ডিতঃ বলেচে, কিন্তু

ত্যাগটা যখন নিজের ইচ্ছায় নয় তখন হতভাগ্য পণ্ডিত বারো আনা, এমন কি, পনর আনাও ত্যজতি।

এই পর্য্যন্ত লিখেচি,—এ গেল আমার খাষের কথা। এ সব কথা আমার অবকাশের সময় আরো ফুটিয়ে তোলা যাবে। এখন অবকাশ নেই। এখানকার নায়েব খবর পাঠিয়েচে, এখনি একবার তার কাছে যাওয়া চাই; শুন্‌চি একটা গোলমাল বেধেচে।

* * * *

নায়েব বল্লে, যে-লোকটার দ্বারা নৌকো ডোবানো হয়েছিল, পুলিস তাকে সন্দেহ করেচে; লোকটা পুরোনো দাগী—তাকে নিয়ে টানাটানি চল্‌চে। লোকটা সেয়ানা, তার কাছ থেকে কথা আদায় করা শক্ত হবে। কিন্তু বলা যায় কি! বিশেষত নিখিল রেগে রয়েচে, নায়েব স্পষ্ট ত কিছু করতে পারবে না। নায়েব আমাকে বল্লে, দেখুন, আম্মাকে যদি বিপদে পড়তে হয় আমি আপনাকে ছাড়ব না।—

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আমাকে যে জড়াবে তার ফাঁস কোথায়?

নায়েব বল্লে, আপনার লেখা একখানা, আর অমূল্যবাবুর লেখা তিনখানা চিঠি আমার কাছে আছে।

এখন বুঝচি, যে-চিঠিখানা লিখে নায়েব আমার কাছ থেকে জবাব আদায় করে রেখেছিল সেটা এই কারণেই জরুরি—তার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। এসব চাল নূতন শেখা যাচ্চে। যেমন করে শত্রুর নৌকো ডুবিয়েচি প্রয়োজন হলেই তেমনি

করে যে মিত্রকেও অনায়াসে ডোবাতে পারি আমার পরে নায়েবের এই শ্রদ্ধাটুকু ছিল। শ্রদ্ধা আরও অনেকখানি বাড়ত যদি চিঠি-খানার জবাব লিখে-না-দিয়ে মুখে-দেওয়া যেত।

এখন কথা হচ্চে এই, পুলিসকে ঘুষ দেওয়া চাই এবং যদি আরো কিছু দূর গড়ায় তাহলে যে-লোকটার নৌকো ডুবনো গেছে আপসে তারও ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এখন বেশ বুঝতে পারচি, এই যে বেড়-জালটি পাতা হচ্চে এর মুনফার একটা মোটা অংশ নায়েবের ভাগেও পড়বে। কিন্তু মনে মনে সে-কথাটা চেপেই রাখতে হচ্চে। মুখে আমিও বলচি বন্দেমাতরং, আর সেও বল্‌চে বন্দেমাতরং।

এ সব ব্যাপারে যে-আসবাব দিয়ে কাজ চালাতে হয় তার ফাটা অনেক;—যেটুকু পদার্থ টিঁকে থাকে তার চেয়ে গলে' পড়ে ঢের বেশি। ধর্ম্মবুদ্ধিটা না কি লুকিয়ে মজ্জার মধ্যে সেঁধিয়ে বসে আছে সেইজন্যে নায়েবটার উপর প্রথম দফায় খুব রাগ হয়েছিল, আর-একটু হলেই দেশের লোকের কপটতা সম্বন্ধে খুব কড়া কথা এই ডায়ারীতে লিখ্‌তে বসেছিলুম। কিন্তু ভগবান যদি থাকেন তাঁর কাছে আমার এই কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার করতেই হবে তিনি আমার বুদ্ধিটাকে পরিষ্কার করে দিয়েচেন—নিজের ভিতরে কিম্বা নিজের বাইরে কিছু অস্পষ্ট থাকবার জো নেই। অন্য যাকেই ভোলাই, নিজেকে কখনই ভোলাইনে। সেইজন্যে বেশিক্ষণ রাগ্‌তে পারলুম না। যেটা সত্য সেটা ভালোও নয় মন্দও নয়, সেটা সত্য, এইটেই হল বিজ্ঞান। মাটি যতটা জল শুষে নেয় সেটুকু বাদে যে জলটা থাকে সেইটে নিয়েই জলাশয়।

বন্দেমাতরমের নীচের তলার মাটিতে খানিকটা জল শুষবে—সে জল আমিও শুষ্‌ব, ঐ নায়েবও শুষবে—তারপরেও যেটা থাক্‌বে সেইটেই হল বন্দেমাতরং। এ'কে কপটতা বলে' গাল দিতে পারি কিন্তু এটা সত্য—এ'কে মান্‌তে হবে। পৃথিবীর সকল বড় কাজেরই তলায় একটা স্তর জমে যেটা কেবল পাঁক; মহা-সমুদ্রের নীচেও সেটা আছে।

তাই বড় কাজ করবার সময় এই পাঁকের দাবীর হিসেবটি ধরা চাই। অতএব নায়েব কিছু নেবে এবং আমারও কিছু প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজনটা বড় প্রয়োজনের অন্তর্গত,—কারণ, ঘোড়াই কেবল দানা খাবে, তা নয়, চাকাতেও কিছু তেল দিতে হয়।

যাই হোক্‌ টাকা চাই। পঞ্চাশ হাজারের জন্যে সবুর করলে চল্‌বে না। এখনি যা পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করতে হবে। আমি জানি, এই সমস্ত জরুর যখন তাগিদ্‌ করে আখেরকে তখন ভাসিয়ে দিতে হয়। আজকের দিনের পাঁচ হাজার পর্শু দিনের পঞ্চাশ হাজারের অঙ্কুর মুড়িয়ে খায়। আমি ত তাই নিখিলকে বলি, যারা ত্যাগের রাস্তায় চলে তাদের লোভকে দমন করতেই হয় না, যারা লোভের রাস্তায় চলে পদে পদে তাদের লোভকে ত্যাগ করতে হয়। পঞ্চাশ হাজারকে আমি ত্যাগ করলুম, নিখিলের মাষ্টার মশায় চন্দ্রবাবুকে ওটা ত্যাগ করতে হয় না।

ছ'টা যে রিপু আছে তার মধ্যে প্রথম-দু'টো এবং শেষ-দু'টো হচ্চে পুরুষের, আর মাঝখানের দুটো হচ্চে কাপুরুষের। কামনা করব, কিন্তু লোভ থাক্‌বে না, মোহ থাকবে না। তা

থাক্‌লেই কামনা হল মাটি। মোহ জিনিষটা থাকে অতীতকে আর ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে। বর্ত্তমানকে পথ ভোলাবার ওস্তাদ হচ্চে তারা। এখনি যেটা দরকার সেটাতে যারা মন দিতে পারেনি, যারা অন্য-কালের বাঁশি শুনচে, তারা বিরহিণী শকুন্তলার মত; কাছের অতিথির হাঁক তারা শুনতে পায় না, সেই শাপে দূরের যে অতিথিকে তারা মুগ্ধ হয়ে কামনা করে তাকে হারায়। যারা কামনার তপস্বী তাদেরই জন্যে মোহ-মুদ্গর। কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ।

সেদিন আমি বিমলার হাত চেপে ধরেছিলুম, তারি রেশ ওর মনের মধ্যে বাজ্‌চে। আমার মনেও তার ঝঙ্কারটা থামে নি। এই রেস্‌-টুকুকে তাজা রেখে দিতে হবে। এইটেকেই যদি বারবার অভ্যস্ত করে' মোটা করে তুলি তাহলে এখন যেটা গানের উপর দিয়ে চল্‌চে তখন সেটা তর্কে এসে নাববে। এখন আমার কোনো কথায় বিমলা "কেন" জিজ্ঞাসা করবার ফাঁক পায় না। যে-সব মানুষের মোহ জিনিষটাতে দরকার আছে তাদের বরাদ্দ বন্ধ করে কি হবে? এখন আমার কাজের ভিড়—অতএব এখনকার মত রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্য্যন্তই থাক্, তলানি পর্য্যন্ত গেলে গোলমাল বাধবে। যখন তার ঠিক সময় আসবে তখন তাকে অবজ্ঞা করব না। হে কামী, লোভকে ত্যাগ কর, এবং মোহকে ওস্তাদের হাতের বীণাযন্ত্রের মত সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তা'র মিহি তারে মীড় লাগাতে থাক।

এদিকে কাজের আসর আমাদের জমে উঠেছে। আমাদের দলবল ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে গেছে। ভাই-বেরাদর বলে

অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারবো না। ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে হাঁউ করে ওঠে, একদিন ওদের ভালুক নাচ নাচাব।

নিখিল বলে, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিষ হয় তাহলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।

আমি বলি, তা হতে পারে, কিন্তু কোন্‌খানটাতে আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতেই জোর করে ওদের বসিয়ে দিতে হবে—নইলে ওরা বিরোধ করবেই।

নিখিল বলে, বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে বুঝি তুমি বিরোধ মেটাতে চাও ?

আমি বলি, তোমার প্ল্যান্ কি ?

নিখিল বলে, বিরোধ মেটাবার একটি মাত্র পথ আছে।

আমি জানি, সাধুলোকের-লেখা গল্পের মত নিখিলের সব তর্কই শেষকালে একটা উপদেশে এসে ঠেকবেই। আশ্চর্য্য এই, এতদিন এই উপদেশ নিয়ে নাড়াচাড়া করচে কিন্তু আজও এগুলোকে ও নিজেও বিশ্বাস করে! সাধে আমি বলি, নিখিল হচ্চে একেবারে জন্ম-স্কুল-বয়্! গুণের মধ্যে, ও খাঁটি মাল। চাঁদ সদাগরের মত ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েচে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মান্‌তে চায় না। মুস্কিল এই, এদের কাছে মরাটা শেষ প্রমাণ নয়, ওরা চক্ষু বুজে ঠিক করে রেখেচে তার উপরেও কিছু আছে।

অনেকদিন থেকে আমার মনে একটি প্ল্যান আছে; সেটা যদি খাটাবার সুযোগ পাই তাহলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত দেশে আগুন লেগে যাবে। দেশকে চোখে দেখ্‌তে না পেলে আমাদের দেশের লোক জাগ্‌বে না। দেশের একটা দেবী-প্রতিমা চাই। কথাটা আমার বন্ধুদের মনে লেগেছিল, তারা বল্লে, আচ্ছা, একটা মূর্ত্তি বানানো যাক্। আমি বল্লুম, আমরা বানালে চল্‌বে না, যে-প্রতিমা চলে আস্‌চে তাকেই আমাদের স্বদেশের প্রতিমা করে তুল্‌তে হবে। পূজার পথ আমাদের দেশে গভীর করে' কাটা আছে, সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আন্‌তে হবে।

এই নিয়ে নিখিলের সঙ্গে কিছুকাল পূর্ব্বে আমার খুব তর্ক হয়ে গেছে। নিখিল বল্লে, যে কাজকে সত্য বলে শ্রদ্ধা করি তাকে সাধন করবার জন্যে মোহকে দলে টানা চল্‌বে না।

আমি বল্লুম, মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, মোহ নইলে ইতর লোকের চলেই না; আর পৃথিবীর বারো-আনা-ভাগ ইতর। সেই মোহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই সকল দেশে দেবতার সৃষ্টি হয়েচে—মানুষ আপনাকে চেনে।

নিখিল বল্লে, মোহকে ভাঙবার জন্যেই দেবতা। রাখবার জন্যে অপদেবতা।

আচ্ছা বেশ, অপদেবতাই সই, সেটাকে নইলে কাজ এগোয় না। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে মোহটা খাড়াই আছে, তাকে সমানে খোরাক দিচ্চি অথচ তার কাছ থেকে কাজ আদায় করচিনে এই দেখনা, ব্রাহ্মণকে ভূদেব বলচি, তার পায়ের

ধূলো নিচ্চি, দান-দক্ষিণেরও অন্ত নেই, অথচ এত বড় একটা তৈরি জিনিষকে বৃথা নষ্ট হতে দিচ্চি, কাজে লাগাচ্চিনে। ওদের ক্ষমতাটা যদি পূরো ওদের হাতে দেওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষমতা দিয়ে যে আমরা আজ অসাধ্য সাধন করতে পারি। কেননা, পৃথিবীতে একদল জীব আছে তারা পদতলচর, তাদের সংখ্যাই বেশি; তারা কোনো কাজই করতে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধূলো পায়, তা পিঠেই হোক্ আর মাথাতেই হোক্। এদের খাটাবার জন্যেই মোহ একটা মস্ত শক্তি। সেই শক্তি-শেলগুলোকে এতদিন আমাদের অস্ত্রশালায় শান দিয়ে এসেচি, আজ সেটা হানবার দিন এসেচে আজ কি তাদের সরিয়ে ফেলতে পারি?

কিন্তু নিখিলকে এ সব কথা বোঝানো ভারি শক্ত। সত্য জিনিষটা ওর মনে একটা নিছক প্রেজুডিসের মত দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সত্য বলে কোনো একটা বিশেষ পদার্থ আছে। আমি ওকে কতবার বলেছি, যেখানে মিথ্যাটা সত্য সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমাদের দেশ এই কথাটা বুঝত বলেই অসঙ্কোচে বল্‌তে পেরেচে অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যাই সত্য। সেই মিথ্যা থেকে ভ্রষ্ট হলেই সত্য থেকে সে ভ্রষ্ট হবে। দেশের প্রতিমাকে যে-লোক সত্য বলে' মান্‌তে পারে দেশের প্রতিমা তার মধ্যে সত্যের মতই কাজ করবে। আমাদের যে-রকমের স্বভাব কিম্বা সংস্কার তাতে আমরা দেশকে সহজে মানতে পারিনে কিন্তু দেশের প্রতিমাকে অনায়াসে মান্‌তে পারি। এটা যখন জানা কথা, তখন যারা কাজ উদ্ধার করতে চায় তারা এইটে বুঝেই কাজ করবে।

নিখিল হঠাৎ ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠে বল্লে, সত্যের সাধনা করবার শক্তি তোমরা খুইয়েচ বলেই, তোমরা হঠাৎ আকাশ থেকে একটা মস্ত ফল পেতে চাও। তাই শত শত বৎসর ধরে দেশের যখন সকল কাজই বাকী তখন তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে হাত পেতে বসে রয়েচ।

আমি বল্লুম, অসাধ্য সাধন করা চাই, সেই জন্যই দেশকে দেবতা করা দরকার।

নিখিল বল্লে, অর্থাৎ সাধ্যের সাধনায় তোমাদের মন উঠচে না। যা-কিছু আছে সমস্ত এম্‌নিই থাক্‌বে কেবল তার ফলটা হবে আজগুবি!

আমি বল্লুম, নিখিল, তুমি যা বল্‌চ, ওগুলো উপদেশ। একটা বিশেষ বয়সে ওর দরকার থাক্‌তে পারে, কিন্তু মানুষের যখন দাঁত ওঠে তখন ও চল্‌বে না। স্পষ্টই চোখের সাম্‌নে দেখতে পাচ্চি, কোনোদিন স্বপ্নেও যার আবাদ করিনি সেই ফসল হুহু করে' ফলে উঠচে—কিসের জোরে? আজ দেশকে দেবতা বলে মনের মধ্যে দেখতে পাচ্চি বলে। এইটেকেই মূর্ত্তি দিয়ে চিরন্তন করে তোলা এখনকার প্রতিভার কাজ। প্রতিভা তর্ক করে না, সৃষ্টি করে। আজ দেশ যা ভাবচে, আমি তাকে রূপ দেব। আমি ঘরে ঘরে গিয়ে বলে বেড়াব, দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েচেন, তিনি পূজো চান। আমরা ব্রাহ্মণদের গিয়ে বল্‌ব, দেবীর পূজারি তোমরাই—সেই পূজো বন্ধ আছে বলেই তোমরা নাবতে বসেচ। তুমি বল্‌বে, আমি মিথ্যা বল্‌চি! না, এ সত্য,—আমার মুখ থেকে এই কথাটি

শোন্‌বার জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা করে রয়েচে, সেই জন্যেই বল্‌চি এ কথা সত্য! যদি আমার বাণী আমি প্রচার করতে পারি তাহলে তুমি দেখতে পাবে এর আশ্চর্য্য ফল!

নিখিল বল্লে, আমার আয়ু কত দিনইবা! তুমি যে ফল দেশের হাতে তুলে দেবে, তারো পরের ফল আছে, সেটা হয়ত এখন দেখা যাবে না।

আমি বল্লুম, আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার।

নিখিল বল্লে, আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।

আসল কথা, বাঙালীর যে-একটা বড় ঐশ্বর্য্য আছে, কল্পনাবৃত্তি, সেটা হয়ত নিখিলের ছিল কিন্তু বাইরের থেকে একটা ধর্ম্মবৃত্তির বনস্পতি বড় হয়ে উঠে ওটাকে নিজের আওতায় মেরে ফেল্লে বলে। ভারতবর্ষে এই যে দুর্গা, জগদ্ধাত্রীর পূজা বাঙালী উদ্ভাবন করেচে এইটেতে সে নিজের আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়েচে। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, এ দেবী পোলিটিকাল দেবী। মুসলমানের শাসনকালে বাঙালী যে দেশ-শক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর কামনা করেছিল এ দুই দেবী তারই দুই রকমের মূর্ত্তি। সাধনার এমন আশ্চর্য্য বাহ্যরূপ ভারতবর্ষের আর কোন্ জাত গড়তে পেরেচে?

কল্পনার দিব্যদৃষ্টি নিখিলের একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে বলেই সে আমাকে অনায়াসে বল্‌তে পারলে, মুসলমান-শাসনে বর্গি বল,

শিখ বল, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিল, বাঙালী তার দেবীমূর্ত্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র পড়ে' ফল কামনা করেছিল, কিন্তু দেশ দেবী নয়, তাই, ফলের মধ্যে কেবল ছাগমহিষের মুণ্ডপাত হল। যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব, সেই দিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়, যিনি সত্য দেবতা, তিনি সত্য ফল দেবেন।

মুস্কিল হচ্চে, কাগজে কলমে লিখ্‌লে নিখিলের কথা শোনায় ভালো—কিন্তু আমার কথা কাগজে লেখবার নয়, লোহার যন্ত্রা দিয়ে দেশের বুক চিরে চিরে লেখবার। পণ্ডিত যে রকম কৃষিতত্ত্ব ছাপার কালিতে লেখে, সে রকম নয়, লাঙলের ফলা দিয়ে চাষী যে রকম মাটির বুকে আপনার কামনা অঙ্কিত করে সেই রকম।

বিমলার সঙ্গে যখন আমার দেখা হল, আমি বল্লুম, যে-দেবতার সাধনা করবার জন্য লক্ষ যুগের পর পৃথিবীতে এসেচি তিনি যতক্ষণ আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখা দিয়েছেন, ততক্ষণ তাঁকে আমার সমস্ত দেহ মন দিয়ে কি বিশ্বাস করতে পেরেচি? তোমাকে যদি না দেখতুম তাহলে আমার সমস্ত দেশকে আমি এক করে দেখতে পেতুম না, একথা আমি তোমাকে কতবার বলেছি, জানিনে তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পার কি না। একথা বোঝানো ভারি শক্ত যে, দেবলোকে দেবতারা থাকেন অদৃশ্য, মর্ত্ত্য লোকেই তাঁরা দেখা দেন।

বিমলা একরকম করে আমার দিকে চেয়ে বল্লে, তোমার কথা খুব স্পষ্টই বুঝতে পেরেচি।—এই-প্রথম বিমলা আমাকে "আপনি" না বলে "তুমি" বল্লে।

আমি বল্লুম, অর্জ্জুন যে-কৃষ্ণকে তাঁর সামান্য সারথিরূপে সর্ব্বদা দেখতেন তাঁরও একটি বিরাটরূপ ছিল, সেও একদিন অর্জ্জুন দেখেছিলেন ;—তখন তিনি পুরো সত্য দেখেছিলেন। আমার সমস্ত দেশের মধ্যে আমি তোমার সেই বিরাট রূপ দেখেছি। তোমারই গলায় গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার ; তোমারি কালো চোখের কাজল-মাখা পল্লব আমি দেখতে পেয়েছি নদীর নীল জলের বহু দূরপারের বনরেখার মধ্যে ; আর কচি ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে তোমার ছায়া-আলোর রঙিন ডুরে শাড়িটি লুটিয়ে লুটিয়ে যায় ; আর তোমার নিষ্ঠুর তেজ দেখেচি জ্যৈষ্ঠের যে-রৌদ্রে সমস্ত আকাশটা যেন মরুভূমির সিংহের মত লাল জিব্ বের করে দিয়ে হা হা করে শ্বস্‌তে থাকে! দেবী যখন তাঁর ভক্তকে এমন আশ্চর্য্যরকম করে দেখা দিয়েচেন তখন তাঁরি পূজা আমি আমার সমস্ত দেশে প্রচার করব, তবে আমার দেশের লোক জীবন পাবে। "তোমারি মুরতি গড়ি মন্দিরে মন্দিরে!" কিন্তু সে কথা সকলে স্পষ্ট করে বোঝেনি। তাই আমার সঙ্কল্প সমস্ত দেশকে ডাক দিয়ে আমার দেবীর মূর্ত্তিটি নিজের হাতে গড়ে' এমন করে' তার পূজো দেব যে, কেউ তাকে আর অবিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি আমাকে সেই বর দাও, সেই তেজ দাও।

বিমলার চোখ বুজে এল। সে যে-আসনে বসেছিল সেই আসনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে যেন পাথরের মূর্ত্তির মতই স্তব্ধ হয়ে রইল। আমি আর খানিকটা বল্লেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। খানিক পরে সে চোখ মেলে বলে উঠল,—ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েচ, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারো নেই।

আমি যে দেখতে পাচ্চি আজ তোমার ইচ্ছার বেগ কেউ সাম্‌লাতে পারবে না। রাজা আস্‌বে, তোমার পায়ের কাছে তার রাজদণ্ড ফেলে দিতে, ধনী আস্‌বে তার ভাণ্ডার তোমার কাছে উজাড় করে দেবার জন্যে, যাদের আর কিছুই নেই তারাও কেবলমাত্র মরবার জন্য তোমার কাছে এসে সেধে পড়বে। ভালো মন্দর বিধি বিধান সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে! রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কি দেখেচ তা জানিনে, কিন্তু আমি আমার এই হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম। তার কাছে আমি কোথায় আছি! সর্ব্বনাশ গো সর্ব্বনাশ, কি তার প্রচণ্ড শক্তি! যতক্ষণ সে আমাকে না সম্পূর্ণ মেরে ফেল্‌বে ততক্ষণ আমি ত আর বাঁচিনে, আমি ত আর পারিনে, আমার যে বুক ফেটে গেল।

বল্‌তে বল্‌তে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর পড়ে গিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তার পরে ফুলে' ফুলে' কান্না কান্না কান্না!

এই ত হিপ্‌নটিজ্‌ম্! এই শক্তিই পৃথিবী জয় করবার শক্তি। কোনো উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই সম্মোহন! কে বলে সত্যমেব জয়তে! জয় হবে মোহের।—বাঙালী সে কথা বুঝেছিল, তাই বাঙালী এনেছিল দশভুজার পূজা, বাঙালী গড়েছিল সিংহ-বাহিনীর মূর্ত্তি। সেই বাঙালী আবার আজ মূর্ত্তি গড়বে, জয় করবে বিশ্ব কেবল সম্মোহনে—বন্দেমাতরং!

আস্তে আস্তে হাতে ধরে বিমলাকে চৌকির উপরে উঠিয়ে বসালুম। এই উত্তেজনার পরে অবসাদ আসবার আগেই তাকে

বল্লুম, বাংলা দেশে মায়ের পূজা প্রতিষ্ঠা করবার ভার তিনি আমার উপরেই দিয়েচেন, কিন্তু আমি যে গরীব।

বিমলার মুখ তখনো লাল, চোখ তখনো বাষ্পে ঢাকা ; সে গদ্গদ কণ্ঠে বল্লে, তুমি গরীব কিসের ? যার যা-কিছু আছে সব যে তোমারি। কিসের জন্যে বাক্স ভরে আমার গয়না জমে রয়েচে ? আমার সমস্ত সোনা-মাণিক তোমার পূজোয় নাও না কেড়ে, আমার কিছুই দরকার নেই।

এর আগে আর-একবার বিমলা গয়না দিতে চেয়েছিল—আমার কিছুতে বাধে না, ঐখানটায় বাধল। সঙ্কোচটা কিসের আমি ভেবে দেখেচি। চিরদিন পুরুষই মেয়েকে গয়না দিয়ে সাজিয়ে এসেচে, মেয়ের হাত থেকে গয়না নিতে গেলে কেমন যেন পৌরুষে ঘা পড়ে।

কিন্তু এখানে নিজেকে ভোলা চাই। আমি নিচ্চিনে। এ মায়ের পূজা, সমস্তই সেই পূজায় ঢাল্‌ব। এমন সমারোহ করে করতে হবে যে তেমন পূজা এদেশে কেউ কোনো দিন দেখেনি! চিরদিনের মত নূতন বাংলার ইতিহাসের মর্ম্মের মাঝখানে এই পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এই পূজাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠদানরূপে দেশকে দিয়ে যাব। দেবতার সাধনা করে দেশের মূর্খেরা, দেবতার সৃষ্টি করবে সন্দীপ।

এ ত গেল বড় কথা। কিন্তু ছোট কথাও যে পাড়তে হবে। আপাতত অন্তত তিন হাজার টাকা না হলে ত চল্‌বেই না, পাঁচ হাজার হলেই বেশ সুডোল ভাবে চলে। কিন্তু এতবড় উদ্দীপনার মুখে হঠাৎ এই টাকার কথাটা কি বলা চলে ? কিন্তু আর সময় নেই।

সঙ্কোচের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে ফেল্লুম,—রাণী, এদিকে যে ভাণ্ডার শূন্য হয়ে এল, কাজ বন্ধ হয় বলে'।

অমনি বিমলার মুখে একটা বেদনার কুঞ্চন দেখা দিলে। আমি বুঝলুম, বিমলা ভাবচে, আমি এখনই বুঝি সেই পঞ্চাশ হাজার দাবী করচি। এই নিয়ে ওর বুকের উপর পাথর চেপে রয়েচে—বোধ হয় সারারাত ভেবেচে, কিন্তু কোনো কিনারা পায়নি। প্রেমের পূজার আর কোনো উপচার ত হাতে নেই, হৃদয়কে ত স্পষ্ট করে আমার পায়ে ঢেলে দিতে পারচে না, সেই জন্যে ওর মন চাচ্চে এই মস্ত একটা টাকাকে ওর অবরুদ্ধ আদরের প্রতিরূপ করে আমার কাছে এনে দিতে। কিন্তু কোনো রাস্তা না পেয়ে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠচে। ওর ঐ কষ্টটা আমার বুকে লাগচে। ওযে এখন সম্পূর্ণ আমারি; উপ্‌ড়ে তোলবার দুঃখ এখন ত আর দরকার নেই, এখন ওকে অনেক যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আমি বল্‌লুম, রাণী, এখন সেই পঞ্চাশ হাজারের বিশেষ দরকার নেই, হিসেব করে' দেখচি পাঁচ হাজার, এমন কি তিন হাজার হলেও চলে যাবে।

হঠাৎ টানটা কমে গিয়ে বিমলার হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে যেন একটা গানের মত বল্‌লে, পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব!

যে সুরে রাধিকা গান গেয়েছিল—

বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তিন ভুবনে নাইক যাহার মূল।
বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে,
সবার কানে বাজবে না সে,
দেখ্‌লো চেয়ে যমুনা ঐ ছাপিয়ে গেল কূল!

এ ঠিক সেই সুরই, আর সেই গানই, আর সেই একই কথা—"পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব।" "বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল!" বাঁশির ভিতরকার ফাঁকটি সরু বলেই, চারদিকে তার বাধা বলেই, এমন সুর—অতিলোভের চাপে বাঁশিটি যদি ভেঙে আজ চ্যাপ্‌টা করে দিতুম, তাহলে শোনা যেত,—কেন, এত টাকায় তোমার দরকার কি? আর আমি মেয়েমানুষ অত টাকা পাবই বা কোথা? ইত্যাদি ইত্যাদি। রাধিকার গানের সঙ্গে তার একটি অক্ষরও মিল্‌ত না। তাই বল্‌চি, মোহটাই হল সত্য,—সেইটেই বাঁশি, আর মোহ বাদ দিয়ে সেটা হচ্চে ভাঙা বাঁশির ভিতরকার ফাঁক—সেই অত্যন্ত নির্ম্মল শূন্যতাটা যে কি তার আস্বাদ নিখিল আজকাল কিছু পেয়েচে, ওর মুখ দেখ্‌লেই সেটা বোঝা যায়। আমার মনেও কষ্ট লাগে। কিন্তু নিখিলের বড়াই, ও সত্যকে চায়, আমার বড়াই, আমি মোহটাকে পারৎপক্ষে হাত থেকে ফস্‌কাতে দেব না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—অতএব এ নিয়ে দুঃখ করে কি হবে?

বিমলার মনটাকে সেই উপরের হাওয়াতেই উড়িয়ে রাখবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা সংক্ষেপে সেরে ফেলে ফের আবার সেই মহিষমর্দ্দিনীর পূজোর মন্ত্রণায় বসে গেলুম। পূজোটা হবে কবে এবং কখন? নিখিলের এলাকায় রুইমারীতে অগ্রাণের শেষে যে হোসেনগাজির মেলা হয়, সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসে, সেইখানে পূজোটা যদি দেওয়া যায় তাহলে খুব জমাট হয়। বিমলা উৎসাহিত হয়ে উঠল। ও মনে করলে এ ত বিলিতি কাপড় পোড়ানো নয়, লোকের ঘর জ্বালানো নয়, এতবড় সাধু প্রস্তাবে

নিখিলের কোনো আপত্তি হবে না। আমি মনে মনে হাস্‌লুম,—যারা ন বছর দিন রাত্তির এক-সঙ্গে কাটিয়েচে, তারাও পরস্পরকে কত অল্প চেনে! কেবল ঘরকন্নার কথাটুকুতেই চেনে, ঘরের বাইরের কথা যখন হঠাৎ উঠে পড়ে তখন তারা আর থই পায় না। ওরা ন বছর ধরে ঘরে বসে বসে এই কথাটাই ক্রমাগত বিশ্বাস করে এসেচে যে, ঘরের সঙ্গে বাইরের অবিকল মিল বুঝি আছেই, আজ ওরা বুঝতে পারচে কোনোদিন যে-দুটোকে মিলিয়ে নেওয়া হয়নি আজ তারা হঠাৎ মিলে যাবে কি করে?

যাক্, যারা ভুল বুঝেছিল তারা ঠেকতে ঠেকতে ঠিক করে বুঝে নিক্ তা নিয়ে আমার বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই। বিমলাকে ত এই উদ্দীপনার বেগে বেলুনের মত অনেকক্ষণ উড়িয়ে রাখা সম্ভব নয়, অতএব এই হাতের কাজটা যত শীঘ্র পারা যায় সেরে নিতে হচ্চে। বিমলা যখন চৌকি থেকে উঠে দরজা পর্য্যন্ত গেছে আমি নিতান্ত যেন উড়ো রকম ভাবে বল্লুম, রাণী, তাহলে টাকাটা কবে—

বিমলা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, এই মাসের শেষে মাসকাবারের সময়—

আমি বল্লুম, না, দেরি হলে চল্‌বে না।

তোমার কবে চাই?

কালই।

আচ্ছা কালই এনে দেব।

নিখিলেশের আত্মকথা

আমার নামে কাগজে প্যারাগ্রাফ এবং চিঠি বেরতে সুরু

হয়েচে—শুনচি একটা ছড়া এবং ছবি বেরবে তারও উদ্যোগ হচ্চে। রসিকতার উৎস খুলে গেছে, সেই সঙ্গে অজস্র মিথ্যে কথার ধারাবর্ষণে সমস্ত দেশ একেবারে পুলকিত। জানে যে এই পঙ্কিল রসের হোরিখেলায় পিচ্‌কিরিটা তাদেরই হাতে—আমি ভদ্রলোক রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলেচি, আমার গায়ের আবরণখানা সাদা রাখবার উপায় নেই।

লিখেছে, আমার এলেকায় আপামর সাধারণ সকলেই স্বদেশীর জন্যে একেবারে উৎসুক হয়ে রয়েচে কেবল আমার ভয়েই কিছু করতে পারচে না,—দুই একজন সাহসী যারা দিশি জিনিষ চালাতে চায়, জমিদারী চালে আমি তাদের বিধিমতে উৎপীড়ন করচি। পুলিসের সঙ্গে আমার তলে তলে যোগ আছে, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আমি গোপনে চিঠি চালাচালি করচি এবং বিশ্বস্তসূত্রে খবরের কাগজ খবর পেয়েচে যে, পৈতৃক খেতাবের উপরেও স্বোপার্জ্জিত খেতাব যোগ করে দেবার জন্যে আমার আয়োজন ব্যর্থ হবে না। লিখেচে, "স্বনামা পুরুষো ধন্য, কিন্তু দেশের লোক বিনামার ফরমাস দিয়াছে, সে খবরও আমরা রাখি!"—আমার নামটা স্পষ্ট করে দেয় নি, কিন্তু বাইরের অস্পষ্টতার ভিতর থেকে সেটা খুব বড় করে ফুটে উঠেচে।

এদিকে মাতৃবৎসল হরিশকুণ্ডুর গুণগান করে কাগজে চিঠির পর চিঠি বেরচ্চে। লিখেচে, মায়ের এমন সেবক দেশে যদি বেশি থাকত তাহলে এতদিনে ম্যাঞ্চেষ্টারের কারখানা-ঘরের চিম্‌নিগুলো পর্য্যন্ত বন্দেমাতরমের সুরে সমস্বরে রামশিঙে ফুঁকতে থাকত।

এদিকে আমার নামে লাল কালীতে লেখা একখানা চিঠি

এসেচে, তাতে খবর দিয়েচে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ লিভার-পুলের নিমকহালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েচে। বলেচে, ভগবান পাবক এখন থেকে এই পাবনের কাজে লাগলেন; মায়ের যারা সন্তান নয় তারা যাতে মায়ের কোল জুড়ে থাক্‌তে না পারে তার ব্যবস্থা হচ্চে।

নাম সই করেচে, "মায়ের কোলের অধমসন্তান, শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।"

আমি জানি, এ সমস্তই আমার এখানকার সব ছাত্রদের রচনা। আমি ওদের দুই-একজনকে ডেকে সেই চিঠিখানা দেখালুম। বি, এ, গম্ভীর ভাবে বল্লে, আমরাও শুনেচি, দেশে একদল লোক মরিয়া হয়ে রয়েচে স্বদেশীর বাধা দূর করতে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই।

আমি বল্লুম, তাদের অন্যায় জবরদস্তিতে দেশের একজন লোকও যদি হার মানে তাহলে সেটাতে সমস্ত দেশের পরাভব।

ইতিহাসে এম্, এ, বল্লেন, বুঝতে পারচি নে।

আমি বল্লুম, আমাদের দেশ, দেবতাকে থেকে পেয়াদাকে পর্য্যন্ত ভয় করে করে আধমরা হয়ে রয়েচে, আজ তোমরা মুক্তির নাম করে সেই জুজুর ভয়কে ফের আর-এক নামে যদি দেশে চালাতে চাও, অত্যাচারের দ্বারা কাপুরুষতাটার উপরে যদি তোমাদের দেশের জয়ধ্বজা রোপন করতে চাও তাহলে দেশকে যারা ভালোবাসে তারা সেই ভয়ের শাসনের কাছে এক চুল মাথা নীচু করবে না।

ইতিহাসে এম্, এ, বল্লেন, এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে রাজ্যশাসন ভয়ের শাসন নয়?

আমি বল্লুম, এই ভয়ের শাসনের সীমা কোন্ পর্য্যন্ত সেইটের দ্বারাই দেশের মানুষ কতটা স্বাধীন জানা যায়। ভয়ের শাসন যদি চুরি ডাকাতি এবং পরের প্রতি অন্যায়ের উপরেই টানা যায় তাহলে বোঝা যায় যে প্রত্যেক মানুষকে অন্য মানুষের আক্রমণ থেকে স্বাধীন করবার জন্যেই এই শাসন। কিন্তু মানুষ নিজে কি কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিন্‌বে, কি খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া-ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হল মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা।

ইতিহাসে এম, এ, বল্লেন, অন্য দেশের সমাজেও কি মানুষের ইচ্ছাকে গোড়া-ঘেঁসে কাটবার কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেই?

আমি বল্লুম, কে বল্লে নেই? মানুষকে নিয়ে দাসব্যবসা যে-দেশে যে-পরিমাণে আছে সে-পরিমাণেই মানুষ আপনাকে নষ্ট করচে।

এম্, এ, বল্লেন, তাহলে ঐ দাসব্যবসাটা মানুষেরই ধর্ম্ম, ওটাই মনুষ্যত্ব।

বি, এ, বল্লেন, সন্দীপবাবু এ সম্বন্ধে সেদিন যে দৃষ্টান্ত দিলেন সেটা আমাদের মনে খুব লেগেছে। এই যে ওপারে হরিশকুণ্ডু আছেন জমিদার, কিম্বা সান্‌কিভাঙার চক্রবর্ত্তীরা, ওঁদের সমস্ত এলেকা ঝাঁট দিয়ে আজ একছটাক বিলিতি নুন পাবার জো নেই। কেন? কেননা বরাবরই ওঁরা জোরের উপরে চলেচেন;—যারা স্বভাবতই দাস, প্রভু না থাকাটাই হচ্চে তাদের সকলের চেয়ে বড় বিপদ।

এফ, এ, প্রাক্‌ড্‌ ছোকরাটি বল্লে, একটা ঘটনা জানি, চক্রবর্ত্তীদের একটি কায়স্থ প্রজা ছিল। সে তার একটা হাট নিয়ে চক্রবর্ত্তীদের কিছুতে মান্‌ছিল না। মাম্‌লা করতে করতে শেষকালে তার এমন দশা হল যে খেতে পায় না। যখন দুদিন তার ঘরে হাঁড়ি চড়্‌ল না তখন স্ত্রীর রূপোর গয়না বেচতে বেরল; এই তার শেষ সম্বল। জমিদারের শাসনে গ্রামের কেউ তার গয়না কিন্‌তেও সাহস করে না। জমিদারের নায়েব বল্লে, আমি কিন্‌ব, পাঁচ টাকা দামে। দাম তার টাকা ত্রিশ হবে। প্রাণের দায়ে পাঁচ টাকাতেই যখন সে রাজি হল তখন তার গয়নার পুঁটুলি নিয়ে নায়েব বল্লে, এই পাঁচ টাকা তোমার খাজনা বাকিতে জমা করে নিলুম।—এই কথা শুনে আমরা সন্দীপবাবুকে বলেছিলুম, চক্রবর্ত্তীকে আমরা বয়কট করব। সন্দীপবাবু বল্লেন, এই সমস্ত জ্যান্ত লোককেই যদি বাদ দাও তাহলে কি ঘাটের মড়া নিয়ে দেশের কাজ করবে? এরা প্রাণপণে ইচ্ছে করতে জানে; এরাই ত প্রভু। যারা ষোল আনা ইচ্ছে করতে জানে না, তারা, হয় এদের ইচ্ছেয় চল্‌বে, নয় এদের ইচ্ছেয় মরবে। তিনি আপনার সঙ্গে তুলনা করে বল্লেন, আজ চক্রবর্ত্তীর এলেকায় একটি মানুষ নেই যে, স্বদেশী নিয়ে টুঁ শব্দটি করতে পারে—অথচ নিখিলেশ হাজার ইচ্ছে করলেও স্বদেশী চালাতে পারবেন না।

আমি বল্লুম, আমি স্বদেশীর চেয়ে বড় জিনিস চালাতে চাই, সেইজন্যে স্বদেশী চালানো আমার পক্ষে শক্ত। আমি মরা খুঁটি চাইনে ত, আমি জ্যান্ত গাছ চাই। আমার কাজে দেরী হবে।

ঐতিহাসিক হেসে বল্লে, আপনি মরা খুঁটিও পাবেন না, জ্যান্ত

গাছও পাবেন না। কেননা, সন্দীপবাবুর কথা আমি মানি—পাওয়া মানেই কেড়ে নেওয়া। একথা শিখতে আমাদের সময় লেগেছে, কেননা, এগুলো ইস্কুলের শিক্ষার উল্টো শিক্ষা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, কুণ্ডুদের গোমস্তা গুরুচরণ ভাদুড়ি টাকা আদায় করতে বেরিয়েছিল—একটা মুসলমান প্রজার বেচে কিনে নেবার মত কিছু ছিল না। ছিল তার যুবতী স্ত্রী। ভাদুড়ি বল্লে, তোর বউকে নিকে দিয়ে টাকা শোধ করতে হবে। নিকে করবার উমেদার জুটে গেল, টাকাও শোধ হল। আপনাকে বলচি, স্বামীটার চোখের জল দেখে' আমার রাত্রে ঘুম হয়নি, কিন্তু যতই কষ্ট হোক্ আমি এটা শিখেচি যে, যখন টাকা আদায় করতেই হবে তখন, যে-মানুষ ঋণীর স্ত্রীকে বেচিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে পারে, মানুষ-হিসেবে সে আমার চেয়ে বড়;—আমি পারিনে, আমার চোখে জল আসে, তাই সব ফেঁসে যায়। আমার দেশকে কেউ যদি বাঁচায় তবে এই সব গোমস্তা, এই সব কুণ্ডু, এই সব চক্রবর্ত্তীরা!

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, বল্লুম, তাই যদি হয়, তবে এই সব গোমস্তা, এই সব কুণ্ডু, এই সব চক্রবর্ত্তীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার কাজই আমার। দেখ, দাসত্বের যে বিষ মজ্জার মধ্যে আছে সেইটেই যখন সুযোগ পেয়ে বাইরে ফুটে ওঠে তখনি সেটা সাংঘাতিক দৌরাত্ম্যের আকার ধরে। বউ হয়ে যে মার খায় শাশুড়ি হয়ে সেই সব চেয়ে বড় মার মারে। সমাজে যে-মানুষ মাথা হেঁট করে থাকে সে যখন বরযাত্র হয়ে বেরয় তখন তার উৎপাতে মানী গৃহস্থের মান রক্ষা করা অসাধ্য। ভয়ের শাসনে

তোমরা নির্ব্বিচারে কেবলি সকল-তা'তেই সকলকে মেনে এসেচ, সেইটেকেই ধর্ম্ম বল্‌তে শিখেচ, সেই জন্যেই আজকে অত্যাচার করে সকলকে মানানোটাকেই তোমরা ধর্ম্ম বলে মনে করচ। আমার লড়াই দুর্ব্বলতার ঐ নিদারুণতার সঙ্গে!

আমার এসব কথা অত্যন্ত সহজ কথা—সরল লোককে বল্‌লে বুঝতে তার মুহূর্ত্তমাত্র দেরী হয় না, কিন্তু আমাদের দেশে যে-সব এম্, এ, ঐতিহাসিক বুদ্ধির প্যাঁচ কষচে সত্যকে পরাস্ত করবার জন্যেই তাদের প্যাঁচ।

এদিকে পঞ্চুর জাল মামীকে নিয়ে ভাবচি। তাকে অপ্রমাণ করা কঠিন। সত্য ঘটনার সাক্ষির সংখ্যা পরিমিত, এমন কি, সাক্ষি না থাকাও অসম্ভব নয় কিন্তু যে ঘটনা ঘটেনি জোগাড় করতে পারলে তার সাক্ষির অভাব হয় না। আমি যে মৌরসী স্বত্ব পঞ্চুর কাছ থেকে কিনেচি সেইটে কাঁচিয়ে দেবার এই ফন্দি।

আমি নিরুপায় দেখে ভাবছিলুম পঞ্চুকে আমার নিজ এলাকাতেই জমি দিয়ে ঘরবাড়ি করিয়ে দিই। কিন্তু মাষ্টার মশায় বল্লেন, অন্যায়ের কাছে সহজে হার মান্‌তে পারব না। আমি নিজে চেষ্টা দেখব।

আপনি চেষ্টা দেখবেন?

হাঁ আমি।

এ সমস্ত মামলা মকদ্দমার ব্যাপার—মাষ্টার মশায় যে কি করতে পারেন বুঝতে পারলুম না। সন্ধ্যাবেলায় যে সময়ে রোজ আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেদিন দেখা হল না। খবর নিয়ে জানলুম, তিনি তাঁর কাপড়ের বাক্স আর বিছানা নিয়ে বেরিয়ে

গেছেন, চাকরদের কেবল এইটুকু বলে গেছেন, তাঁর ফিরতে দু-চার দিন দেরী হবে। আমি ভাবলুম, সাক্ষী সংগ্রহ করবার জন্যে তিনি পঞ্চুদের মামার বাড়িতেই বা চলে গেচেন। তা যদি হয় আমি জানি সে তাঁর বৃথা চেষ্টা হবে। জগদ্ধাত্রী পূজো, মহরম এবং রবিবারে জড়িয়ে তাঁর ইস্কুলের কয়দিন ছুটি ছিল তাই ইস্কুলেও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না।

হেমন্তের বিকেলের দিকে দিনের আলোর রঙ যখন ঘোলা হয়ে আস্‌তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে মনেরও রং বদল হয়ে আসে। সংসারে অনেক লোক আছে যাদের মনটা কোঠা বাড়িতে বাস করে। তারা "বাহির" বলে পদার্থকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চল্‌তে পারে। আমার মনটা আছে যেন গাছতলায়। বাইরের হাওয়ার সমস্ত ইসারা একেবারে গায়ের উপরে এসে পড়ে, আলো অন্ধকারের সমস্ত মীড় বুকের ভিতরে বেজে ওঠে। দিনের আলো যখন প্রখর থাকে তখন সংসার তার অসংখ্য কাজ নিয়ে চারদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়, তখন মনে হয় জীবনে এ ছাড়া আর কিছুরই দরকার নেই। কিন্তু যখন আকাশ ম্লান হয়ে আসে, যখন স্বর্গের জানলা থেকে মর্ত্ত্যের উপর পর্দ্দা নেমে আস্‌তে থাকে, তখন আমার মন বলে, জগতে সন্ধ্যা আসে সমস্ত সংসারটাকে আড়াল করবার জন্যেই,—এখন কেবল একের সঙ্গ অনন্ত অন্ধকারকে ভরে তুলবে, এইটেই ছিল জলস্থল-আকাশের একমাত্র মন্ত্রণা। দিনের মধ্যে যে প্রাণ অনেকের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠবে সন্ধ্যার সময় সেই প্রাণই একের মধ্যে মুদে আস্‌বে, আলো অন্ধকারের ভিতরকার অর্থটাই ছিল এই। আমি সেটাকে অস্বীকার করে কঠিন হয়ে

থাক্‌তে পারিনে,—তাই সন্ধ্যাটি যেই জগতের উপর প্রেয়সীর কালো চোখের তারার মত অনিমেষ হয়ে ওঠে তখন আমার সমস্ত দেহমন বল্‌তে থাকে,—সত্য নয়, একথা কখনোই সত্য নয়, যে, কেবলমাত্র কাজই মানুষের আদি অন্ত;—মানুষ একান্তই মজুর নয়, হোক্‌ না সে সত্যের মজুরী, ধর্ম্মের মজুরী;—সেই তারার আলোয় ছুটি-পাওয়া কাজের-বাইরেকার মানুষ, সেই অন্ধকারের অমৃতে ডুবে মরবার মানুষটিকে তুই কি চিরদিনের মত হারালি, নিখিলেশ? সমস্ত সংসারের অসংখ্যতাও যে জায়গায় মানুষকে লেশমাত্র সঙ্গ দিতে পারে না, সেইখানে যে-লোক একলা হয়েচে সে কি ভয়ানক একলা!

সেদিন বিকেলবেলাটা ঠিক যখন সন্ধ্যার মোহানাটিতে এসে পৌঁচেছে, তখন আমার কাজ ছিল না, কাজে মনও ছিল না, মাষ্টার মশায়ও ছিলেন না, শূন্য বুকটা যখন আকাশে কিছু-একটা আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছিল তখন আমি বাড়িভিতরের বাগানে গেলুম। আমার চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বড় সখ। আমি টবে করে' নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা বাগানে সাজিয়েছিলুম, যখন সমস্ত গাছ ভরে' ফুল ফুটে উঠত তখন মনে হত সবুজ সমুদ্রে ঢেউ লেগে রঙের ফেনা উঠেচে। কিছুকাল আমি বাগানে যাইনি, আজ মনে মনে একটু হেসে বল্লুম, আমার বিরহিণী চন্দ্রমল্লিকার বিরহ ঘুচিয়ে আসিগে।

বাগানে যখন ঢুক্‌লুম তখন কৃষ্ণ প্রতিপদের চাঁদটি ঠিক আমাদের পাঁচিলের উপরটিতে এসে মুখ বাড়িয়েচে। পাঁচিলের তলাটিতে নিবিড় ছায়া—তারই উপর দিয়ে বাঁকা হয়ে চাঁদের আলো বাগানের পশ্চিম দিকে এসে পড়েচে। ঠিক আমার মনে

হল চাঁদ যেন হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে অন্ধকারের চোখ টিপে ধরে মুচকে হাস্‌চে।

পাঁচিলের যে-ধারটিতে গ্যালারির মত করে' থাকে-থাকে চন্দ্র-মল্লিকার টব সাজানো রয়েচে সেই দিকে গিয়ে দেখি সেই পুষ্পিত সোপান-শ্রেণীর তলায় ঘাসের উপরে কে চুপ করে' শুয়ে আছে। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্‌ করে উঠল। আমি কাছে যেতেই সেও চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌ল।

তার পর কি করা যায়? আমি ভাবচি আমি এইখান থেকে ফিরে যাব কি না, বিমলাও নিশ্চয় ভাবছিল সে উঠে চলে যাবে কি না। কিন্তু থাকাও যেমন শক্ত, চলে যাওয়াও তেম্‌নি। আমি কিছু-একটা মন স্থির করার পূর্ব্বেই বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ির দিকে চল্‌ল।

সেই একটুখানি সময়ের মধ্যেই বিমলার দুর্ব্বিষহ দুঃখ আমার কাছে যেন মূর্ত্তিমান হয়ে দেখা দিল্ল। সেই মুহূর্ত্তে আমার নিজের জীবনের নালিশ কোথায় দূরে ভেসে গেল! আমি তাকে ডাক্‌লুম, বিমলা!

সে চম্‌কে দাঁড়াল। কিন্তু তখনো সে আমার দিকে ফিরল না। আমি তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম। তার দিকে ছায়া, আমার মুখের উপর চাঁদের আলো পড়ল। সে দুই হাত মুঠো করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে 'রইল। আমি বল্লুম, বিমলা, আমার এই পিঁজ্‌রের মধ্যে চারিদিক বন্ধ, তোমাকে কিসের জন্যে এখানে ধরে রাখব? এমন করে ত তুমি বাঁচবে না!

বিমলা চোখ বুজেই রইল, একটি কথাও বল্লে না।

আমি বল্লুম, তোমাকে যদি এমন জোর করে বেঁধে রাখি তাহলে আমার সমস্ত জীবন যে একটা লোহার শিকল হয়ে উঠ্‌বে। তাতে কি আমার কোনো সুখ আছে?

বিমলা চুপ করেই রইল।

আমি বল্লুম, এই আমি তোমাকে সত্য বল্‌চি—আমি তোমাকে ছুটি দিলুম। আমি যদি তোমার আর-কিছু না হতে পারি অন্তত আমি তোমার হাতের হাতকড়া হব না!

এই বলে আমি বাড়ির দিকে চলে গেলুম। না, না, এ আমার ঔদার্য্য নয়, এ আমার ঔদাসীন্য ত নয়ই। আমি যে ছাড়তে না পারলে কিছুতেই ছাড়া পাব না। যাকে আমার হৃদয়ের হার করব তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা করে রেখে দিতে পারব না। অন্তর্যামীর কাছে আমি জোড়হাতে কেবল এই প্রার্থনাই করচি আমি সুখ না পাই, নেই পেলুম; দুঃখ পাই সেও স্বীকার কিন্তু আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ো না। মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে রাখার চেষ্টা যে নিজেরই গলা চেপে ধরা। আমার সেই আত্মহত্যা থেকে আমাকে বাঁচাও!

বৈঠকখানার ঘরে এসে দেখি মাষ্টার মশায় বসে আছেন। তখন ভিতরে ভিতরে আবেগে আমার মন দুলচে। মাষ্টার মশায়কে দেখে আমি অন্য কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার আগে বলে উঠলুম—মাষ্টার মশায়, মুক্তিই হচ্চে মানুষের সব চেয়ে বড় জিনিষ। তার কাছে আর-কিছুই নেই, কিছু-ইনা!

মাষ্টার মশায় আমার এই উত্তেজনায় আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। কিছু না বলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বল্লুম, বই পড়ে কিছুই বোঝা যায় না। শাস্ত্রে পড়েছিলুম, ইচ্ছাটাই বন্ধন, সে নিজেকে বাঁধে অন্যকে বাঁধে। কিন্তু শুধু কেবল কথা ভয়ানক ফাঁকা। সত্যি যেদিন পাখীকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি সেদিন বুঝ্‌তে পারি পাখীই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আমি তোমাকে বলছি পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ বুঝ্‌তে পারচে না। সবাই মনে করচে, সংস্কার আর কোথাও করতে হবে। আর কোথাও না, কোথাও না, কেবল ইচ্ছের মধ্যে ছাড়া!

মাষ্টার মশায় বল্লেন, আমরা মনে করি, যেটা ইচ্ছে করেচি সেটাকে হাতে করে পাওয়াই স্বাধীনতা,— কিন্তু, আসলে, যেটা ইচ্ছে করেচি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।

আমি বল্লুম, মাষ্টার মশায়, অমন করে কথায় বল্‌তে গেলে টাক্-পড়া উপদেশের মত শোনায় কিন্তু যখনই চোখে ওকে আভাস মাত্রেও দেখি তখন যে দেখি ঐটেই অমৃত। দেবতারা এইটেই পান করে' অমর। সুন্দরকে আমরা দেখতেই পাই নে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই। বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেক্‌জাণ্ডার করেন নি, একথা যে তখন মিথ্যেকথা যখন এটা শুক্‌নো গলায় বলি, এই কথা কবে গান গেয়ে বল্‌তে পারব? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই সব প্রাণের কথা ছাপার বইকে ছাপিয়ে পড়বে কবে, একেবারে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার নির্ঝরের মত?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাষ্টার মশায় ক'দিন ছিলেন না,—

কোথায় ছিলেন তা জানিও নে। একটু লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি ছিলেন কোথায়?

মাষ্টার মশায় বল্লেন, পঞ্চুর বাড়িতে।

পঞ্চুর বাড়িতে? এই চারদিন সেখানেই ছিলেন?

হাঁ, মনে ভাবলুম যে-মেয়েটি পঞ্চুর মামী সেজে এসেচে তার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কয়ে দেখব। আমাকে দেখে প্রথমটা সে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল;—ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও যে এত বড় অদ্ভুত কেউ হতে পারে এ কথা সে মনে করতেও পারে নি। দেখ্‌লে যে আমি রয়েই গেলুম। তার পরে তার লজ্জা হতে লাগ্‌ল। আমি তাকে বল্লুম, মা, আমাকে ত তুমি অপমান করে তাড়াতে পারবে না। আর, আমি যদি থাকি তাহলে পঞ্চুকেও রাখব; ওর মা-হারা সব ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, তারা পথে বেরবে এ ত আমি দেখ্‌তে পারব না।—দুদিন আমার কথা চুপ করে শুন্‌লে,—হাঁও বলে না, নাও বলে না, শেষকালে আজ দেখি পোঁটলা-পুঁটুলি বাঁধচে। বল্লে, আমরা বৃন্দাবনে যাব, আমাদের পথ-খরচ দাও।—বৃন্দাবনে যাবে না জানি কিন্তু একটু মোটা রকম পথ খরচ দিতে হবে। তাই তোমার কাছে এলুম।

আচ্ছা সে যা দরকার তা দেব।

বুড়িটা লোক খারাপ নয়। পঞ্চু ওকে জলের কলসী ছুঁতে দেয় না, ঘরে এলে হাঁ হাঁ করে' ওঠে তাই নিয়ে ওর সঙ্গে খুঁটিনাটি চল্‌ছিল। কিন্তু ওর হাতে আমার খেতে আপত্তি নেই শুনে আমাকে যত্নের একশেষ করেচে। চমৎকার রাঁধে। আমার

উপরে পঞ্চুর ভক্তিশ্রদ্ধা যা একটুখানি ছিল তাও এবার চুকে গেল। আগে ওর ধারণা ছিল অন্তত আমি লোকটা সরল, কিন্তু এবার ওর ধারণা হয়েচে আমি যে বুড়িটার হাতে খেলুম সেটা কেবল তাকে বশ করবার ফন্দী। সংসারে ফন্দীটা চাই বটে কিন্তু তাই বলে একেবারে ধর্ম্মটা খোয়ানো? মিথ্যে সাক্ষিতে আমি বুড়ির উপর যদি টেক্কা দিতে পারতুম, তাহলে বটে বোঝা যেত।—যাহোক বুড়ি বিদায় হলেও কিছুদিন আমাকে পঞ্চুর ঘর আগ্‌লে থাক্‌তে হবে—নইলে হরিশকুণ্ডু কিছু একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বস্‌বে। সে না কি ওর পারিষদদের কাছে বলেচে,—আমি ওর একটা জাল মামী জুটিয়ে দিলুম, ও বেটা আমার উপর টেক্কা মেরে কোথা থেকে এক জাল বাবার জোগাড় করেচে; দেখি ওর বাবা ওকে বাঁচায় কি করে?

আমি বল্লুম, ও বাঁচতেও পারে মরতেও পারে, কিন্তু এই যে এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরি করচে, ধর্ম্মে, সমাজে, ব্যবসায়ে, সেটার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যদি হারও হয় তাহলেও আমরা সুখে মরতে পারব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অলঙ্কারের সূত্রপাত

যে দেশে কাব্য আছে সে দেশে অলঙ্কারও আছে এবং থাকা উচিত। গ্রীসে আরিষ্টটেল ছিলেন এবং এদেশে ভামহ থেকে আরম্ভ করে বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত পর পর যত আলঙ্কারিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা প্রস্তুত করলে একখানি ছোট-খাট ক্যাটালগ তৈরি হয়।

অলঙ্কার যে কেবল প্রাচীন সাহিত্যেই ছিল তা নয়, নব-সাহিত্যেও আছে। এ দুয়ের ভিতর যা প্রভেদ—সে নামের এবং রূপের। একালে আমরা যাঁদের Critic বলি সেকালে তাঁদের আলঙ্কারিক বলত। অনেকের বিশ্বাস যে, সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের কারবার শুধু উপমা, অনুপ্রাস, শ্লেষ, জমক নিয়েই। এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কাব্যের দোষগুণ-বিচারই সে শাস্ত্রেরও মুখ্য উদ্দেশ্য। Criticism-এর উদ্দেশ্যও তাই। তবে বর্ত্তমান ইউরোপে যে Criticism-এর একটা শাস্ত্র গড়ে তোলা হয় নি, তার কারণ সে দেশের Critic-রা ক্রমান্বয়ে এই সত্যের পরিচয় পেয়েছেন যে, সে দেশের কবিরা সমালোচকদের রাজশাসন মানেন না। সেখানে কাব্য যুগে যুগে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে সুতরাং এক যুগের অলঙ্কার-শাস্ত্র আর-এক যুগে অর্থশূন্য এবং উপহাসাস্পদ হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে Critic-রা তাঁদের মতামত Codify করতে যে তিলমাত্রও দ্বিধা করতেন না তার কারণ আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা সকল বিষয়েই একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের অত্যন্ত পক্ষপাতী

ছিলেন। এমন কি কালিদাসের ন্যায় অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী কবিও অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। দর্শনের সঙ্গে তার টীকাভাষ্যের যে সম্বন্ধ, কাব্যের সঙ্গে অলঙ্কারের সেই একই সম্বন্ধ;—উভয়েরই উদ্দেশ্য হচ্চে মূল সূত্রের এবং মূল কাব্যের ব্যাখ্যা করা, বিচার করা। এবং দর্শনশাস্ত্রের ভাষ্য-কাররাই যেমন কালক্রমে তার গুরু হয়ে উঠেন তেমনি কাব্য-শাস্ত্রের ভাষ্যকাররাই কালক্রমে তার গুরু হয়ে উঠেন এবং কবি-সমাজ সেই গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়। মহাপ্রভু চৈতন্য সার্ব্বভৌমকে বলেছিলেন যে, তিনি বেদান্ত মানেন, কিন্তু আচার্য্যকে মানেন না, অর্থাৎ উপনিষদ্ মানেন কিন্তু তার শাঙ্কর-ভাষ্য মানেন না। ভগবানের অবতার ব্যতীত এত বড় কথা বল্‌বার সাহস এদেশে সেকালে কোনও রক্তমাংসের দেহধারী মানবের ছিল না এবং কবিরা আর যাই হো'ন না কেন, অবতার বলে লোক-সমাজে কখনই গ্রাহ্য হন নি। সুতরাং তাঁরা বিনা আপত্তিতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের দ্বারা শাসিত হতেন।

এ বিষয়ে ইংলণ্ডের মনোভাব ভারতবর্ষের ঠিক উল্টো—ইংরাজি সাহিত্যিকেরা কস্মিন্‌কালেও কোনরূপ অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধীনতা স্বীকার করেন নি। জীবনে ও মনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখাই হচ্ছে ইংরাজি সভ্যতার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। কিন্তু ফরাসীদের মনোভাব এ দুয়ের মাঝামাঝি। তাঁদের বিশ্বাস যে, রচনা কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়মের অধীন না হলে তা আর্ট হয় না এবং রচনাকে আর্ট করে তোলাই ফরাসী-লেখকদের জীবনের ব্রত। সাহিত্যের ভাষা এবং রীতি (style) সম্বন্ধে সাহিত্যে তাঁরা একটা স্পষ্ট

আদর্শ উচ্চে ধরে রাখতে চান। এই জন্যই ফরাসীবিপ্লবের প্রচণ্ড ধাক্কায় পুরাকালের সমাজশাসনের সকল ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলেও French Academy আজও টিঁকে আছে। ফরাসী সাহিত্যের এই প্রিভি-কাউন্সিলে সমগ্র সাহিত্যের চূড়ান্ত বিচার আজও হয়ে থাকে। এই পণ্ডিতমণ্ডলী প্রধানতঃ রচনার রীতির বিচার করেন,—নীতির নয়; সাহিত্যের এই ব্যবস্থাপক সভা অদ্যাবধি সাহিত্যের সুরীতি সযত্নে রক্ষা করে আস্‌ছেন;—এর ফলে, ফরাসী গদ্য যে আদর্শ গদ্য এ কথা সমগ্র ইউরোপে সর্ব্ববাদীসম্মত। অপর পক্ষে ইংলণ্ডে, লেখা সম্বন্ধে অবাধ স্বাধীনতার ফলাফল ইংরাজি সাহিত্যে স্পষ্ট দেখা যায়। একদিকে যেমন অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখকদের হাতে ইংরাজি রচনা অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য, শ্রী ও শক্তি লাভ করে, অপর দিকে সাধারণ লেখকদের হাতে সে রচনা তেমনি অসংযত শিথিল, দীর্ঘসূত্র ও গুরুভার হয়ে পড়ে। ইংরাজি ভাষায় সচরাচর যে ভাবে গদ্য লেখা হয় তার ভিতর বিশেষ কোন নৈপুণ্য কিম্বা গুণপনার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রচলিত ফরাসী গদ্যের তুলনায় প্রচলিত ইংরাজি গদ্য নিতান্ত কাঁচা। ইংলণ্ডের প্রতি বড় লেখকের রচনা-রীতি স্বতন্ত্র এবং অসামান্য। ও-দেশের গদ্য সাহিত্যে ইংরাজি-রীতি বলে কোনও-একটি সামান্য রীতি নেই। এই আর্টহীন, অযত্নপ্রসূত সাহিত্যের প্রভাবেই বাঙ্গলা-গদ্য এতটা ঢিলে এবং এলোমেলো হয়ে পড়েছে। এটি নিতান্তই দুঃখের বিষয়। কেননা ইংরাজি সাহিত্যের রচনা সুশৃঙ্খল না হলেও ভাবের স্বাতন্ত্র্যে ও চিন্তার স্বাধীনতায় সে সাহিত্য যথেষ্ট সবল এবং সচল। ইংরাজেরা বলেন যে, তাঁরা পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রে bungle through

করে অবশেষে জয়লাভ করেন। ইংরাজি গদ্যের বাহ্যিক অনুকরণে আমরা যা লিখি তা অকারণে বিশৃঙ্খল; কেননা আমাদের প্রাণের ভিতর এমন কোনও উদ্দাম শক্তি নেই যা আত্মপ্রকাশের জন্য আর্টের সকল বন্ধন ছিন্ন করতে বাধ্য। তারপর আমাদের মনের উপর ইংরাজি সাহিত্যের একাধিপত্য যদি না থাকত তাহলে আমরা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রকে একেবারেই উপেক্ষা করতুম না। এবং সে শাস্ত্রকে মান্য করতে শিখলে, আমরা সকল আলঙ্কারিকের মতে রচনার যেটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি—বৈদর্ভীরীতি, বাঙ্গলা লেখায় নিশ্চয়ই সেইটির চর্চ্চা করতুম। এ রীতির প্রধান গুণ প্রসাদগুণ। এ রীতির রচনা—সহজ, সরল, পরিষ্কার, ও পরিচ্ছিন্ন। ভাষাকে হীরকের মত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, সারালো এবং ধারালো করে তোলাই এ রীতির উদ্দেশ্য। সুতরাং এ রীতিতে সব রকম বাহুল্য ও আতিশয্য—এক কথায় ভাষার ও ভাবের বাড়াবাড়ি—সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ফরাসী গদ্য-বন্ধ এই বৈদর্ভীরীতি অবলম্বন করেই পৃথিবীর আদর্শ গদ্য হয়ে উঠেছে। এবং যে কারণে ফরাসীজাতি এ রীতির পক্ষপাতী, সে-কারণ আমাদের মধ্যেও বিদ্যমান। ফ্রান্সের কবি, আলঙ্কারিক, দার্শনিক প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত, যে, যেহেতু ফরাসীজাতি রোমান্ সভ্যতার উত্তরাধিকারী—সে কারণ যে গুণে ল্যাটিন্-সাহিত্যের বিশেষত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব—সে গুণের চর্চ্চা করা ফরাসী লেখকদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য; নচেৎ ফরাসী সাহিত্য তার স্বধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরাজ্য হারাবে। এ রাজ্য আলোর রাজ্য—ধোঁয়ার রাজ্য নয়। ফরাসীরা জাতীয় মনকে ইতালীর সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত করতে চায়,

—স্বর্ণময়ীর কুয়াশায় আবৃত করতে চায় না। সাহিত্য-জগতের এই সূর্য্য-উপাসকদের নিকট বাক্যের প্রকাশ-গুণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে গ্রাহ্য হয়েছে। আমরাও নিজেদের সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলে গর্ব্ব করি, যে সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে গায়ত্রী। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে প্রসাদগুণই বঙ্গসাহিত্যের প্রধান গুণ হওয়া কর্ত্তব্য। তবে যে আমাদের মন সাহিত্যে দীপশিখার মত জ্বলে ওঠে না, কিন্তু নেবানো বাতির মত শুধু ধোঁয়ায়, তার একটি কারণ এই যে, আমরা বাহুল্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী। শিখার দেহ একটুখানি; ধোঁয়ার অনেকখানি; আর তা ছাড়া শিখা নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং স্পষ্ট রূপ বজায় রেখেই চারিদিকে আলো ছড়ায়—অপর পক্ষে ধোঁয়া যত বেশি এলিয়ে যায় এবং যত বেশি আকার-হীন ও অস্পষ্ট হয়ে যায় ততই তা চারিয়ে যায়।

আলো ধরে-ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, কেননা আলো পদার্থ নয়,—ও শুধু বিশ্বের হৃদয়ের কাঁপুনি। অপর পক্ষে ধোঁয়া যে শুধু পাওয়া যায় তাই নয়, ও বস্তু গলাধঃকরণও করা যায়।

বৈদর্ভীরীতি সাহিত্যের সাধন-রীতি-স্বরূপে গ্রাহ্য করা আমাদের পক্ষে যে তেমন স্বাভাবিক নয় তার একটি বিশেষ কারণ আছে। ল্যাটিন্ সাহিত্য একটিমাত্র নগরীর—রোমের—সাহিত্য; সুতরাং সে সাহিত্যে একটিমাত্র রীতিই প্রাধান্যলাভ করেছিল। পৃথিবীর সকল পথ রোমে গেলেও, রোমানরা সভ্যতার একটিমাত্র পথ ধরেই চলেছিলেন, এবং ফরাসীজাতি আজ পর্য্যন্ত মনোজগতে সেই এক পথেরই পথিক। সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সাহিত্য নানা যুগে, এই বিশাল ভারতবর্ষের নানা দেশে নানা

আকারে, নানা ভঙ্গীতে দেখা দিয়েছে। এক ভাষা ব্যতীত এ সাহিত্যের অপর কোনই ঐক্য নেই। বৈদিক সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলেও সংস্কৃত সাহিত্য প্রথমতঃ প্রাচীন এবং নব্য এই দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত। কাব্য বল, অলঙ্কার বল, দর্শন বল, সব এই দুই শ্রেণী-ভুক্ত। তা ছাড়া দেশভেদে, রচনারীতিরও বহুতর প্রভেদ ছিল। এই নানা রীতির মধ্যে অন্ততঃ এমন দুটি রীতি ছিল, যার একটি আর-একটির সম্পূর্ণ বিপরীত। দণ্ডী বলেছেন যে, যে-সকল গুণের সদ্ভাবে বৈদর্ভীরীতির সৃষ্টি হয় সেই সকল গুণের বিপর্য্যয়েই গৌড়ীয়রীতির জন্ম। শুধু দণ্ডী নয়, বামনাচার্য্য প্রভৃতি সকল প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা এ বিষয়ে একমত। শব্দাড়ম্বর, অনুপ্রাসের ঘনঘটা, সমাসবহুলতা, অপ্রসিদ্ধার্থক শব্দের প্রয়োগ, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি এই সবই হচ্ছে গৌড়ীয়রীতির সম্বল ও সম্পদ। এ গৌড় কোন্ গৌড় তা কারও জানা নেই, কেননা সেকালে ভারতবর্ষে পঞ্চ-গৌড় ছিল। তবু এই নামের গুণেই বাঙ্গালী আজ গৌড়ীয়রীতিকে আত্মসাৎ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পার্‌ছে না। এক মেঘনাদবধ-কার ব্যতীত অদ্যাবধি আর কেউ এ রীতিতে কৃতিত্ব লাভ কর্‌তে পারেন নি। আমরা গদ্য রচনায় যে রীতি অবলম্বন করেচি সে হচ্ছে ইঙ্গ-গৌড়ীয়রীতি—কেননা ইংরাজি গদ্যের অনুকরণ এবং অনুবাদ থেকেই বাঙ্গলা গদ্যের উৎপত্তি। এক্ষেত্রে লেখার একটা নূতন পথ ধরবার ইচ্ছে হওয়াটা কারও কারও পক্ষে স্বাভাবিক। প্রচলিত পদ্ধতি ত্যাগ করে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করবার মুখে মহাতর্ক উপস্থিত হয়। আজকে বাঙ্গলা সাহিত্যে সেই তর্ক উঠেছে অর্থাৎ অলঙ্কারের সূত্রপাত হয়েছে।

(২)

অথাতো বাক্যজিজ্ঞাসা”—এই হচ্ছে অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রথম যদিচ সে শাস্ত্রে কোথাও এ প্রশ্ন সূত্রের আকার ধারণ ়, তবুও কি ভাষায় কাব্য রচনা করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আচার্য্যই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন, কেননা রীতির সঙ্গে । সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

কান্ ভাষায় বঙ্গ সাহিত্য রচনা করা কর্ত্তব্য এ প্রশ্ন আমাদের বিশেষ করে জিজ্ঞাস্য, কেননা বাঙ্গলায় মুখের ভাষা এক, র ভাষা আর। এর উত্তরে একদল বলেন যে, যে ভাষা । বই পড়ে শিখি, সেই ভাষাতেই বই লেখা কর্ত্তব্য। ভারতচন্দ্রের মত এর ঠিক উল্টো। তিনি বলেন—

“পড়িয়াছি যেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের অদ্বিতীয় শিল্পীর এই মত আমি ।ধার্য্য করি—কাব্য যে “রস লয়ে” এ কথা কেউ অস্বীকার ।ন না, তবে “রস” যে কি বস্তু সে বিষয়ে অবশ্য ভীষণ ভদ আছে। এস্থলে আমি রসতত্ত্বের বিচার করতে চাই নে, না প্রায়ই দেখতে পাই যে, লোকে রসশাস্ত্রের আলোচনায় ।নের পরিচয় দেন না।

আমার বক্তব্য এই যে, “পড়িয়াছি যেই মত” সেই মত “বর্ণিবার” চেষ্টা করলে রচনা প্রসাদগুণে বঞ্চিত হয়। অতএব “যাবনী মিশাল” মাতৃভাষাতেই কাব্য রচনা করা উচিত, এককথায় বৈদর্ভীরীতি অবলম্বন করাই বঙ্গ সরস্বতীর পক্ষে শ্রেয়ঃ।

বামনাচার্য্য বলেছেন—বৈদর্ভীরীতি “সমগ্রগুণা” অর্থাৎ কাব্যের সকল গুণ এক প্রসাদগুণেরই অন্তর্ভূত। এই প্রসাদগুণ লাভ করতে হলে যে মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক, এ কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হলে, আলঙ্কারিকেরা অপরাপর যে সকল গুণের বিচার করেছেন সে সকলের উল্লেখ করা দরকার। দণ্ডীর মতে, অর্থব্যক্তি (Clarity) সমতা (Unity) কান্তি (Restraint) মাধুর্য্য (Beauty) ঔদার্য্য (Refinement) এই সকল গুণই হচ্ছে বৈদর্ভীরীতির প্রাণ। ফরাসী আলঙ্কারিকেরাও এই ক'টিই রচনার প্রধান গুণ বলে গ্রাহ্য করেন।

বলা বাহুল্য যে, যে ভাষা আমরা সব চাইতে ভাল জানি এবং যে ভাষার উপর আমাদের দখল সব চাইতে বেশি, সেই ভাষায় লিখলেই রচনায় এ সকল গুণ থাকবার সম্ভাবনা বেশি। শুধু তাই নয়—কোনও কৃত্রিম ভাষায় লিখতে গেলে, আলঙ্কারিকদের মতে যা দোষ বলে গণ্য, রচনাকে সে দোষমুক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। ঈষৎ অন্যমনস্ক হলেই সে সব দোষ রচনায় আপনি এসে পড়বে।

আমি এখানে দুটি চারটি দোষের উল্লেখ করছি। প্রথম “অপার্থ” অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থ নয় সেই অর্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা। তারপর “একার্থ” অর্থাৎ একই অর্থের শব্দ একের চাইতে বেশি বার ব্যবহার করা ;—একে পুনরুক্তি দোষও বলা যেতে পারে।

তার পর "সংশয়" অর্থাৎ যেখানে কোন বস্তু নিশ্চয় করে বলবার অভিপ্রায় আছে সেখানে যদি শব্দ-প্রয়োগের দোষে সংশয় উৎপন্ন করা হয় তাহলে বাক্য, সংশয়দোষে দুষ্ট হয়। তারপর "শব্দহীনতা" অর্থাৎ অভিধান ব্যাকরণাদির প্রতি লক্ষ্য না করে, শব্দের যদি অঙ্গ বিকৃত করে দেওয়া যায়, তাহলে সে শব্দ অশিষ্ট হয়ে পড়ে। বাঙ্গালীর মুখে মুখে যে-সংস্কৃতশব্দের প্রচলন নেই সেরূপ শব্দ ব্যবহার করতে গেলে আমাদের রচনায় শব্দহীনতা দোষ অতি সহজেই এসে পড়ে। পদে পদে যদি অভিধান এবং ব্যাকরণের পাতা উল্টোতে হয় তাহলে লেখককে যে কতদূর বিপন্ন হয়ে পড়তে হয় তা সহজেই বুঝতে পারেন। যে কথা আমরা যে ভাবে মুখে বলি সে কথা ঠিক সেই ভাবে লিখলে এ বিপদ আমরা এড়িয়ে যেতে পারি, কেননা—আমরা যা বলি প্রাকৃত ব্যাকরণ অনুসারে তাই শুদ্ধ। ইঙ্গ-গৌড়ীয় রীতির রচনাতে এ সকল দোষ পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখা যায়। অপরের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের এ রীতির রচনা এ সকল দোষমুক্ত নয়। দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি তাঁর প্রথম বয়েসের কাব্য সকল ইঙ্গ-গৌড়ীয় রীতিতে এবং সীতারাম প্রভৃতি তাঁর শেষ কাব্য-সকল বৈদর্ভীরীতিতে রচিত। দুর্গেশনন্দিনীর গদ্য বিভক্তিহীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আর সীতারামের গদ্য মাতৃভাষায় লিখিত। এ দুয়ের পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্টই দেখানো যায়।

নিম্নে তাঁর রচনার দুটি নমুনা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এ দুটির ভিতর বিষয়ের ঐক্য আছে সুতরাং ভাষার পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহায়তন প্রগল্ভ-বয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। সুগঠিত সুগোল ললাট অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতিপ্রশস্তও নহে, নিশীথকৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্ত ভাবপ্রকাশক; তৎপার্শ্বে অতি নিবিড় বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশসকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড় বর্ণ, চিত্রকর-লিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার, আর এক সুতা স্থূল হইলে নির্দ্দোষ হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস? তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরঞ্জিনী হইতে পারিবে না। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত; তাহাতে 'বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ চকিত' কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না।"

(দুর্গেশনন্দিনী)

বঙ্কিমচন্দ্র এই স্থলে প্রশ্ন করেছেন—"তিলোত্তমা একাকিনী কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া কি করিতেছেন?" উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিলোত্তমা বই পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলেন—প্রথমে কাদম্বরী, তারপর সুবন্ধু-কৃত বাসবদত্তা, তারপর গীতগোবিন্দ। তিলোত্তমা এসব কাব্য পড়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ পড়েন নি, কেননা সুবন্ধু-কৃত বাসবদত্তা এবং গীতগোবিন্দ কুমারীপাঠ্য পুস্তক নয়, কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর লেখক যে পড়েছিলেন তার পরিচয় দুর্গেশনন্দিনীর রূপ-বর্ণনাতেই পাওয়া যায়।

"তা, সেদিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর! কি সুন্দর আলোই তার উপর পড়িয়াছিল। সেই কথা

ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। বাতির আলো বলিয়াই কি অমন দেখাইল? তা হ'লে মানুষ রাত্রিদিন বাতির আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকে না কেন? কি মিস্‌মিসে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা! কি ফলান রঙ! কি ভুরু! কি চোখ! কি ঠোঁট—যেমন রাঙা তেমনই পাতলা! কি গড়ন! তা কোন্‌টাই বা গঙ্গারাম ভাবিবে? সবই যেন দেবীদুর্ল্লভ। গঙ্গরাম ভবিল, 'মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জানেতম না! একবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচিব, সুখে কাটাইতে পারিব'।"

(সীতারাম)

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁচাহাতের লেখার সঙ্গে তাঁর পাকাহাতের লেখার তুলনা করলেই দেখা যায় যে—বঙ্কিমচন্দ্রের নজির আমাদের মতই সমর্থন করে। অর্থাৎ "সীতারামের" ভাষাই আমাদের যথার্থ আদর্শ, দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা নয়। কেননা, আমরা যদি সাহিত্যে মৌখিক ভাষা গ্রাহ্য করি, তাহলে আমাদের রচনা—সগুণ না হোক্ নির্দ্দোষ হবে। যে পথে বঙ্কিমচন্দ্রের পদস্খলন হয়েছে, সে পথে বুক ফুলিয়ে চল্‌তে গেলে আমাদের চিৎ-পতন অনিবার্য্য। সুতরাং দুর্গেশনন্দিনীর রূপবর্ণনায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোন্ কোন্ নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে, তা একটু খুলে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে "তাঁহার দেহায়তন প্রগল্‌ভবয়সী রমণী-দিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।" "প্রগল্‌ভ" শব্দের অর্থ দাম্ভিক, নির্লজ্জ ইত্যাদি; অতএব "প্রগল্‌ভ-বয়সী" এই যুক্ত পদের কোন অর্থ হয় না। এখানে অপার্থ দোষ ঘটেছে। "প্রগল্‌ভ" শব্দের উক্ত প্রয়োগে—"অভিধানকোষতঃ পদার্থনিশ্চয়" এই সূত্র উপেক্ষা করা হয়েছে। তারপর "বয়সী" এই শব্দ সংস্কৃত

ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। বাঙ্গলায় "সমবয়সী" হয় কিন্তু সংস্কৃতে কোনও বয়সীই হয় না,—হ্রস্বও না, দীর্ঘও না। এস্থলে "শব্দহানি" দোষ ঘটেছে।

তার পর দেখতে পাই যে তিলোত্তমার—

"দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল।"

"মুখাবয়ব" বলায় "অবয়ব" শব্দের প্রয়োগ শিষ্ট হয়নি। অবয়ব শব্দের অর্থ হস্তপদাদি অঙ্গ। ইংরাজিতে যাকে বলে Limb. যদি কেউ বলেন যে, এস্থলে অবয়ব Features অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার উত্তরে আলঙ্কারিকেরা বল্‌বেন যে, Features অর্থে Limb ব্যবহার করায় যে দোষ হয় "আকৃতি" অর্থে "অবয়ব" ব্যবহার করায় ঠিক সেই একই দোষ হয়। যদি "অবয়বকে" অংশ অর্থে ধরা যায় তাহলেও রক্ষে নেই—কেননা সংস্কৃত ভাষায় "অবয়ব" হচ্ছে তাই যা "সমুদয়" নয়। এস্থলে "সমুদয়" অর্থে অবয়ব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং "বিরুদ্ধার্থ" দোষ ঘটেছে।

তার পর তিলোত্তমার—

"ললাট…নিশীথকৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায়।"

নদীর ন্যায় তরল পদার্থের সঙ্গে কপালের মত নিরেট পদার্থের তুলনা করা আলঙ্কারিক মতে সঙ্গত নয়। বিশেষতঃ যখন নদীর গায়ে জ্যোৎস্না পড়লে তার চঞ্চল হয়ে ওঠবারই কথা। চন্দ্রের করস্পর্শে সাগর ত একেবারে আন্দোলিত, উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আমরা অবশ্য এ নিয়ম মানিনে, কেমনা ইংরাজি সাহিত্যে ও সবই চলে। তবে "কৌমুদী"র পূর্ব্বে "নিশীথ" জুড়ে দেবার কি আবশ্যক ছিল? নিশীথের কৌমুদী হয় না,—হয় চন্দ্রের।

আর নিশীথে যে "কৌমুদী" হয় অর্থাৎ দিনে জ্যোৎস্না ফোটে না তা আমরা সবাই জানি।

অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে "নতদ্বাহুল্যম্ একত্র"। তার কারণ "শক্যতেঽকস্যবাচকস্য বাচকবস্তাবকর্ত্তুম, ন বহুনামিতি"। (কাব্যালঙ্কার সূত্রানি) অর্থাৎ এক কথায় যেখানে পুরো মানে পাওয়া যায় সেখানে অনেক কথা ব্যবহার করা অনুচিত। এস্থলে "বাহুল্য" দোষ ঘটেছে।

তারপরে পাই—

"অতি নিবিড়বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশসকল ভ্রযুগে কপোলে গণ্ডে অংসে উরসে আসিয়া পড়িয়াছে।"

নিবিড়বর্ণ বলাতে বর্ণের শুধু গাঢ়তার পরিচয় দেওয়া হয় কিন্তু বর্ণটি যে কি তা বলা হল না। এ গাঢ় বর্ণ লাল কি নীল, কালো কি সোনালি পাঠকের মনে এ সন্দেহের উদয় হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অথচ লেখকের নিশ্চয় উদ্দেশ্য ছিল পাঠককে এই কথা জানানো, যে সে রং কালো। সুতরাং এস্থলে "সংশয়" দোষ ঘটেছে।

"কুঞ্চিতালক কেশসকল" একেবারেই অগ্রাহ্য। অলক শব্দের অর্থ কুঞ্চিত কেশ। "কুঞ্চিত কুঞ্চিত কেশ কেশ" এরূপ পদযোজনা কোন ভাষাতেই চলে না। বাঙ্গলায় অবশ্য চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া হয় কিন্তু সংস্কৃতে কেশ কুঞ্চিত কুঞ্চিত হয় না। অলঙ্কার-শাস্ত্রে এরূপ প্রয়োগ নিষেধ। বামনাচার্য্য বলেন যে "নৈক পদং দ্বি প্রযোজ্যং প্রায়েন"—উদাহরণস্বরূপে তিনি দেখিয়েছেন যে—"পয়োদ পয়োদ" অচল। দ্বিত্ব হচ্ছে বাঙ্গলা ভাষার প্রাণ, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার দেহভার। অশিষ্ট পদের স্পর্শে সংস্কৃত

ভাষার গা জ্বর জ্বর করে না; তার গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। এস্থলে "একার্থ" "বাহুল্য" প্রভৃতি নানা দোষ ঘটেছে।

তারপর সেই "কুঞ্চিত কুঞ্চিত কেশ কেশ সকল" এসে পড়েছে কোথায়? না "কপোলে গণ্ডে"। কপোল এবং গণ্ড অবশ্য মুখের পৃথক পৃথক "অবয়ব" নয়। যার নাম কপোল, তারই নাম গণ্ড। "একার্থ" দোষের এমন স্পষ্ট উদাহরণ বঙ্গ-সাহিত্যেও খুঁজে মেলা ভার।

তার পর ভ্রূর পরিচয় নেওয়া যাক্। তিলোত্তমার—

"ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম নিবিড়বর্ণ, চিত্রকরলিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার"—

এখানে আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত নিড়িবর্ণ, চুল থেকে ভুরুতে এসে পড়েছে। কিন্তু রংটি যে কি তা জানা গেল না। তার পর "কিঞ্চিৎ অধিক" এ দুটি শব্দের বাকি শব্দের সঙ্গে অন্বয় হয় না;—কার চাইতে অধিক তা বলা হয় নি। "ভুরুদুটি যেন তুলি দিয়ে আঁকা" "কিছু বেশী সরু" উপরোক্ত বাক্য হচ্চে এই বাঙ্গলা বাক্যের কথায়-কথায় সংস্কৃত অনুবাদ। "কিছু বেশী"র ভিতর Comparisonএর ভাব নাই। ইংরাজির "a little too thin" যেমন Positive—"কিছু বেশী"ও তেমনি Positive. কিন্তু সংস্কৃতে "কিঞ্চিৎ অধিক" অপর বস্তুর অপেক্ষা রাখে।

তারপর তিলোত্তমার চোখ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—"তাহাতে ...কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না।" কোন্ ভাষার কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে এইরূপ হতে পারে?

সুতরাং রচনার যে রীতি বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষান্তে বর্জ্জন করে-ছিলেন সে রীতি আমাদের গ্রাহ্য হতে পারে না।

এককথায়, বাঙ্গলা-গদ্যকে যদি সাহিত্যের নব নব রাজ্য অধিকার করতে হয়, তাহলে তাকে তার ধার-করা বুনিয়াদি চাল্ ছাড়তে হবে।

(৩)

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা রীতি-বিচার ছাড়া ঔচিত্যবিচারেরও চর্চ্চা করতেন ;—তাঁরা কি লেখা উচিত এবং কি অনুচিত সে বিষয়ের অনেক বিচার করে গেছেন।

বর্ত্তমানে এ দেশের সাহিত্যেও একদল ঔচিত্যবিচারক দেখা দিয়েছেন। এঁরা বলেন যে, বাঙ্গলায় শুধু জাতীয় সাহিত্য এবং বস্তুতান্ত্রিক কাব্য রচনা করা উচিত। এঁরা আমাদের কি বিষয় লিখতে হবে এবং সে বিষয়ে কি কি কথা বলতে হবে তাও সুনির্দ্দিষ্ট করে দিতে চান। এককথায় এঁরা ফরমায়েস দিয়ে কাব্য তৈরি করে নিতে চান।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এরূপ অনধিকার চর্চ্চা কখনও করেন নি। তাঁরা কেবলমাত্র আর্ট হিসাবে কবির বক্তব্য কথার ঔচিত্য-বিচার করেছেন। কাব্যে অশ্লীলতা যে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় এ কথা আমরাও বলি, তাঁরাও বল্‌তেন, কিন্তু এক অর্থে নয়। শ্লীলতার বিচার আমরা নীতির দিক্ থেকে করি, তাঁরা করতেন রুচির দিক্ থেকে। ফলে, সেকালে কাব্যের শ্লীলতা এবং অশ্লীলতা তার ভাষার উপর নির্ভর করত। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে অশ্লীলতার যে সকল উদাহরণ দিয়েছেন তা আমাদের কাছেও অশ্লীল এবং শ্লীলতার যা উদাহরণ দিয়েছেন তাও আমাদের কাছে সমান অশ্লীল। যে বর্ণনা

থাক্‌বার দরুন "বিদ্যাসুন্দর" বঙ্গসাহিত্যে পতিত হয়েছে, সেই সব বর্ণনা থাকা সত্বেও কুমারসম্ভবের উত্তরভাগ সংস্কৃত-সাহিত্যে অতি উচ্চ আসন লাভ করেছে। আমাদের রুচিজ্ঞানের বিষয় হচ্ছে কাব্যের অর্থ—তাঁদের ছিল বাক্য। আমি অবশ্য এ কালের মনকে সে কালে ফিরে যেতে বলিনে, কেননা সে ফেরা সভ্যতা হতে অসভ্যতায় ফেরা হবে। তবে সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এ বিষয়ে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মত সম্পূর্ণ ভুল নয়। সভ্যতা জিনিষটে অনেকটা ভাষার কথা। আমাদের সুরুচি আজও যে ভাষাগত তার প্রমাণ শিক্ষিত লোকে আজও গীতগোবিন্দ পড়ে মুগ্ধ হন; ও-কাব্য সাদা-বাঙ্গলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় কি?

আলঙ্কারিকদের ঔচিত্য-জ্ঞানের বিষয় যে কি তার স্পষ্ট পরিচয় মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের একটি কথায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, পায়ের বাঁকমল যদি গলায় পরা যায় তাহলে কণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি হয় না বরং যদি কিছু বৃদ্ধি হয় ত সে শ্বাস-রোধের সম্ভাবনা। কোন্ কথা কোথায় বসে, কোন্ উপমা কিসে লাগে, কোথায় কোন্ রসের অবতারণা করা উচিত—এই সবই ছিল তাঁদের অলোচ্য বিষয়। তাঁরা সরস্বতীকে দেবীস্বরূপে জানতেন এবং মানতেন বলে তাঁকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করবার বৃথা চেষ্টা করেন নি। তাঁরা এ জ্ঞান কখনও হারান নি, যে ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের অধিকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমাজ-গঠন এবং সাহিত্য-গঠনের উপায় এক হতে পারে না, কেননা এ দুয়ের উপাদানও স্বতন্ত্র, উদ্দেশ্যও স্বতন্ত্র;—এ সত্য আমরা দুবেলা ভুলে যাই।

আধা-খেঁচড়া ইংরাজি শিক্ষার ফলে, আমাদের মনে এই অদ্ভুত ধারণা জন্মেছে যে, যাঁর কোনও বিষয়ে বিশেষ অধিকার নেই তাঁর সকল বিষয়েই সমান অধিকার আছে—অন্ততঃ সমালোচনা কর্‌বার। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের অবশ্য আত্মীয়তা আছে, শুধু তাই নয়, মনোজগতের সঙ্গে জড়জগতেরও কুটুম্বিতা আছে;—কিন্তু যে শাস্ত্রের হাতে এ সকল সম্বন্ধ নির্ণয় কর্‌বার ভার তা হয় দর্শন, নয় বিজ্ঞান;—অলঙ্কার নয়। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার এ তাবৎ বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপে স্বীকৃত হয় নি। এ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে অলঙ্কার তার সীমা অতিক্রম করতে, তার মর্য্যাদা লঙ্ঘন কর্‌তে বাধ্য হয়। একটু অসতর্ক হলেই অলঙ্কার দর্শনে গড়িয়ে পড়ে এবং ছড়িয়ে যায়। আজ আমি সে বিপদ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করব, কেননা দর্শনের পথে যাওয়ার অর্থ প্রায়ই আলোক থেকে অন্ধকারে যাওয়া। প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আজকাল দেখতে পাই—অনেক সমালোচক একটিমাত্র সূত্র নিয়ে নব সাহিত্য-দর্শন গড়বার চেষ্টা করছেন। সে হচ্ছে এই যে, কাব্যের উদ্দেশ্য "সত্য শিব সুন্দরের" মিলন করা। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে এ সূত্র নেই—কেননা, প্রাচীন আচার্য্যদের জ্ঞানে, এ ত্রিগুণের আধার স্বয়ং ভগবান কোনো কাব্য নয়। এ সূত্র আমরা বিলেত থেকে আমদানি করেছি। The true, the good and the beautiful-এর গায়ে আমরা সংস্কৃত ছাপ মেরে তা স্বদেশী মাল বলে চালাবার চেষ্টা করছি। বলা বাহুল্য যে, এই সূত্র ধরে কোনও কাব্যের অন্তরে প্রবেশ করা যায় না, কেননা পণ্ডিতে পণ্ডিতে যত মতভেদ, যত কলহ, যত তর্ক সবই হচ্ছে ঐ তিনটি কথার অর্থ নিয়ে।

শুধু তাই নয়—এই তিনটি কথারও পরস্পরের ভিতর ঘোর জ্ঞাতি-শক্রতা বিদ্যমান। একজন যেই বলেন যে, এই সত্য, অমনি দশজনে চেঁচিয়ে ওঠেন যে, ও শিব নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখতে পাই যে, যুগে যুগে এই শিবের দোহাই দিয়ে মানুষে সত্যকে পরাভূত করতে চেষ্টা করেছে। সুন্দর বেচারির ত কথাই নেই, শিব ত তার উপর চিরদিনই খড়্গহস্ত। কমলাকান্ত বলেছেন যে, কোকিল সুন্দরের সাক্ষাৎ পেলে অমনি বলে ওঠে কু-উ। এবং তিনি এই বাচাল পক্ষীকে সম্বোধন করে বলেছেন যে—

"যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্পস্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল, তখনই ডাকিয়া বলিও কু-উ।"

একালের সমালোচকেরা যে কমলাকান্তের উপদেশ অনুসারে চলেন তার প্রমাণ এই যে, যেই কেউ বলেন, অমুক কাব্যে সৌন্দর্য্য আছে অমনি সাহিত্যশাসকেরা তর্জ্জন গর্জ্জন করে ওঠেন যে তাতে বস্তুতন্ত্রতা নেই অর্থাৎ সত্য নেই এবং তাতে জাতীয়তা নেই অর্থাৎ শিব নেই। এই সমালোচকদের বৃদ্ধ শিব বহুকাল ইংরাজি-সাহিত্যের উপর উপদ্রব করে—সম্প্রতি সে দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যের স্কন্ধে ভর করেছে। এঁরা ভুলে যান যে আমাদের কাব্য—জাতীয় কি বিজাতীয় তার বিচারক বিদেশীয়েরা। বস্তুর রূপ সমাজের দিক থেকে অর্থাৎ জীবনের দিক থেকে দেখলে একরকম দেখায় —আর কাব্যের দিক থেকে অর্থাৎ মনের দিক থেকে দেখলে আর-এক রকম দেখায়।

যেমন বৈজ্ঞানিকেরা এ সকল সমালোচনা উপেক্ষা করে

সত্যের আবিষ্কার করেন তেমনি শিল্পীরাও এ সকল সমালোচনা উপেক্ষা করে সুন্দরের সৃষ্টি করেন। যেমন জ্ঞানশাস্ত্রের একমাত্র জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এ তত্ত্ব সত্য কি না, তেমনি অলঙ্কারশাস্ত্রের একমাত্র জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এ রচনা সুন্দর কি না। Truth for truth এবং Art for art প্রভৃতি বাক্য যে সহজে আমাদের মনে ধরে না তার কারণ সাংসারিক জীবনযাত্রার জন্য হিতাহিতের জ্ঞানের আমাদের যেমন দৈনিক প্রয়োজন আছে সত্যের যথার্থ জ্ঞান এবং সৌন্দর্য্যের সম্যক্ অনুভূতির তাদৃশ প্রয়োজন নেই। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেও জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে যাপন করা যায় কিন্তু বাড়ির চারদিকে চোর ঘুরছে এ বিষয়ে উদাসীন থেকে এক রাতও নিশ্চিন্তে কাটাবার যো নেই। আর যা সুন্দর তা যে ঘরকন্নার কোনও কাজে লাগেনা তা সকলেই জানেন। ছবি আমরা দেয়ালেই টাঙিয়ে রাখি। Kant বলেন, সৌন্দর্য্য হচ্ছে সেই বস্তু যাতে মানুষের কোনরূপ স্বার্থ নেই। অতএব তা আত্মার অমূল্য ধন। পৃথিবীতে দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য যে জন্মগ্রহণ করছে এবং অমরতা লাভ করছে তার কারণ সংসার মানুষের সমগ্র মনটা গ্রাস করে ফেলতে পারে নি এবং পারে না। আমাদের মন যে-অংশে অসাংসারিক, সত্য এবং সুন্দর সেই-অংশেরই বিষয়। আলঙ্কারিকেরা বলেন, কাব্যের আনন্দ "বৈষয়িক আনন্দ" নয়, ও হচ্ছে "লোকোত্তরোহহ্লাদ"। যার মন যত অসাংসারিক তার মন সত্য সুন্দরের সন্ধান তত পায়। বর্ত্তমান ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক Bergson বলেন যে—

যে মন জন্মাবধি সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন সেই মাটি-থেকে-আলগা মন থেকেই দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। সামাজিক লাভ লোকসানের দিক থেকে দেখতে গেলে সাহিত্যের মূল্য যে এত বেশি তার কারণ কেবলমাত্র সাংসারিক মনের সাহায্যে সমাজের হয় ত স্থিতিরক্ষা করা যেতে পারে, কিন্তু উন্নতি সাধন করা যায় না। যে দেশে সাহিত্য নেই সে দেশে সমাজ থাক্‌তে পারে কিন্তু সভ্যতা নেই। এ সত্যের সাক্ষাৎকারের জন্য অতিদূর দ্বীপান্তরে যাবার দরকার নেই, এই ছোটনাগপুরে তা নিত্য প্রত্যক্ষ। কিন্তু মানবসমাজ একমাত্র প্রাক্তন সংস্কারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাক্‌তে পারে না। যেমন মানুষকে সামাজিক করে তোলবার জন্যে নীতিশিক্ষার দরকার, তেমনি মানুষের মনে সত্য এবং সুন্দরের জ্ঞান উদ্রেক কর্‌বার জন্যও শাস্ত্রের আবশ্যক। অলঙ্কারশাস্ত্র কাব্যসম্বন্ধে এই শিক্ষা দেবার ভার হাতে নিয়েছে। সুতরাং সংস্কৃত এবং ফরাসী অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের রূপেরই বিচার হয়ে থাকে; গুণের পৃথক বিচার হয় না; কেমনা কাব্যরাজ্যে রূপ আর গুণ একই বস্তু। এবং কাব্যের রূপের জ্ঞান লাভ কর্‌বার জন্য তার গঠনের পরিচয় নেওয়া দরকার—সে গঠন ভাবেরই বল, আর ভাষারই বল। প্রাণী ছাড়া যেমন আমরা প্রাণের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনও সন্ধান পাইনে, তেমনি সুন্দর ছাড়া আমরা সৌন্দর্য্যেরও সাক্ষাৎ পাইনে। সুতরাং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করার অর্থ আমাদের মনোভাবকে সাকার এবং সুগঠিত করা। আর্টিষ্টের নিকট সৃজনীশক্তির অর্থ কি, সে বিষয়ে বিখ্যাত ফরাসী-লেখক Roman Rolland-এর মত নিম্নে উদ্ধৃত

করে দিচ্ছি। আপনারা সকলেই জানেন যে ইনি এবার Nobel Prize লাভ করেছেন :—

The effort necessary to dominate and concentrate one's passion into a beautiful and clear form.

অলঙ্কারশাস্ত্রের এ যুগে সাহিত্য শাসন কর্‌বার সামর্থ্য নেই, কেন না এ যুগে সাহিত্যের বিচারালয় দেওয়ানি আদালত—ফৌজদারি নয়। বর্ত্তমানে অলঙ্কারের আইন—সাহিত্যের কার্য্যবিধি আইন,—দণ্ডবিধি আইন নয়। যদি আজকের দিনে অলঙ্কারের কোনও সার্থকতা থাকে ত সে এই কারণে, যে এ শাস্ত্র পাঠকদের কাব্যের beautiful and clear form চিন্‌তে এবং লেখকদের passion dominate and concentrate কর্‌তে কিঞ্চিৎ সাহায্য কর্‌তে পারে।

সুতরাং বঙ্গসাহিত্যে যে অলঙ্কারের সূত্রপাত হয়েছে এ আমি সাহিত্যের সুলক্ষণ মনে করি। এ সব আলোচনার ফলে, আমরা কাব্য রচনা কর্‌তে শিখি আর না শিখি, এই আত্মসংযমটুকু শিক্ষা কর্‌ব যে, আমরা কামারের দোকানে আর দইয়ের ফরমায়েস দেব না—যদিচ Metchnikoff-এর প্রসাদে আমরা সকলেই জানি যে দইয়ের মত স্বাস্থ্যকর পদার্থ এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

আমাদের এ ভয় পাবার দরকার নেই যে সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করাতে কাব্য সত্য এবং শিবভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। সাহিত্যের ইতিহাস এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাব্যমাত্রই মানবপ্রকৃতির সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অতএব তা অশিব নয়। পৃথিবীতে মিথ্যাই হচ্ছে একমাত্র অমঙ্গলকর বস্তু। নানাপ্রকার

সামাজিক মতামত কালের প্রবাহে কিছুদিনের জন্য উপরে ভেসে উঠবে এবং সে দিনের আলোয় চিকমিক করবে—তার পর চিরদিনের মত বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে। কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা, দান্তের Divina Comedia, Shakespeare-এর Hamlet এবং Goethe-র Faust আবহমান কাল দাঁড়িয়ে থাকবে—কেন না এ সকল কাব্য সত্যের অটলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সৌন্দর্য্যের অক্ষয় আলোকে মণ্ডিত।

সুতরাং বাঙ্গলার উদীয়মান আলঙ্কারিকদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন এ সত্য বিস্মৃত না হন, যে অলঙ্কার কাব্যের পিঠ-পিঠ আসে এবং উভয়ের ভিতর পিঠে পিঠে ভাইয়ের সম্বন্ধ থাকলেও অলঙ্কার কনিষ্ঠ এবং কাব্য জ্যেষ্ঠ। সাহিত্যের কোন কোন অবস্থায় অলঙ্কার জ্যেষ্ঠের পদবী গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও জ্যেষ্ঠতাত হয়ে উঠবার অধিকারে সে একেবারেই বঞ্চিত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

রাঁচি

১৯শে নভেম্বর ১৯১৫।

টীকাটিপ্পনি

লেখার উদ্দেশ্য

আমি যা লিখে থাকি তা অনেকের ভালো লাগে না। এই কথাটি আমাকে সাধারণত যে ভাষায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা হয় নানা স্বাভাবিক কারণে সে ভাষায় আমার দখল নেই। এইজন্য যথারীতি তার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য।

এমন অবস্থায় হঠাৎ একখানি চিঠি পেলুম, সেই চিঠিতে অভিযোগ আছে কিন্তু অবমাননা নেই। চিঠিখানি কোনো মহিলার লেখা, তিনি আমার অপরিচিত। এই চিঠিতে তাঁর স্ত্রীজনোচিত সংযম ও সৌজন্য এবং মাতৃজনোচিত করুণা প্রকাশ পাচ্চে। তিনি দুঃখ বোধ করেচেন, কিন্তু দুঃখ দিতে চান নি।

তিনি নিজের কোনো ঠিকানা দেন নি, অথচ কয়েকটি প্রশ্ন করেচেন—এর থেকেই অনুমান করচি যে এই প্রশ্ন তিনি সাধারণের হ'য়ে পাঠিয়েছেন এবং সাধারণের ঠিকানাতেই এর জবাব চান।

অতএব তাঁর ভর্ৎসনার উত্তরে যে ক'টি কথা বলবার আছে সে আমি এই "সবুজপত্র" যোগে তাঁর কাছে সবিনয়ে নিবেদন করি। এই উপলক্ষ্যে সাধারণত আমাদের দেশে যেভাবে সাহিত্য বিচার হয়ে থাকে প্রসঙ্গত সে সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করব।

প্রথমত তিনি কিছু ক্ষোভের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করেচেন—"ঘরে-বাইরে" উপন্যাসখানি লেখবার উদ্দেশ্য কি?

এর সত্য উত্তরটি এই যে, উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্যই উপন্যাস লেখা। সাদা কথায়, গল্প লিখ্‌ব আমার খুসি!

কিন্তু এ'কে উদ্দেশ্য বলা যায় না। কেননা "খুসি" বলাই উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা। এবং যখন কোনো একটা উদ্দেশ্যই লোকে প্রত্যাশা করচে তখন সেটা নেই বল্লেই কথাটা স্পর্দ্ধার মত শুনতে হয়।

কিন্তু অনেক সময় উদ্দেশ্য বাইরে থেকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। হরিণের গায়ে চিহ্ন আছে কেন হরিণ তা জানেনা, কিন্তু হরিণ সম্বন্ধে যাঁরা বই লেখেন তাঁরা বলেন, এর উদ্দেশ্য হচ্চে এই সমস্ত চিহ্নের দ্বারা বনের আলো ছায়ার সঙ্গে সে বেমালুম মিশিয়ে থাকতে পারবে।

এই আন্দাজ সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্যটা যে হরিণের মনের নয় সে কথা সকলকেই মানতে হবে।

উদ্দেশ্য হরিণের নয় কিন্তু হরিণের ভিতর দিয়ে বিশ্বকর্ম্মার একটা উদ্দেশ্য ত প্রকাশ পাচ্চে! তা হয় ত পাচ্চে। তেমনি যেকালে লেখক জন্মগ্রহণ করেচে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয় ত আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেচে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি, এ কথা বলা চলে, যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করচে।

আমি বলচি এ কাজও শিল্পকাজ;—শিক্ষাদানের কাজ নয়। কাল আমাদের মনের মধ্যে তার নানা রঙের সুতোয় জাল বুনচে, সেই তার সৃষ্টি,—আমি তার থেকে যদি কিছু আদায় করতে চাই তবে সে উদ্দেশ্য আমারি।

আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যে সব রেখাপাত করেচে, "ঘরে-বাইরে" গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়চে। কিন্তু এই ছাপার কাজ শিল্পকাজ। এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়।

পৃথিবীর খুব একজন বড় লেখকের লেখা সাম্‌নে ধরা যাক্‌। শেক্‌স্‌পিয়রের ওথেলো। কবিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাঁর উদ্দেশ্য কি, তিনি মুস্কিলে পড়বেন। ভেবে চিন্তে যদি বা কোনো উত্তর দেন নিশ্চয়ই সেটা ভুল উত্তর হবে।

আমি যদি ব্রাহ্মণ-সভার সভ্য হই তবে আমি ঠিক করব কবির উদ্দেশ্য বর্ণভেদ বাঁচিয়ে চলা সম্বন্ধে জগৎকে সদুপদেশ দেওয়া। যদি স্বাধীন জেনেনার বিরুদ্ধপক্ষ হই তাহলে বল্‌ব, পরপুরুষের মুখদর্শন পরিহার করতে বলাই কবির পরামর্শ।

কিম্বা কবির বুদ্ধি বা ধর্ম্মজ্ঞানের প্রতি যদি আমার সন্দেহ থাকে তা হলে বল্‌ব, একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের নিদারুণ পরিণাম দেখিয়ে তিনি সতীত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেচেন। কিম্বা ইয়াগোর চাতুরীকেই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী করে তুলে সরলতার প্রতি নিষ্ঠুর বিদ্রূপ প্রকাশ করাই তাঁর মৎলব।

কিন্তু সোজা কথা হচ্চে তিনি নাটক লিখেচেন। সেই নাটকে কবির ভালো লাগা মন্দ লাগা, এমন কি, কবির দেশ কালও প্রকাশ পায় কিন্তু সেটা তত্ত্ব বা উপদেশরূপে নয়, শিল্পরূপেই। অর্থাৎ সমস্ত নাটকের অবিচ্ছিন্ন প্রাণ এবং লাবণ্যরূপে। যেমন একজন বাঙালীকে যখন দেখি তখন মানুষটার সঙ্গে তার জাতিকে আর

বাপদাদাকে সম্মিলিত করে দেখি; তার ব্যক্তি এবং তার জাতি দুইয়ের মাঝখানে কোনো জোড়ের চিহ্ন থাকে না; এও তেমনি। কবির কাব্যে স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আর তার দেশকালের সঙ্গে একটা প্রাণগত সম্মিলন আছে।

তাই বল্‌ছিলুম, "ঘরে-বাইরে" গল্প যখন লেখা যাচ্চে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েচে এবং লেখকের ভালোমন্দ লাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্চে কিন্তু সেই রঙীন্ সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের। সৌখীন লোকে চমরীর পুচ্ছ থেকে চামর তৈরী করে—কিন্তু চমরী জানে তার পুচ্ছটা তার প্রাণের অন্তর্গত—ওটাকে কেটে নিয়ে চামর করা অন্তত তার উদ্দেশ্য নয়, যে করে তারই।

গল্পের মত

তার পরে কথা হচ্চে, আমার হৃদয়ভাবের সঙ্গে পাঠকের হৃদয়-ভাবের যখন বিরোধ ঘটল তখন পাঠক আমাকে দণ্ড দিতে বাধ্য।

মাটির উপর পড়ে গেলে শিশু যেমন মাটিকে মারে তেম্নি এমন স্থলে সাধারণ পাঠকে দণ্ড দিয়ে থাকে একথা আমার বিশেষ-রূপ জানা। তাই বলে' দণ্ড যে দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। ভূতকে না ভয় করতে পারি, এমন কি, ভূতের ভয় অনিষ্ট-কর মনে করতেও পারি তবু ভূতের ভয়ের গল্প পড়বার সময়ে সে কথা মনে রাখবার দরকার নেই। এখানে মতামতের কথা নয়, রসের অনুভূতির কথা। খৃষ্টান রসিক যখন কোনো হিন্দু আর্টিষ্টের

আঁকা দেবীমূর্ত্তির বিচার করেন, তখন যদি তিনি ভুলতে পারেন যে তিনি মিসনারী তা হলেই ভালো, যদি না পারেন তবে সে জন্যে হিন্দু আর্টিষ্টকে দোষ দেওয়া চলবে না। কারণ হিন্দু আর্টিষ্ট-স্বভাবতই আপন মত বিশ্বাস সংস্কার অনুসারে ছবি আঁকবেই; কিন্তু যে হেতু সেটা ছবি সেই জন্যেই তার মধ্যে মত বিশ্বাস সংস্কারের অতীত একটি জিনিষ থাকবে,—সেটি হচ্চে রস; সে রস যদি অহিন্দুর অগ্রাহ্য হয় তবে, হয়, রসবোধের অভাবে সেটা অহিন্দুর দোষ, নয় রসের অভাবে সেটা হিন্দু আর্টিষ্টের দোষ। কিন্তু দোষটা মত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। প্রদীপ ইংরেজের এক রকম, এবং ডীট্‌জ্‌লণ্ঠন চলিত হবার পূর্ব্বে হিন্দুর অন্যরকম ছিল, তবু আলো জিনিষটা আলোই।

দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে আমার সঙ্গে পাঠকের মতভেদ থাকা সম্ভব—কিন্তু গল্পকে মত বলে দেখবার ত দরকার নেই—গল্প বলেই দেখতে হবে।

গল্পের খাতির

কিন্তু মত যখন এমন বিষয় নিয়ে যেটা দেশের একেবারে মর্ম্মের কথা তখন পাঠকের কাছ থেকেও অতটা বেশি নিরাসক্ত রসানুভূতি দাবী করা যায় না। তখন পাঠকের নিজের ব্যথা গল্পের ব্যথাকে ছাড়িয়ে ওঠে। অতএব সে জায়গায় রসের বিচারের চেয়ে রসের বিষয়বিচারটা স্বভাবতই বড় না হয়ে থাকতে পারে না।

আচ্ছা বেশ, তাই মানলুম। তাহলে এস্থলে লেখকের প্রতি উপদেশটা কি? নিজে যেটাকে ভালো মনে করি পাঠকের

খাতিরে চেষ্টা করব সেটাকে মন্দ মনে করতে? পাঠক যদি গল্পের খাতিরে সে কাজ করতে না পারেন তাহলে লেখকই বা পাঠকের খাতিরে এমন কাজ কি করে করবেন?

বস্তুত খাতিরটা গল্পের, লেখকেরও নয় পাঠকেরও নয়। সেই গল্পের খাতিরেই নিজের হৃদয়ভাব-সম্বন্ধে লেখককে নিজের হৃদয় অনুসরণ করতে হবেই এবং সেই গল্পের খাতিরেই পাঠককে গল্পের রস অনুসরণ করতে হবে।

যদি বলা যায় গল্পের খাতিরের চেয়ে দেশের খাতির বড়, তবে সে কথা পাঠক সম্বন্ধেও যেমন খাটে লেখক সম্বন্ধেও তেমনি। তাঁর সাময়িক একদল পাঠক তাঁকে বাহবা দেবে এ কথা লেখকের ভাববার নয়, তিনি ভাববেন তাঁর গল্পটি ঠিক মত হওয়া চাই; তাও যদি তাঁকে ভাবতে দেওয়া না যায় তবে দেশের ভালো হয় এই কথাই যেন তিনি ভাবেন, দেশ তাঁকে ভালো বলে এ কথা নয়।

আখ্যায়িকা

লেখিকার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এই উপন্যাসের আখ্যায়িকা কি আমার কল্পনাপ্রসূত, না বাস্তবে কোথাও তার আভাস পাওয়া গেছে। যদি পেয়ে থাকি তবে সে কি আধুনিক "পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বিলাসী সম্প্রদায়ে না প্রাচীন হিন্দু পরিবারে?"

উত্তর এই—আখ্যায়িকাটি অধিকাংশ গল্পের আখ্যায়িকার মতই আমার কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু এইটুকু মাত্র বল্‌লেই লেখিকার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া হয় না। ঐ প্রশ্নের মধ্যে একটি কথা চাপা আছে, যে, এমন ঘটনা প্রাচীন হিন্দু পরিবারে অসম্ভব।

ঠিক একটা গল্পের ঘটনা সেই গল্পের অনুরূপ অবস্থার মধ্যেই ঘটতে পারে আর কোথাও ঘটতে পারে না—প্রাচীন বা নবীন, হিন্দু বা অহিন্দু কোনো পরিবারেই না। অতএব কোনো বিশেষ পরিবারে কি ঘটেচে সে কথা স্মরণ করে গুজব করাই চলে গল্প লেখা চলে না। মানবচরিত্রে যে সমস্ত সম্ভবপরতা আছে সেই গুলিকেই ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে গল্পে নাটকে বিচিত্র করে তোলা হয়। মানবচরিত্রের মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে কিন্তু ঘটনার মধ্যে নেই। ঘটনা নানা আকারে নানা জায়গায় ঘটে, একই ঘটনা দুইজায়গায় ঠিক একই রকম ঘটে না। কিন্তু তার মূলে যে মানবচরিত্র আছে সে চিরকালই নিজেকে প্রকাশ করে এসেচে। এইজন্য সেই মানবচরিত্রের প্রতিই লেখক দৃষ্টি রাখেন, কোনো ঘটনার নকল করার প্রতি নয়।

সাহিত্য-বিচার

তাহলে প্রশ্ন এই যে, প্রাচীন হিন্দু পরিবারে সর্ব্বত্রই মানবচরিত্র কি মনুসংহিতার রাশ মেনে চলে? কখনো লাগাম ছিঁড়ে খানার মধ্যে গিয়ে পড়ে না?

আমরা বৈদিক পৌরাণিক কাল থেকে এইটেই দেখে আসচি যে, বুনো ওলের সঙ্গে বাঘা তেঁতুলের লড়াইয়ের অন্ত নেই। একদিকে শাসনও কড়া, অন্যদিকে মানবের প্রকৃতিও উদ্দাম, তাই কখনো শাসন জেতে, কখনো প্রকৃতি। এই লড়াই যদি প্রাচীন হিন্দুপরিবারে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয় তবে সেই প্রাচীন হিন্দুপরিবারের ঠিকানা এখনো পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া একথাও মনে রাখা

আবশ্যক যেখানে মন্দ একেবারেই নেই সেখানে ভালোও নেই। প্রাচীন হিন্দুপরিবারে কারো পক্ষে মন্দ হওয়া যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে সে পরিবারের লোক ভালোও নয়, মন্দও নয়, তারা সংহিতার কলের পুতুল। ভালোমন্দর দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে মানুষ ভালোকে বেছে নেবে বিবেকের দ্বারা, প্রথার দ্বারা নয়, এই হচ্চে মনুষ্যত্ব।

প্রাচীন সংস্কৃত উদ্ভট কবিতায় যে সকল কুৎসিত স্ত্রীনিন্দা দেখতে পাই বর্ত্তমান কোনো পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর লেখায় তার আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। তার কারণ আধুনিক কবিরা স্ত্রীজাতিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে থাকেন। এ কথা নিশ্চিত সত্য, যে, সেই সকল প্রাচীন স্ত্রীনিন্দাগুলি স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মিথ্যা কিন্তু যদি স্ত্রীবিশেষ সম্বন্ধেও মিথ্যা হয় তবে সেই কবিতাগুলির উদ্ভব হল কোথা হতে?

তাহলে বোধ হয় তর্কটা এই রকম দাঁড়াবে,—মানবপ্রকৃতির মধ্যে নিয়মলঙ্ঘন করবার একটা বেগ আছে কিন্তু সেটা কি সাহিত্যে বর্ণনা করবার বিষয়? এ তর্কের উত্তর আবহমান কালের সমস্ত সাহিত্যই দিচ্চে, অতএব আমি নিরুত্তর থাক্‌লেও ক্ষতি হবে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অধিকাংশ সমালোচকের হাতে সাহিত্যবিচার স্মৃতিশাস্ত্রবিচারের অঙ্গ হয়ে উঠেচে। বঙ্কিমের কোন্ নায়িকা "হিন্দুরমণী" হিসাবে কতটা উৎকর্ষ প্রকাশ করেচে তাই নিয়ে সমালোচক-মহলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ চলে থাকে। ভ্রমর তার স্বামীর প্রতি অভিমান করেছিল সেটাতে তার হিন্দু

সতীত্বে কতটা খাদ ধরা পড়েচে, সূর্য্যমুখী স্বামীর প্রেয়সী সতীনকে নিজেরও প্রেয়সী করতে না পারাতে তার হিন্দুরমণীত্বের কতটা লাঘব হয়েচে, শকুন্তলা কি আশ্চর্য্য হিন্দুনারী, দুষ্যন্ত কি আশ্চর্য্য হিন্দুরাজা, এই সকল বিচারপ্রহসন আমাদের দেশে সাহিত্য-বিচারের নাম ধরে নিজের গাম্ভীর্য্য বাঁচিয়ে চল্‌তে পারে—জগতে আর কোথাও এমন দেখা যায় না। শেক্‌স্‌পিয়র্ অনেক নায়িকার সৃষ্টি করেচেন কিন্তু তাদের মধ্যে ইংরেজ-রমণীত্ব কতটা প্রকট হয়েচে এ নিয়ে কেউ চিন্তা করে না, এমন কি, তাদের খৃষ্টানীর মাত্রা নিক্তির ওজনে পরিমাপ করে পয়লা দোসরা মার্কা দেওয়া খৃষ্টান পাদ্রিদের দ্বারাও ঘটা সম্ভব নয়।

আমি হয় ত এ কথা বলে ভালো করলুম না। কেন না, জগতে যা কোথাও নেই সেইটেই ভারতে আছে এই হচ্চে আধুনিক বাঙালীর গর্ব্ব। কিন্তু ভারত ত বাঙালীর সৃষ্টি নয়, আমরা সাহিত্য-সমালোচনা সুরু করবার পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ ছিল। সেই ভারতের অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়িকাবিচার মনুপরাশরের সঙ্গে মিলিয়ে করা হয় নি, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য অনুসারেই তাদের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা হয়েছিল। আমি এ রকম শ্রেণীবিভাগ ভালো বলিনে; কারণ সাহিত্য ত বিজ্ঞান নয়; সাহিত্যে শ্রেণীর ছাঁচে নায়ক নায়িকার ঢালাই হতে থাক্‌লে সেটা পুতুলের রাজ্য হয়, প্রাণের রাজ্য হয় না। তবু যদি নিতান্তই শ্রেণীবিভাগের সখ সাহিত্যেও মেটাতে হয় তাহলে ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট হিন্দু ও অহিন্দু এই দুই শ্রেণী না ধরে যথাসম্ভব মানবস্বভাবের বৈচিত্র্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা কর্ত্তব্য।

স্বদেশ প্রেম

লেখিকার কাছে আমার শেষ নিবেদন এই যে, গল্পের ভিতর থেকে গল্পের চেয়ে বেশি কিছু যদি আদায় করতেই হয় তাহলে অন্তত গল্পের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর একটি কথা এই যে, আমিও দেশকে ভালোবাসি, তা যদি না হত তাহলে দেশের লোকের কাছে লোকপ্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত না। সত্য প্রেমের পথ আরামের নয়, সে পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নেই এবং সকলের ভাগ্যেও ফলে না কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি তা হলে মনে এই সান্ত্বনা থাক্‌বে যে কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করি নি। দুঃখ পাই তাতে দুঃখ নেই কিন্তু আমার সকলের চেয়ে বেদনার বিষয় এই যে, যা সত্য মনে করি তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে লেখিকার মত অনেক সরল, শ্রদ্ধাবান, স্বদেশবৎসল ও সকরুণ হৃদয়ে বেদনা দিয়েছি; সে আমার দুর্ভাগ্য কিন্তু সে আমার অপরাধ নয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র

শিক্ষার বাহন

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সেদিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষীকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না এ সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে বেহারা বসিয়া বসিয়া পাখা টানিবে তার পক্ষে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি কাজের, যে গোরু ঘানি ঠেলিবে তার পক্ষে খোলা আকাশের চেয়ে চোখের ঠুলিই বড় সহায় একথা সহজেই মনে আসে। যে দেশে একই চক্রে ঘানি ঠেলাটা সব চেয়ে বড় কাজ সে দেশের বিজ্ঞলোকেরা আলোটাকে শত্রু মনে করিতে পারেন।

কিন্তু দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড় করিয়া দেখিতে পারি, সে হচ্চে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরো বড় কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ঐক্য। বাংলা দেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়—সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্ কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সঙ্কীর্ণ, যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাবিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। নদী দেশের একধার দিয়া চলে, বৃষ্টি আকাশ জুড়িয়া হয়। তাই ফসলের সব চেয়ে বড় বন্ধু বৃষ্টি, নদী তার অনেক নীচে; শুধু তাই নয়, এই বৃষ্টিধারার উপরেই নদীজলের গভীরতা, বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমাদের দেশে যাঁরা বজ্রহাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন, তাঁদের সহস্রচক্ষু, কিন্তু বিদ্যার এই বর্ষণের বেলায় অন্তত তার

৯১০টা চক্ষু নিদ্রা দেয়। গর্জ্জনের বেলায় অট্টহাস্যের বিদ্যুৎ বিকাশ করিয়া বলেন, বাবুগুলার বিদ্যা একটা অদ্ভুত জিনিষ,—তার খোসার কাছে তলতল্ করে তার আঁঠির কাছে পাক ধরে না। যেন এটা বাবুসম্প্রদায়ের প্রকৃতিগত। কিন্তু বাবুদের বিদ্যা-টাকে যে প্রণালীতে জাগ দেওয়া হয় সেই প্রাণালীতেই আমাদের উপরওয়ালাদের বিদ্যাটাকেও যদি পাকানোর চেষ্টা করা যাইত তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ হইত যে, যে-বিদ্যার উপরে ব্যাপক শিক্ষার সূর্য্যালোকের তা লাগে না তার এম্‌নি দশাই হয়।

জবাবে কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম যখন পশ্চিমেই ছিল পূর্ব্ব-দেশের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে নাই তখন তোমাদের টোলে চতুষ্পাঠীতে যে তর্কশাস্ত্রের প্যাঁচ কষা এবং ব্যাকরণ সূত্রের জাল বোনা চলিত সেও ত অত্যন্ত কুণোরকমের বিদ্যা। একথা মানি, কিন্তু বিদ্যার যে অংশটা নির্জ্জলা পাণ্ডিত্য সে অংশ সকল দেশেই পঙ্গু এবং কুণো; পশ্চিমেও পেডাণ্ট্রি মরিতে চায় না। তবে কিনা যে দেশ দুর্গতিগ্রস্ত সেখানে বিদ্যার বল কমিয়া গিয়া বিদ্যার কায়দা-টাই বড় হইয়া ওঠে। তবু একথা মানিতে হইবে তখনকার দিনের পাণ্ডিত্যটাই তর্কচুঞ্চু ও ন্যায়পঞ্চাননদের মগজের কোণে কোণে বদ্ধ ছিল বটে কিন্তু তখনকার কালের বিদ্যাটা সমাজের নাড়ীতে নাড়ীতে সজীব ও সবল হইয়া বহিত। কি গ্রামের নিরক্ষর চাষী, কি অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক সকলেরই মন নানা উপায়ে এই বিদ্যার সেঁচ পাইত। সুতরাং এ জিনিষের মধ্যে অন্য অভাব অসম্পূর্ণতা যাই থাক্ ইহা নিজের মধ্যে সুসঙ্গত ছিল।

কিন্তু আমাদের বিলাতী বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিষ হইয়া

সাইন্‌বোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিষ আছে তার অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই আছে; সে কি-*চিন্তায়, কি-কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।*

আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিষটা বিদেশী। একথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফী নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয় একথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই—তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্ব্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখ্‌লে এই লইয়া লড়িয়া ছিলেন। শুনিয়াছি দেশের মধ্যে বাংলা দেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলা দেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলা দেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের

দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উল্টা দিকে গজাইবে।

যে সর্ব্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর-এক উপসর্গ জুটিয়াছে। একদিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্যদিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সঙ্কীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরো সঙ্কীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সেদিকে কড়া দৃষ্টি।

কাগজে দেখিলাম সেদিন বেহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিৎ গাড়িতে গিয়া ছোটলাট বলিয়াছেন, যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব্ব করি তারা অবুঝ, কেননা, শিক্ষা ত কেবল জ্ঞান লাভ নয়, ভালো ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করাও একটা শিক্ষা;—ক্লাসে বড় অধ্যাপকের চেয়ে বড় দেয়ালটা বেশি বই কম দরকারী নয়।

মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি কিন্তু গরীবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবী করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরীবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরী করার মত হইবে।

আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া আমরা আসর জমাইতে পারি, কলা

পাতায় আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্য যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই খোড়ো ঘরে মানুষ,—এদেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে এ কথা আমাদের কাছে চলিবে না।

পূর্ব্বদেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে বসনে যতদূর পারি বস্তুভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখানকার জল-হাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদের হাতে খড়ি দিয়াছে। ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে তত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালের ফাঁক; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতীর তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্য্যকিরণেই বোনা হইতেছে; আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপ সঞ্চারের জন্য তার অনেকটার বরাৎ পাকশালার ও পাক-যন্ত্রের পরে নয়, দেবতার পরে। দেশের প্রাকৃতিক এই সুযোগ জীবনযাত্রায় খাটাইয়া আমাদের স্বভাবটা এক রকম দাঁড়াইয়া গেছে—শিক্ষাব্যবস্থায় সেই স্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন ত আমার মনে হয় না।

গাছতলায় মাঠের মধ্যে আমার এক বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়টি তপোবনের শকুন্তলারই মত—অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়-মলূনং কররুহৈঃ—অবশ্য ইন্‌স্পেক্টরের কররুহ। মৈত্রেয়ী যেমন যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন তিনি উপকরণ চান না, অমৃতকে চান,—এই বিদ্যালয়ের হইয়া আমার সেই কামনা ছিল। এইখানে ছোট লাটের সঙ্গে একটা খুব গোড়ার কথায় আমাদের হয় ত অমিল আছে—এবং এইখানটায় আমরাও তাঁকে উপদেশ দিবার অধিকার

রাখি। সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যায়—উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্ব্বল।

দৈন্য জিনিষটাকে আমি বড় বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। সেই ভাবের অভাব আছে বলিয়া যে-সব জিনিষ প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা দুর্ম্মূল্য ও দুর্ভর হইতেছে; গান বাজনা, আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদ, শিক্ষা দীক্ষা, রাজ্যশাসন, আইন আদালত সভ্য দেশে সমস্তই অতি জটিল, সমস্তই মানুষের বাহিরের ও ভিতরের প্রভূত জায়গা জুড়িয়া বসে। এই বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক—এই বিপুল ভার বহনে মানুষের জোর প্রকাশ পায় বটে, ক্ষমতা প্রকাশ পায় না,—এইজন্য বর্ত্তমান সভ্যতাকে যে-দেবতা বাহির হইতে দেখিতেছেন তিনি দেখিতেছেন ইহা অপটু দৈত্যের সাঁতার-দেওয়ার মত, তার হাত পা ছোঁড়ায় জল ঘুলাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে;—সে জানেও না এত বেশি হাঁসফাঁস করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুস্কিল এই যে দৈত্যটার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রচণ্ড জোরে হাত পা ছোঁড়াটারই একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেদিন পূর্ণতার সরল সত্য সভ্যতার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হইবে সেদিন পাশ্চাত্য বৈঠকখানার দেয়াল হইতে জাপানী পাখা,

চীনাবাসন, হরিণের শিং, বাঘের চামড়া,—তার এ কোণ ও কোণ হইতে বিচিত্র নিরর্থকতা দুঃস্বপ্নের মত ছুটিয়া যাইবে; মেয়েদের মাথার টুপিগুলা হইতে মরা পাখী, পাখীর পালক, নকল ফুল পাতা এবং রাশিরাশি অদ্ভুত জঞ্জাল খসিয়া পড়িবে; তাদের সাজসজ্জার অমিতাচার বর্ব্বরতার পুরাতত্ত্বে স্থান পাইবে, যে-সব পাঁচতলা দশতলা বাড়ি আকাশের আলোর দিকে ঘুসি তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তারা লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে; শিক্ষা বল, কর্ম্ম বল, ভোগ বল, সহজ হইয়া ওঠাকেই আপনার শক্তির সত্য পরিচয় বলিয়া গণ্য করিবে; এবং মানুষের অন্তরপ্রকৃতি বাহিরের দাসরাজাদের রাজত্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পায়ের তলায় বসাইয়া রাখিবে। একদিন পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও বলিতে হইবে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

সে কবে হইবে ঠিক জানি না। ততদিন ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগকে উপদেশ শুনিতে হইবে যে, প্রভূত আসবাবের মধ্যে বড় বাড়ির উচ্চতলায় বসিয়া শিক্ষাই উচ্চশিক্ষা। কারণ মাটির তলাটাই মানুষের প্রাইমারি, ঐটেই প্রাথমিক; ইঁটের কোটা যত বড় হাঁ করিয়া হাই তুলিবে বিদ্যা ততই উপরে উঠিতে থাকিবে।

একদা বন্ধুরা আমার সেই মেঠো বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা কলেজ জুড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন আমাদের দেশের যে উচ্চশিক্ষা তরুতলকে অশ্রদ্ধা করে নাই আজ তাকে তৃণাসন দেখাইলে সে কি সহিতে পারিবে? সে যে ধনী পশ্চিমের পোষ্যপুত্র, বিলিতি বাপের কায়দায় সে বাপকেও ছাড়াইয়া চলিতে

চায়। যতই বলি না কেন, শিক্ষাটাকে যতদূর পারি উচ্চেই রাখিব কায়দাটাকে আমাদের মত করিতে দাও—সে কথায় কেহ কান দেয় না। বলে কি না, ঐ কায়দাটাই ত শিক্ষা, তাই তোমাদের ভালোর জন্যই ঐ কায়দাটাকে যথাসাধ্য দুঃসাধ্য করিয়া তুলিব। কাজেই আমাকে বলিতে হইল, অন্তঃকরণকেই আমি বড় বলিয়া মানি, উপকরণকে তার চেয়েও বড় বলিয়া মানিব না।

উপকরণ যে অংশে অন্তঃকরণের অনুচর সে অংশে তাকে অমান্য করা দীনতা একথা জানি। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যটাকে য়ুরোপ এখনো বাহির করিতে পারে নাই; বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের নিজের মতে আমাদিগকেও সেই চেষ্টা করিতে কেন পাকা নিয়ম করিয়া বাধা দেওয়া হইবে? প্রয়োজনকে খর্ব্ব না করিয়াও সমস্তটাকে সাদাসিধা করিয়া তুলিব সে আমাদের নিজের স্বভাব ও নিজের গরজ অনুসারে। শিক্ষার বিষয়কে আমরা অন্য জায়গা হইতে লইতে পারি কিন্তু মেজাজটাকে সুদ্ধ লইতে হইবে সে যে বিষম জুলুম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পশ্চিমের পোষ্যপুত্র তার বিলিতি বাপকেও ছাড়াইয়া চলে। আমেরিকায় দেখিলাম, ষ্টেটের সাহায্যে কত বড় বড় বিদ্যালয় চলিতেছে যেখানে ছাত্রদের বেতন নাই বলিলেই হয়। য়ুরোপেও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সুলভ শিক্ষার উপায় অনেক আছে। কেবল গরীব বলিয়াই আমাদের দেশের শিক্ষা আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশি দুর্ম্মূল্য হইল? অথচ এই ভারতবর্ষেই একদিন বিদ্যা টাকা লইয়া বেচা কেনা হইত না।

দেশকে শিক্ষা দেওয়া ষ্টেটের গরজ ইহা ত অন্যত্র দেখিয়াছি। এই জন্য য়ুরোপে জাপানে আমেরিকায় শিক্ষায় কৃপণতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের গরীব দেশেই শিক্ষাকে দুর্ম্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তোলাতেই দেশের বিশেষ মঙ্গল—এ কথা উচ্চাসনে বসিয়া যত উচ্চস্বরে বলা হইবে বেসুর ততই উচ্চ সপ্তকে উঠিবে। মাতার স্তন্যকে দুর্ম্মূল্য করিয়া তোলাই উচিত, এমন কথা যদি স্বয়ং লর্ড কার্জ্জন্‌ও শপথ করিয়া বলিতেন তবু আমরা বিশ্বাস করিতাম না যে শিশুর প্রতি করুণায় রাত্রে তাঁর ঘুম হয় না।

বয়স বাড়িতে বাড়িতে শিশুর ওজন বাড়িবে এই ত স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সমান থাকিলেও ভালো নয়, কমিতে থাকিলে ভাবনার কথা। তেমনি, আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষার অধিকাংশ জমিই পতিত আছে সেখানে বছরে বছরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে হিতৈষীরা এই প্রত্যাশা করে। সমান থাকিলে সেটা দোষের, আর সংখ্যা যদি কমে ত বুঝিব, পাল্লাটা মরণের দিকে ঝুঁকিয়াছে। বাংলা দেশে ছাত্রসংখ্যা কমিল। সে জন্যে শিক্ষাবিভাগে উদ্বেগ নাই। এই উপলক্ষ্যে একটি ইংরেজি কাগজে লিখিয়াছে,—এই ত দেখি লেখাপড়ায় বাঙালীর সখ আপনিই কমিয়াছে—যদি গোখ্‌লের অবশ্যশিক্ষা এখানে চলিত তবে ত অনিচ্ছুকের পরে জুলুম করাই হইত।

এ সব কথা নির্ম্মমের কথা। নিজের জাতের সম্বন্ধে এমন কথা কেহ এমন অনায়াসে বলিতে পারে না। আজ ইংলণ্ডে যদি দেখা যাইত লোকের মনে শিক্ষার সখ আপনিই কমিয়া

আসিতেছে তবে নিশ্চয়ই এই সব লোকই উৎকণ্ঠিত হইয়া লিখিত যে কৃত্রিম উপায়েও শিক্ষার উত্তেজনা বাড়াইয়া তোলা উচিত।

নিজের জাতির পরে যে-দরদ বাঙালীর পরেও ইংরেজের সেই দরদ হইবে এমন আশা করিতেও লজ্জা বোধ করি। কিন্তু জাতিপ্রেমের সমস্ত দাবী মিটাইয়াও মনুষ্যপ্রেমের হিসাবে কিছু প্রাপ্য বাকি থাকে। ধর্ম্মবুদ্ধির বর্ত্তমান অবস্থায় স্বজাতির জন্য প্রতাপ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি অনেক দুর্লভ জিনিষ অন্যকে বঞ্চিত করিয়াও লোকে কামনা করে কিন্তু এখনো এমন কিছু আছে যা খুব কম করিয়াও সকল মানুষেরই জন্য কামনা করা যায়। আমরা কোনো দেশের সম্বন্ধেই এমন কথা বলিতে পারি না যে, সেখানকার স্বাস্থ্য যখন আপনিই কমিয়া আসিতেছে তখন সে দেশের জন্য ডাক্তার খরচটা বাদ দিয়া অন্ত্যেষ্টি সৎকারেরই আয়োজনটা পাকা করা উচিত।

তবে কি না, এ কথাও কবুল করিতে হইবে, স্বজাতি সম্বন্ধে আমাদের নিজের মনে শুভবুদ্ধি যথেষ্ট সজাগ নয় বলিয়াই বাহিরের লোক আমাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যাবুদ্ধির মূল্য খুব কম করিয়া দেখে। দেশের অন্ন, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি, নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি আমাদের সাধ্য কম, কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।

দেশের দাম আমাদের নিজের কাছে যত, অন্যের কাছে তার চেয়ে বেশি দাবী করিলে সে একরকম ঠকানো হয়। ইহাতে

বড় কেহ ঠকেও না। কেবল চিনাবাজারের দোকানদারের মত করিয়া পরের কাছে দর চড়াইয়া সময় নষ্ট করিয়া থাকি। তাতে যে পরিমাণে সময় যায় সে পরিমাণে লাভ হয় না। এতকাল রাষ্ট্রীয় হাটে সেই দোকানদারি করিয়া আসিয়াছি; যে জিনিষের জন্য নিজে যত দাম দিয়াছি বা দিতে রাজি তার চেয়ে অনেক বড় দাম হাঁকিয়া খুব একটা হট্টগোল করিয়া কাটাইলাম।

শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে, শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্য্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়ালই নাই। এমন কথা যারা বলে, নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে, তারা কর্ত্তৃপক্ষদের কাছ হইতে এ কথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালীর পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন কি, অনিষ্টকর।—জনসাধারণকে লেখাপড়া শেখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।

এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাবটা ঠিকমত যাচাই করিতে হইলে ছুটো একটা দৃষ্টান্ত দেখা দরকার। আমরা বেঙ্গল প্রোভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্স্ নামে একটা রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি করিয়াছি। সেটা প্রাদেশিক, তার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলার অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া বাঙালীর চোখ ফুটাইয়া

দেওয়া। বহুকাল পর্য্যন্ত এই নিতান্ত সাদা কথাটা কিছুতেই আমাদের মনে আসে নাই যে, তা করিতে হইলে বাংলা ভাষায় আলোচনা করা চাই। তার কারণ, দেশের লোককে দেশের লোক বলিয়া সমস্ত চৈতন্য দিয়া আমরা বুঝি না। এই জন্যই দেশের পূরা দাম দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যা চাহিতেছি তা পেট ভরিয়া পাই না তার কারণ এ নয় যে, দাতা প্রসন্নমনে দিতেছে না—তার কারণ এই যে আমরা সত্যমনে চাহিতেছি না।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্ব্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া সহরের ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রফতানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা সহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্য্যন্ত এ অসুবিধাটাতে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে এই সহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্য্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিষ করিয়া লইতে হইবে?

পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ জাপানী ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানীর সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা, তেম্‌নি করা, তেম্‌নি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্য্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব, এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে স্কুল কলেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে সহরে এক বিজ্ঞান-সভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মত গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতে সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালীর চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালীর অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণস্তম্ভের মত স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত।

ওজর এই যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের ভীরুর ওজর। কঠিন বৈ কি, সেইজন্যেই কঠোর সঙ্কল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তা'তে সায়ান্স, তার উপরে, দেশে যে সকল বিজ্ঞানবিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের কলাও জায়গা নাই—এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালীর ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালীকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্—সমস্ত বাঙালীর প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালীর এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

বলা বাহুল্য, ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই—শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসী জর্ম্মাণ শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য অধিকাংশ বাঙালী ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিম্বা অর্দ্ধাশনই ব্যবস্থা এ কথা কোন্‌মুখে বলা যায়?

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড় কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়—সে খুব শক্ত হাতের কর্ম্ম। আশুমুখুজ্জেমশায় ওরি মধ্যে একজায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই,—বাঙালীর ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক্ বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পূরা হইবে না। কিন্তু এ ত গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরি বিদ্যাকে চৌকষ করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড় অস্বাভাবিক নির্ম্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

আমাকে লোকে বলিবে শুধু কবিত্ব করিলে চলিবে না—একটা প্র্যাক্‌টিকেল পরামর্শ দাও, অত্যন্ত বেশি আশা করাটা কিছু নয়। অত্যন্ত বেশি আশা চুলায় যাক্, লেশমাত্র আশা না করিয়াই অধিকাংশ পরামর্শ দিতে হয়। কিছু করিবার এবং হইবার আগে ক্ষেত্রটাতে দৃষ্টি ত পড়ুক। কোনোমতে মনটা যদি একটু উস্‌খুস্ করিয়া ওঠে তাহলেই আপাতত যথেষ্ট। এমন কি, লোকে যদি গালি দেয় এবং মারিতে আসে তা হলেও বুঝি, যে, একটা বেশ উত্তম-মধ্যম ফল পাওয়া গেল।

অতএব পরামর্শে নামা যাক্।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা একজামিন পাশের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখ্‌ড়ার বাহিরেও ল্যাঙোট্-

টার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড় বড় অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন,—এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্জে মশায়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।

আমি এই বলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক,—কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গনটাতে যেখানে আম্‌দরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালীর জিনিষ করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কি? আহূত যারা তারা ভিতর বাড়িতেই বসুক—আর রবাহূত যারা তারা বাহিরে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাক্ না। তাদের জন্য বিলিতি টেবিল না হয় না রইল, দিশি কলাপাত মন্দ কি? তাদে একেবারে দরোয়ান দিয়া ধাক্কা মারিয়া বিদায় করিয়া এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে? অভিশাপ লাগিবে না কি? যারা পার হ

এম্‌নি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মত মিলিয়া যায় তবে বাঙালী শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

সহরে যদি একটিমাত্র বড় রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। সহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া

ভিড়কে ভাগ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আরেকটি সদর রাস্তা খুলিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদিবা তারা কোনোমতে এণ্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়—উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিৎ হইয়া পড়ে।

এমনতর দুর্গতির অনেকগুলা কারণ আছে। এক ত যে-ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মত বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গে[illegible] দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ই[illegible]ার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়,—গরীবের ছে[illegible]র যাক্, সে[illegible] না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর প[illegible]য়। কিছু [illegible] না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়;—ভাষ[illegible]ও হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া [illegible] উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানরা এমনতর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়—কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালীর ছেলে স্বাভাবিক বা

আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তারা বিদ্যা-মন্দির হইতে যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলণ্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মুলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত—কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি। কেননা মুখস্থ করিয়া পাস করাই ত চৌর্য্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায় সেই বা কম কি করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?

যাই হোক্ ভাগ্যক্রমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে হাবড়ার পুলটাই না হয় দু-ফাঁক হইল, কিন্তু কোনোরকমের সরকারী খেয়াও কি তাদের কপালে জুটিবে না? ষ্টীমার, না হয় ত পান্সী?

ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্য্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড় রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারে সুবিধা হয় না? এক ত ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই। তাই হোক্—বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক না কিন্তু গরীবের ছেলেকে তার মাতৃ-স্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?

অনেকদিন হইতে অনেক মার খাইয়াছি বলিয়া সাবধানে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তবু অভ্যাসদোষে বেফাঁস কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমার ত মনে হয়, গোড়ায় কথাটা আমি বেশ কৌশলেই পাড়িয়াছিলাম। নিজেকে বুঝাইয়া-ছিলাম গোপাল অতি সুবোধ ছেলে, তাকে কম খাইতে দিলেও সে চেঁচামেচি করে না। তাই মৃদুস্বরে সুরু করিয়াছিলাম আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরঙ্গনে যে একটা বক্তৃতার বৈঠক বসিয়াছে তারি এককোণে বাংলার একটা আসন পাতিলে জায়গায় কুলাইয়া যাইবে। এ কথাটা গোপালের মতই কথা হইয়াছিল; ইহাতে অভিভাবকেরা যদি বা নারাজ হন তবু বিরক্ত হইবেন না।

কিন্তু গোপালের সুবুদ্ধির চেয়ে যখন তার ক্ষুধা বাড়িয়া ওঠে তখন তার সুর আপনি চড়িতে থাকে। আমার প্রস্তাবটা অনেকখানি বড় হইয়া উঠিয়াছে। তার ফল প্রস্তাবের পক্ষেও সাংঘাতিক হইতে পারে, প্রস্তাবকের পক্ষেও। সেটা নূতন নয়। শুনিয়াছি আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুসংখ্যা খুব বেশি। এ দেশে শতকরা একশো পঁচিশটা প্রস্তাব আঁতুড় ঘরেই মরে। আর, সাংঘাতিক মার এ বয়সে এত খাইয়াছি যে, ও জিনিষটাকে সাংঘাতিক বলিয়া একেবারেই বিশ্বাস করি না।

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখীন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে,--কিম্বা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে! শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চঅঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্য-পরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে এ

অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু দুপাও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য্য। দেশে এই পরিভাষা তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই? দেশে টাকা চলিবেনা অথচ টাকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন বাংলাশিক্ষার রাস্তা খুলিয়া যায় তবে তখন এই বঙ্গসাহিত্যপরিষদের দিন আসিবে। এখন রাস্তা নাই তাই সে হুঁচট খাইতে খাইতে চলে, তখন চার-ঘোড়ার গাড়ি বাহির করিবে। আজ আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপায় আছে, উপকরণ আছে,—ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অন্নসত্র খুলিতে পারি। এই ত সব আছেন আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী এবং আরো অনেক এই শ্রেণীর নামজাদা ও প্রচ্ছন্ননামা বাঙালী। অথচ যে সব বাঙালী কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনোদিন ঘুচিবে না? তারা এঁদের লইয়া গৌরব করিবে কিন্তু লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না? বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে বরঞ্চ সাতসমুদ্র পার হইয়া বিদেশী ছেলে এঁদের কাছে শিক্ষা লইয়া যাইতে পারে কেবল বাংলা দেশের যে ছাত্র বাংলা জানে এঁদের কাছে বসিয়া শিক্ষা লইবার অধিকার তাদেরই নাই!

জার্ম্মানীতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান

করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদ্ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কি হইতে পারে।

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদিবা আমরা পাই, উচ্চ অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোষাকী ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে,—তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজা-উজীর মারি, তর্জ্জমা করি, চুরি করি, এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এ সত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায়, যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি, আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই

না, আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্ত্তি করে, দেহপূর্ত্তি করে না।

সকলেই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ঐ বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাস্ করা ডিগ্রিধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়গোছের শিলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজারদর দাগিয়া দিয়া ব্যবসাদারীর সহায়তা সে করিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রির টাঁকশালার ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুস্কিল এই যে আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে ঢালাই করা রীতিনীতি চালচলনকেই নানা আকারে পূজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচ-দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত। সেইজন্য ছাঁচে-ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই—ইহার চেয়ে বড় কিছু আছে এ কথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয় তার প্রতি বাঙালী অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কি না, ইংরেজি চালুনীর ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়ে একটা বড় সুবিধার কথা আছে।

সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রি লইতেই হয়—কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিম্বা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে তারাই এই বাংলা বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয় যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রি লইতেছে তারাও অবকাশমত বাংলা ভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দুদিন না যাইতেই দেখা যাইবে এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধূলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারা-বর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।

এমনি করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী নিজের ইংরেজী লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলা সাহিত্যের ছোট একটি অঙ্কুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল;—তখন তার ক্ষুদ্রতাকে তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল; কিন্তু সে যে সজীব, ছোট হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয়; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালীর ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ লাভ করিয়াছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদর রাজদ্বারে ছিল না—আমাদের মত অধীন

জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়—বাহিরের সেই সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতী বাজারের যাচনদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে। এতদিন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিবুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্ত্রিখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তার দুটো কারণ আছে, এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ-উপাসকদের ভক্তি এত সুদৃঢ় যে, আমরা ন্যাশনাল কলেজই করি আর হিন্দু য়ুনিভার্সিটিই করি আমাদের মন কিছুতেই ঐ ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমাত্র উপায় আছে এই ছাঁচের পাশে একটা সজীব জিনিষকে অল্প একটু স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া বিরোধ না করিয়া কলকে আচ্ছন্ন করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যখন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয়দান করিবে।

কিন্তু ঐ কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা?

ওটা দেশের আপিস আদালত, পুলিসের থানা, জেলখানা, পাগলাগারদ, জাহাজের জেটি, পাটের কল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আস্‌বাবের সামিল হইয়া থাক্ না। আমাদের দেশ যেখানে ফল চাহিতেছে ছায়া চাহিতেছে সেখানে কোঠাবাড়িগুলা ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসিনা কেন? গুরুর চারিদিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা, তক্ষশিলা,—ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল তেমনি করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক না কেন?

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—"আমরা চাই!" এই মন্ত্র কি দেশের চিত্ত-কুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশে যাঁরা আচার্য্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃ-ভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?

আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নব্য দর্শন

মানুষ পরিবারভুক্ত, সমাজ বা জাতিভুক্ত, দেশভুক্ত, সর্ব্বশেষে এই সমগ্র বিশ্বচরাচরভুক্ত। অনেকে বলেন,—পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ ইত্যাদি মানুষের আবরণ মাত্র। আসল মানুষকে পাইতে হইলে এই সমস্ত খুলিয়া ফেলিতে হইবে। খুলিয়া ফেলিয়া যাহা বাকি থাকিবে তাহাই মানবের সারবস্তু। আবার অনেকে বলেন, তাহা নয় ;—মানুষ একটি আবরণের পর আর একটি আবরণ-পর্য্যায়ের সমষ্টি মাত্র। তোমার বিশ্বাস এই সমস্ত আবরণ বাদ দিলে খাঁটি মানুষটি পাইবে ;—সেটা ভুল। মানুষকে পাইতে হইলে এই আবরণের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। জগৎ ছাড়া জীব নাই, যেমন খোলস ছাড়া সাপ নাই। কিন্তু আমাদের মনের প্রবৃত্তি এই যে, আমরা একবার জীবকে জগৎ হইতে পৃথক্ করি, আবার এই দুইকে একীভূত করি। বাস্তবিক পক্ষে এই দুইকে একেবারে পৃথকও করিতে পারি না, আবার একবার পৃথক্ করিলে একও করিতে পারি না। অনেক দার্শনিক চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। আমার বিশ্বাস যে, জীব জগৎ সৃষ্টি করিতেছে, আর জগৎ জীব সৃষ্টি করিতেছে,—এই উভয়ের মধ্যে আদান প্রদানই বিশ্বের মর্ম্মকথা। সাংখ্যকার প্রকৃতিতে সৃষ্টিগুণ আরোপ করিয়া পুরুষকে দ্রষ্টামাত্র করিয়াছেন, আর ভারতচন্দ্র অন্নদাতাকে বিশ্বের জননীপদে অভিষিক্ত করিয়া শিবকে গাঁজা ও ধুতুরার নেশায় বিভোর করিয়াছেন। আমাদেরও মন চায় যে, জগৎকে জীবিত করিয়া জীবকে নির্জীব করি, আর না হয় ত

জগৎকে নির্জীব করিয়া জীবকে জীবিত করি। ফলকথা, উভয়েই সজীব, উভয়েই প্রাণে ভরা। উভয়েই নিজের প্রাণ দিয়া পরস্পরকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনুপ্রাণিত করিতেছে।

জগতের সৃষ্টি করিবার শক্তি অসীম কি সসীম, তাহা জানি না। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস জীবের সৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ। মানুষ মানুষের সহিত মিলিয়া ধর্ম্ম, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র ইত্যাদি কত কি বস্তু সৃষ্টি করে। কিন্তু কালক্রমে তাহার সৃষ্টিশক্তি কমিয়া আসে—সে আর নূতন সৃষ্টি করিতে চায় না। যাহা আছে তাহাই নাড়াচাড়া করিয়া কালাতিপাত করে। জীব ও জগৎ উভয়েই যে শক্তির আধার, মানুষ তাহা ভুলিয়া যায়। সে ভাবে জগৎই একমাত্র জনয়িত্রী, সে তাহার সন্তান মাত্র। তখন সে জগতের উপর গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া যাইতে চায়, যে পথে সে এতদিন চলিয়া আসিয়াছে সেই পথ ধরিয়া চলিতে চায়। বন জঙ্গল কাটিয়া, পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া নূতন পথ বসাইতে আর তাহার ইচ্ছা হয় না। সে ভাবে যে পথে সে চলিতেছে, তাহা অনাদি ও অনন্ত। বাহ্যিক হিসাবে এ অবস্থায় তাহার হয় ত সবই থাকে। ধন, দৌলত, মান, প্রতিপত্তি, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান—হয় ত তাহার কিছুরই অভাব হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সব হারাইতে বসিয়াছে। তাহার নূতন সৃষ্টি করিবার বাসনাই ক্রমশঃ লোপ পাইবার উপক্রম। তাই সে আর বৈদিক ঋষিদের ন্যায় নূতন দেবতা সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পায় না—পুরাতন দেবতার পূজা অর্চ্চনায় মুক্তিলাভ করে। নূতন মনুষ্যত্ব দেখিলে সে ভয় পায়—পুরাতন মনুষ্যত্ব যা

"চরিত্র" মাত্র দেখিলেই সে সন্তুষ্ট হয়। আর, ধর্ম্মাধিকরণে সে নূতন প্রথায় বিচার প্রার্থনা করে না—precedent মতে বিচার পাইলেই কৃতার্থ হয়।

মানুষের চিন্তার ও জীবনের যে চিত্রটি উপরে দিলাম, উহারই অন্যতম নাম বস্তুতন্ত্রতা বা Realism. বস্তুতন্ত্রতা একটি দার্শনিক মতমাত্র নয়,—ইহা আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত চিন্তা ও জীবনের একটি প্রবৃত্তি বা বিকার। উপর উপর দেখিতে গেলে বস্তুতন্ত্রতা কোন দোষের কথা বলে না। মাত্র এই বলে—জীব ছাড়া একটি স্বতন্ত্র বহির্জগৎ আছে। অনেক দার্শনিক আছেন যাঁহারা এ মত অস্বীকার করেন। কিন্তু আমাদের দশজনের পক্ষে বহির্জগতের অস্তিত্ব একটি মৌলিক সত্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বস্তুতন্ত্রবাদীগণ কেবল মাত্র বহির্জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গ্রাহ্য (posit) করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না—তাঁহারা বলেন, এই বহির্জগতের সহিত জীবের চিন্তা ও কার্য্যের সামঞ্জস্যই নিত্য। একথাও হয় ত একেবারে অমূলক নয়। জীব ছাড়া যদি বহির্জগৎ থাকে, তাহা হইলে অবশ্য জীবকে সেই জগৎ মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা তাহার পদে পদে বিড়ম্বনা। কিন্তু বহির্জগৎ কথাটি বড় আলগা। বহির্জগৎ বলিলে সচরাচর আমরা বুঝিয়া থাকি "জড়জগৎ"। অথচ একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, বহির্জগতে ইট্ পাথর তো আছেই—কিন্তু তাহা ছাড়া অপর অনেক বস্তু আছে—যথা জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র, ইত্যাদি। বস্তুতন্ত্রবাদী জড়-জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি সমগ্র বস্তুই নিজের মতের গণ্ডির মধ্যে আনিবার চেষ্টা করেন।

এই চেষ্টার ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে যে সমুদয় বস্তু অল্পাধিক পরিমাণে জীবের নিজের চিন্তা ও চেষ্টার সৃষ্টি, তাহাদেরও কারণ কালক্রমে বহির্জগতে আরোপিত হয়, এবং শেষে আমাদের নিজেদের একটি বিশ্বাস জন্মে যে, বহির্জগৎই সর্ব্ববস্তুর মূল কারণ—জীব একটি কারণ-ফলমাত্র।

যতক্ষণ বস্তুতন্ত্রবাদী জড়জগৎ লইয়া নাড়াচাড়া করেন, ততক্ষণ অন্ততঃ ব্যবহারিক সূত্রে উত্তর পক্ষের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। যদি জড়জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করি, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই জগতের সহিত মিল করাই জড়জগৎ সম্বন্ধীয় চিন্তা বা জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু জড়জগতের জ্ঞান ছাড়া মানুষের অন্য দশবিষয়ের জ্ঞান আছে। সে সমুদয় জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? এখানেও বস্তুতন্ত্রবাদী জড়জগতের ন্যায় এক একটি জগৎ posit করিয়া সেই সেই জগতের পরিচয় লওয়াই আমাদের জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য—ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পান। তাঁহাদের মতে জীব জড়জগৎ হইতে যেমন স্বতন্ত্র ও তৎসম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়, ভাবজগৎ হইতেও তেমনই স্বতন্ত্র ও তৎসম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়,—উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের জ্ঞান বহির্জগতের ছায়ামাত্র; উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের চিন্তা, যাহা আছে তাহারই প্রকাশক মাত্র। কি জড়জগৎ কি ভাবজগৎ—কোনটিই আমাদের সৃষ্টি নয়।

বস্তুতন্ত্রতা যে কেবল জড়জগতে নিজের আধিপত্য স্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু সেই আধিপত্য অন্যত্র বিস্তার করিতে সচেষ্ট,—তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হয়। প্রথমে ধরুন সমাজ। সামাজিক রীতিনীতি আচারব্যবহার মানুষ

নিজের সুখ, সুবিধা বা আত্মস্ফূর্ত্তি ও আত্মোন্নতির জন্য উদ্ভাবন করে। অবশ্য বহির্জগৎ একেবারে চুপ থাকে না। সে অল্পাধিক পরিমাণে মানুষকে সাহায্য করে, কিম্বা বাধা দেয়। পূর্ব্বতন সমাজতত্ত্ববাদীদের বিশ্বাস যে, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি সর্ব্বতো-ভাবে বহির্জগৎ বা আবর্ত্তনের সৃষ্টি। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ যতই সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, ততই দেখিতে পাইতেছেন যে, মানুষের নিজের চিন্তা ও চেষ্টা সমাজ স্থাপন, পরিবর্ত্তন ও বিকাশের অন্যতম মূলকারণ। দুঃখের বিষয় বস্তুতন্ত্রবাদী এ কথাটি সব সময় মনে রাখেন না—তিনি নিজের মতের একাধিপত্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে এই পরিদৃশ্যমান মানব-সমাজ ছাড়া একটি সনাতন সমাজের অস্তিত্ব posit করেন, এবং সেই সনাতন সমাজের সহিত সামঞ্জস্য বা মিলন সাধন করা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের যে একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। এই সনাতন সমাজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কার্য্যে ও জীবনে বস্তুতন্ত্রতা প্রবেশ করে। সনাতন সমাজই আমাদের একমাত্র আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়—নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিতে আর আমাদের ইচ্ছা হয় না,—বরঞ্চ ভয় হয়। এক-কথায়, মানবাত্মার স্ফুর্ত্তি ও বিকাশ ক্রমশঃ লোপ পায়। মানুষ আর নিজের প্রাণে বহির্জগৎকে অনুপ্রাণিত করে না—সনাতন জগতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করাই তাহার মুখ্য চেষ্টা হইয়া দাঁড়ায়।

নীতিক্ষেত্রে বস্তুতন্ত্রতার প্রভাব কতদূর, তাহা দুইচারিটি নীতি-বেত্তার পুস্তকাদি পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়। নীতিবেত্তা মাত্রেই মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন চালাইবার জন্য এক একটি

moral catechism প্রস্তুত করিয়াছেন। Moses এর Ten Commandments হইতে আরম্ভ করিয়া Herbert Spencer-এর Absolute & Relative Ethcis পর্য্যন্ত—যে কোনো নীতিশাস্ত্র দেখুন না কেন, দেখিবেন, সকলেরই মুখ্য চেষ্টা এক—দুইটি বা দশটি সনাতন বা চিরন্তন নৈতিক নিয়ম প্রতিপন্ন করা। কেহ বলিবেন, এই সমুদয় নিয়ম ঈশ্বরাগত; কেহ বা বলিবেন, সেগুলি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম; আবার কেহ বলিবেন, সেগুলি বিশ্বের ন্যায় অনাদি ও অনন্ত। অনেকে হয় ত বলিবেন, দুই চারিটি সনাতন নৈতিক নিয়ম আনিবার সহিত বস্তুতন্ত্রতার কি সম্বন্ধ? সম্বন্ধ যথেষ্ট আছে। আমার বিশ্বাস, যাহা কিছু মানুষকে বাঁধিবার চেষ্টা করে, তাহাই বস্তুতন্ত্রতা—এবং নীতিবেত্তা মাত্রেরই চেষ্টা কতকগুলি সনাতন বা চিরন্তন নিয়মের শৃঙ্খলে মানুষের চিন্তা ও কার্য্য চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখা। উপরন্তু জড়বাদীর যেমন বিশ্বাস যে একটি স্বতন্ত্র জড়জগৎ আছে, এবং সেই জগতের পরিচয় নেওয়াই আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্য, তেমনি অধিকাংশ নীতিবেত্তারও বিশ্বাস যে মানুষ ছাড়া একটি স্বতন্ত্র নৈতিক জগৎ আছে, এবং সেই জগতের নিয়ম অনুসরণ করাই আমাদের স্বভাব ও চরিত্রের ধর্ম্ম। তাঁহাদের মতে মানুষ কর্ম্মী বটে, কিন্তু তাহার কর্ম্মের একটি অলঙ্ঘনীয় সীমা আছে—একটি চিরন্তন মাপকাঠি আছে। ইহারই নাম "নৈতিক বস্তুতন্ত্রতা" বা moral realism। এই মত সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল। ভবিষ্যতে অবসর মতে বলিব।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী।

পুস্তক-প্রশংসা

রঙ্গ ও ব্যঙ্গ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক এম,এ প্রণীত।

সেন রায় এণ্ড কোং—কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিংস, কলিকাতা।

বীরবল বলেন যে "কাব্য-সমালোচনার তিনটি জাতি আছে—উত্তম, মধ্যম এবং অধম। যে সমালোচনায় কোনও গ্রন্থের দোষগুণ বিচার করা হয়, তাই উত্তম; যাতে কেবল প্রশংসা করা হয় তা মধ্যম এবং যাতে শুধু নিন্দা করা হয় তা অধম। এ ছাড়া উত্তম-মধ্যম, অধমাধম প্রভৃতি অনেক মিশ্রজাতির সমালোচনা আছে।"

বীরবল নিজে উত্তম-মধ্যমের পক্ষপাতী—আমি মধ্যমের, কেননা আমার উত্তম সমালোচনা করবার শক্তি নেই এবং অধম সমালোচনা করবার প্রবৃত্তি নেই।

অনেকে হয়ত মনে করবেন যে, সে পথ নিরাপদ বলেই আমি মধ্যপথ অবলম্বন করতে চাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনা তা নয়। আজকাল দেখতে পাই—এদেশে নিন্দা করার চাইতে প্রশংসা করার ভিতরই বিপদ বেশি। কারও নিন্দা করলে শুধু একজনের মনে কষ্ট দেওয়া হয়, কিন্তু একজনের প্রশংসা করলে অনেকের মনে কষ্ট দেওয়া হয়—অর্থাৎ সেই অগণ্য লোকের যাঁদের প্রশংসা করা হয়নি। ঝিকে মারার অর্থ যে বৌকে শেখানো—এ কথা ত আমরা সকলেই মানি, কিন্তু বৌকে আদর করার অর্থ যে ঝিকে মারা, এ জ্ঞান সম্প্রতি একখানি বেনামি পত্রের প্রসাদে আমি লাভ করেছি।

পূর্ব্বে যদি আমি একের প্রশংসা করে অপরের মনে ব্যথা দিয়ে থাকি তাহলে আমার সেই অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য সাহিত্য-সমাজের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করচি।

এ শিক্ষালাভ করা সত্বেও আমি "রঙ্গ ও ব্যঙ্গের" প্রশংসা করতে বাধ্য, কেননা, গ্রন্থকার বাঙ্গালীচরিত্র বর্ণনাসূত্রে বলেছেন যে,—

'আমরা বাঙ্গালী খাঁটি
মোরা কুৎসা কলহ করি অহরহ
কিছুতে বলিনা না'টি,

* * *

ভালগুলি রেখে মন্দ সকল
মিমেষেতে মোরা টুকি অবিকল'

এ কথা শুনে আমার এ বইয়ের ভালগুলি রেখে মন্দ সকল টোকবার সাহস নেই।

আর এক কথা বলে রাখি। নিক্তির ওজনে নিন্দা প্রশংসা করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং নিন্দা যদি একরতি কম হয় আর প্রশংসা যদি একরতি বেশিও হয় তার জন্য সমালোচককে পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী করা উচিত নয়। কাও যদি দিতেই হয় ত মিষ্ট কথারই দেওয়া উচিত;—ও দানে দাতা গ্রহীতা দুজনেরই মান সমান বজায় থাকে।

প্রথমতঃ আমি এই বইয়ের নামের তারিফ করি। "রঙ্গ ও ব্যঙ্গ" এই নামকরণে গ্রন্থকার অসামান্য সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। আজ-কাল বাঙলা সাহিত্যের যত কাগজ আমাদের হাতে আসে সে সবই

হয় রঙ্-ছুট্, নয় গেরুয়া—তাও আবার ছোপানো নয়, ছাপানো; অর্থাৎ সে রং আমাদের সাহিত্যের সদরে চেপে বসেছে, ভিতরে ধরেনি। আমরা জীবনে যে শুধু গৃহস্থ তাই নয় নেহায়েৎ গেরস্ত; কিন্তু সাহিত্যে আমরা সবাই ব্রহ্মচারী—জীবনে আমরা কেউ নই। কিন্তু সাহিত্যে আমরা প্রত্যেকেই সোঽহং। সাহিত্যে জীবনের রঙের চেহারা দেখ্‌তে আমরা ভয় পাই কেন না জীবনের রঙ ত রক্তের রঙ, জলের নয়। এ অবস্থায় যিনি সাহিত্যে রঙ্গের প্রশ্রয় দিতে চান তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তার পর, যে ক্ষেত্রে নিত্য আত্মশ্লাঘা করা হয়ে থাকে—সে ক্ষেত্রে যিনি ব্যঙ্গ করতে উদ্যত, তাঁর আর যা সদ্‌গুণের অভাব থাক, সৎসাহসের অভাব নেই। এই নামের জন্য আমি তাঁর বইকে একশর ভিতর দশ মার্ক দিতে প্রস্তুত আছি।

পৃথিবীর যেমন একভাগ স্থল আর তিনভাগ জল, এ গ্রন্থেরও তেমনি একভাগ পদ্য এবং তিনভাগ গদ্য। এই পদ্যাংশের প্রায় সকল অংশই হচ্ছে লালিকা, ইংরাজিতে যাকে বলে parody. প্যারডির উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি ভাল কবিতার বাইরেটা ঠিক রেখে ভিতরটা উল্টে দেওয়া;—তার দেহটি ঠিক রেখে তার আত্মাটি বদলে দেওয়া। এ হচ্ছে হাত-সাফাইয়ের কাজ। এ ব্যাপারে যিনি মূল কবিতার দেহের গঠন, অঙ্গসৌষ্ঠব, ভঙ্গী ও ছন্দ যতটা বজায় রাখতে পার্‌বেন এবং তার আত্মাটিকে যত খেলো করে দিতে পারবেন, তাঁর কৃতিত্ব তত বেশি। কোনো কবিতার পূর্ব্ব-পরিচিত রূপের সঙ্গে তার নব-কল্পিত ভাবের অসঙ্গতি যত স্পষ্ট হয়ে উঠবে, প্যারডির চেহারা তত ফুটে উঠবে,—কেননা প্যারডি হচ্ছে কবিতার বিকল্প। "রঙ্গ ও ব্যঙ্গের" রচয়িতা এ বিষয়ে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন অ

আমার কাছে অপূর্ব্ব—কেননা পূর্ব্বে আমি বঙ্গসাহিত্যে এ মেক্-দারের প্যারডির সাক্ষাৎ পাই নি। তাঁর প্যারডির আর একটি মহৎ গুণ এই যে, তাতে রঙ্গ আছে কিন্তু ব্যঙ্গ নেই। ঘটক মহাশয় এ সত্য ভুলে যাননি, যে-কবিতা ঠাট্টার সামগ্রী তা প্যারডির বিষয় নয় আর যা ঠাট্টার সামগ্রী নয় তা নিয়ে তামাসা করা চলে কিন্তু ঠাট্টা করা চলে না।

পৃথিবীর যেমন বেশির ভাগ জলো—রঙ্গ ও ব্যঙ্গেরও বেশির ভাগ অর্থাৎ গদ্যের ভাগ, পদ্যের ভাগের তুলনায় জলো। ঘটক মহাশয়ের গলায় হাসির সুর আছে এবং সে সুর ঘোরে; কিন্তু তার অতিবিস্তার করতে গিয়েই তার রস ফিকে হয়ে গেছে। আলঙ্কারিকদের মতে রসের অর্থ স্থায়ীভাব। অন্যান্য রস সম্বন্ধে এ কথা সত্য হলেও হাস্যরস সম্বন্ধে সম্ভবতঃ সত্য নয়। হাসি জিনিষটে প্রায়ই ক্ষণস্থায়ী—কেন না ও ক্ষণপ্রভার জাত।

ইংরাজি সাহিত্যে আমরা হাসির যুগল-মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই, একটি স্থায়ী আর একটি অস্থায়ী—তার প্রথমটির নাম humour এবং দ্বিতীয়টির নাম wit. এ দুটির প্রভেদ যে কোথায় এবং কতখানি তা নিয়ে সে-দেশে অনেক গবেষণা করা হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি সে ভেদতত্ত্ব নির্ণীত হয় নি। তবে মোটামুটিভাবে এদের ভেদ নির্ণয় করা যেতে পারে। আমার বিশ্বাস wit হচ্ছে সম্পূর্ণ মনের সৃষ্টি; অপর-পক্ষে অন্তর ও বাহির এ দুয়ের যোগা-যোগেই humour জন্ম লাভ করে।

ভাবের সঙ্গে ভাবের, কথার সঙ্গে কথার চক্‌মকি ঠুকেই যে হাসির সৃষ্টি করতে হয় তারি নাম wit—এ হাসির আলো যেমন

উজ্জ্বল, তেমনি তীক্ষ্ণ—এ আলো অন্ধকারের গায়ে ছুরির মতন বেঁধে। এ জাতির হাসিতে যেমন আলো আছে, তেমনি আগুনও আছে। মনের এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চামড়ার উপরে পড়্‌লে সেখানে ফোস্কা ওঠে, সোলার উপরে পড়্‌লে তা ভস্ম হয়ে যায়। এর স্ফূর্ত্তি যেমন ক্ষণস্থায়ী, এর জ্বালা তেমনি চিরস্থায়ী। এ রঙ্গের হাসি নয়, ব্যঙ্গের হাসি।

হাসির রঙ্গমশালের নাম humour;—এর আলোতে চারিদিক রঙ্গিন করে তোলে অথচ এর স্পর্শে কিছুই পোড়ে না। রঙ্গ-মশাল দেখবার বস্তু নয়—তার আলোতে নানা বস্তু অপরূপ চেহারায় দেখা দেয়। সুতরাং humour-এর উপাদান হচ্ছে বাহ্যবস্তু। ঘটক মহাশয় হচ্ছেন humourist—কিন্তু তিনি অতি স্বল্প উপাদানের উপর অনেকখানি হাসির প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে ও-বস্তুকে তেমন ভাল করে দাঁড় করাতে পারেন নি। গদ্যে "নোলক" "আরসি" "ঢেঁকি" "কুলো" প্রভৃতি বস্তু হচ্ছে তাঁর হাসির অবলম্বন এবং উপকরণ। নোলকের গায়ে অনেকখানি হাসি ধরে না, আরসির গা থেকে তা ঠিক্‌রে পড়ে, আর ঢেঁকিতে হাজার পাড় দাও আর কুলোকে হাজার পেটাও তার থেকে হাস্যরসের তরঙ্গ বার করা অসাধ্যের সাধন করা। এরূপ ক্ষীণ ভিত্তির উপর হাসিকে স্থায়ী করা কষ্টসাধ্য এবং সাহিত্যে দুষ্ট-হাসিরও স্থান আছে কিন্তু কষ্ট-হাসির নেই। মানুষের হাসির বিষয় হচ্ছে প্রধানতঃ মানুষ। ঢেঁকি কুলোর চাইতে মানুষ ঢের বেশি হাস্যকর পদার্থ। সুতরাং ঘটক মহাশয় যেখানে স্বজাতিকে নিয়ে রঙ্গ ও ব্যঙ্গ করবার চেষ্টা করেছেন সেখানেই অল্পবিস্তর কৃতকার্য্য

হয়েছেন। তাঁর ব্যঙ্গের প্রধান গুণ এই যে, তাঁর বিদ্রূপবাণ তীক্ষ্ণ না হলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়। আমাদের মনোভাবে এবং ব্যবহারে যা বাস্তবিকই স্ফীত এবং বিকৃত তাই হচ্ছে তাঁর উপহাসের বিষয়।

ঘটক মহাশয়ের উপহাসের ভিতর তেমন ঝাঁঝ নেই। কিন্তু এ ত্রুটি যে নিতান্ত আপ্‌শোষের বিষয় তা বলতে পারিনে, কেননা বাঙ্গলা ভাষার অনেক ঝাঁঝালো লেখাতে শুধু গেঁজে-যাওয়া রসের পরিচয় পাওয়া যায়। দুবেলা দেখতে পাই রঙ্গব্যঙ্গ পঙ্কোৎসবে পরিণত হচ্ছে, রসিকতা ইতরতাকে বরণ করছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটকের রচনার ভাবে ভাষায় আকারে ইঙ্গিতে ইতরতার নামগন্ধও নেই। তাঁর লেখার ভিতর আগাগোড়া এমন একটি ভদ্র সুর আছে যা তাঁর মনের আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। এই শ্রেণীর নবীন লেখকেরা রসিকতাকে জাতে তোল্‌বার চেষ্টা করছেন, সুতরাং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে এঁদের এ চেষ্টা সফল হোক্— এঁদের হাতে রঙ্গের রং পেকে উঠুক।

গোবর গণেশের গবেষণা

শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার প্রণীত।

ঘটক মহাশয়ের ব্যঙ্গের ভিতর যা নেই—হালদার মহাশয়ের ব্যঙ্গের ভিতর তা যথেষ্ট আছে—অর্থাৎ নুন ও ঝাল; এমন কি স্থানে স্থানে এই নুনঝালের মাত্রা অতিরিক্ত হওয়ার দরুন হাস্যরস কটু হয়ে উঠেছে। তাতে আমি আপত্তি করিনে, কেননা, হালদার

মহাশয় যা বলেছেন, তা সাজানো-গোছানো কথা নয়—সে তাঁর মনের কথা, এবং সে মন আমাদের জীবনের হীনতা এবং দীনতার পরিচয়ে তিতো হয়ে গেছে। হালদার মহাশয় কলম ধারণ করেছেন বাঙ্গালীকে আমোদ দেবার জন্য নয়, তাকে খোঁচা দেবার জন্য। তিনি আমাদের মনে বিঁধিয়ে কথা বল্‌তে চান, সুতরাং তাঁর যতদূর সাধ্য সে কথাকে তিনি ছুঁচলো করতে চেয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য রঙ্গ করা নয়; ব্যঙ্গ করা; সুতরাং তিনি যেখানে রঙ্গ করেছেন সেখানে তাঁর ভাব ও ভাষা তেমন জমাট হয়নি, কিন্তু যেখানে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন সেখানে তাঁর ভাব ও ভাষা দানা বেঁধে উঠেছে। তিনি দেখে এবং ঠেকে শিখেছেন যে আমাদের মুখে ধর্ম্মের কথা, বৈরাগ্যের কথা, স্বদেশের কথা, শিক্ষার কথা—এসব হচ্ছে বুলি, এবং এই সব বুলি আমাদের মন থেকেও বেরোয় নি, আমাদের জীবনে গিয়েও পৌঁছয়নি। আমাদের মানুষ হবাব সকল চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের দেহের মনের ও চরিত্রের জড়তা। আমরা যতদিন না সে জড়তার হাত থেকে মুক্তি পাব ততদিন আমাদের তামসিকতাকে আমরা বড় বড় কথার ছদ্মবেশ পরিয়ে সাত্ত্বিকতা বলে চালাতে চেষ্টা করব। এতে আমরা নিজের ছাড়া অপর কারও চোখে ধূলো দিতে পারব না।

হালদার মহাশয় আমাদের চোখে-আঙুল-দিয়ে সমাজের অবস্থা দেখিয়ে দিয়েছেন, কেননা তাঁর ব্যঙ্গ সচিত্র—ইংরাজিতে যাকে বলে Illustrated; তিনি পাতায় পাতায় আমাদের জীবনের ও মনের ছবি এঁকে গিয়েছেন। আমরা জীবনের পথে এমনি ঝিমন্তভাবে চলি যে চারপাশের চেহারা অপরে না দেখিয়ে দিলে আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। সুতরাং হালদার মহাশয় যে আমাদের চোখের সুমুখে

সমাজের ছবি ধরে দিয়েছেন তার জন্য পাঠক-সমাজের তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এ সেহাই-কলমের কাজ করতে পারেন এমন গুণী বাঙ্গলায় খুব কম আছে। অনেকে হয় ত বল্‌বেন যে হালদার মহাশয়ের হাত থেকে যা বেরিয়েছে তা ফোটোগ্রাফ নয়, caricature. এ কথার ভিতর ষোলো-আনা না হোক আট-আনা সত্য আছে। মহাকালী পাঠশালার পুরস্কার-বিতরণ, হাইকোর্ট বঙ্গযুবকের বেশভূষা ইত্যাদির বর্ণনায় এ সব বস্তু এবং ব্যাপারের ফোটোগ্রাফ তোলা হয়েছে। অপর পক্ষে স্বদেশী সভা, গেরুয়া প্রভৃতির যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা অবশ্য caricature—কিন্তু তাই বলে তা মিথ্যা নয়। মনগড়া ছবির নাম caricature নয়, তার নাম আদর্শ। আমরা গল্পে কবিতায় বাঙ্গালী সমাজের যে-সব আদর্শ-চিত্র অঙ্কন করি তার বেশির ভাগই মন-গড়া—তার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক অতি কম। Caricature হচ্ছে idealisation-এর উল্টো রাস্তা। কোনও ব্যক্তির আকৃতির যে অংশ সুন্দর সেই অংশ আলোয় ফুটিয়ে তোলা এবং বাকি অংশ ছায়ায় ঢেকে দেবার নাম idealisation, সুতরাং idealise করতে কতক অংশ সত্য ঢাকা-চাপা দিতে হয়। অপর পক্ষে আকৃতির যে অংশ বিকৃত সেই অংশটিকে সুমুখে টেনে আনাই হচ্ছে caricature-এর উদ্দেশ্য—এতেও কতক অংশ সত্যকে পিছনে ফেলতে হয়। আর্ট হিসেবে এ উভয়েরি সার্থকতা আছে। তবে সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে, যে আমাদের সমাজকে idealise করতে হলে যে পরিমাণ সত্য গোপন করতে হয় caricature-এ তার চাইতে ঢের কম। সেই caricature যথার্থ আর্ট যাতে টান-

টোনে মুখের চেহারা একটু আধটু বাঁকিয়ে চরিয়ে মনের প্রকৃত চেহারা বার করে আনা হয়। আমার বিশ্বাস, হালদার মহাশয় অনেক স্থলেই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছেন। এই কারণে আমি বাঙ্গালীমাত্রকেই এ বই পড়তে অনুরোধ করি। এ গ্রন্থপাঠে আমাদের অন্ততঃ এই উপকারটুকু হবে যে আমাদের হুঁস হবে যে everything is for the best in this the best possible of all societies—এ ধারণা ভুল।

এ জ্ঞান লাভ করা বড় কম লাভের কথা নয়—কেননা এ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য-জ্ঞানও আসে। আমাদের এ চৈতন্য হয় যে, যা আছে তাকে better করতে চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। আমার বিশ্বাস যে হালদার মহাশয় স্বদেশকে ভালবাসেন বলেই স্বসমাজকে realise করতে চেষ্টা করেছেন, কেননা idealise করবার দোষ এই যে ideal-কে এক পূজা করা ছাড়া তার প্রতি আমাদের কোনও কর্ত্তব্য নেই এবং পূজা করতে হলে মানুষকে হাত পা জড় করে বসতে হয়। খাইদাই কাঁসি বাজাই দেশফেশের ধার ধারিনে,—এরূপ প্রকৃতির পাঠকেরাও এ গ্রন্থ থেকে কোনো শিক্ষালাভ না করুন, নিশ্চয় কতকটা আমোদ লাভ করবেন; কেননা গ্রন্থকার যা বলেছেন তা ফুর্ত্তি করেই বলেছেন। এ লেখা আর যাই হোক ভোঁতা নয়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ঘরে-বাইরে

বিমলার আত্মকথা

একজন্মে যে এতটা ঘটতে পারে সে মনেও করা যায় না। আমার যেন সাতজন্ম হয়ে গেল। এই কয় মাসে হাজার বছর পার হয়ে গেছে। সময় এত জোরে চলছিল যে চল্‌চে বলে বুঝতেই পারিনি। সেদিন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পেরেচি।

বাজার থেকে বিদেশী মাল বিদায় করবার কথা যখন স্বামীর কাছে বল্‌তে গেলুম তখন জানতুম এই নিয়ে খানিকটা কথা-কাটাকাটি চল্‌বে। কিন্তু আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে, তর্কের দ্বারা তর্ককে নিরস্ত করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। আমার চারদিকের বায়ুমণ্ডলে একটা জাদু আছে। সন্দীপের মত অত বড় একটা পুরুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত যে আমার পায়ের কাছে এসে ভেঙে পড়ল। আমি ত ডাক দিইনি—সে আমার এই হাওয়ার ডাক। আর সেদিন দেখ্‌লুম সেই অমূল্যকে—আহা সে ছেলেমানুষ—কচি মুরলী বাঁশটির মত সরল এবং সরস—সে আমার কাছে যখন এল তখন ভোরবেলাকার নদীর মত দেখতে দেখতে তার জীবনের ধারার ভিতর থেকে একটি রং ফুটে উঠল। দেবী তাঁর ভক্তের মুখের দিকে চেয়ে যে কি-রকম মুগ্ধ হতে পারেন সেদিন অমূল্যর দিকে চেয়ে আমি তা বুঝতে পারলুম। আমার শক্তির সোনার কাঠি যে কেমনতর কাজ করে এমনি করে ত তা দেখতে পেয়েচি।

তাই সেদিন নিজের পরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বজ্রবাহিনী বিদ্যুৎ-শিখার মত আমার স্বামীর কাছে গিয়েছিলুম। কিন্তু হল কি? আজ ন বছরে একদিনও স্বামীর চোখে এমন উদাস দৃষ্টি দেখিনি। সে যেন মরুভূমির আকাশের মত, তার নিজের মধ্যেও একটুখানি রসের বাষ্প নেই, আর যার দিকে তাকিয়ে আছে তার মধ্যেও যেন কোথাও কিছুমাত্র রং দেখা যাচ্চে না। একটু যদি রাগও করতেন তাহলেও বাঁচতুম। কোথাও তাঁকে ছুঁতেও পারলুম না। মনে হল আমি মিথ্যে। যেন আমি স্বপ্ন,—স্বপ্নটা যেই ভেঙে গেল, অম্‌নি কেবল অন্ধকার রাত্রি।

এতকাল রূপের জন্যে আমার রূপসী জা'দের ঈর্ষা করে এসেচি। মনে জান্‌তুম বিধাতা আমাকে শক্তি দেন নি—আমার স্বামীর ভালোবাসাই আমার একমাত্র শক্তি। আজ যে শক্তির মদ পেয়ালা ভরে খেয়েচি, নেশা জমে উঠেচে। এমন হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল। এখন বাঁচি কি করে!

তাড়াতাড়ি খোঁপা বাঁধ্‌তে বসেছিলুম! লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! মেজরাণীর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বলে উঠলেন, কিলো ছোটরাণী, খোঁপাটা যে মাথা ডিঙিয়ে লাফ মারতে চায়, মাথাটা ঠিক আছে ত?

সেদিন বাগানে স্বামী আমাকে অনায়াসে বল্লেন, তোমাকে ছুটি দিলুম। ছুটি কি এতই সহজে দেওয়া যায় কিম্বা নেওয়া যায়? ছুটি কি একটা জিনিষ? ছুটি যে ফাঁকা। মাছের মত আমি যে চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েচি—হঠাৎ আকাশে তুলে

ধরে যখন বলে, এই তোমার ছুটি—তখন দেখি এখানে আমি চলতেও পারিনে বাঁচতেও পারিনে।

আজ শোবার ঘরে যখন ঢুকি তখন শুধু দেখি আস্‌বাব, শুধু আলনা শুধু আয়না শুধু খাট—এর উপরে সেই সর্ব্বব্যাপী হৃদয়টি নেই। রয়েছে ছুটি, কেবল ছুটি, একটা ফাঁক। ঝরণা একেবারে শুকিয়ে গেল, পাথর আর নুড়িগুলো বেরিয়ে পড়েচে। আদর নেই, আসবাব।

এ জগতে সত্য আমার পক্ষে কোথায় কতটুকু টিঁকে আছে সে সম্বন্ধে হঠাৎ যখন এত বড় একটা ধাঁধাঁ লাগ্‌ল তখন আবার দেখা হল সন্দীপের সঙ্গে। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের ধাক্কা লেগে সেই আগুন ত আবার তেমনি করেই জ্বল্‌ল। কোথায় মিথ্যে! এ যে ভরপূর সত্য—দুই কূল ছাপিয়ে পড়া সত্য। এই যে মানুষগুলো সব ঘুরে বেড়াচ্চে, কথা কচ্চে, হাস্‌চে,—ঐ যে বড় রাণী মালা জপ্‌চেন, মেজরাণী থাকো দাসীকে নিয়ে হাস্‌চেন, পাঁচালীর গান গাচ্চেন, আমার ভিতরকার এই আবির্ভাব যে এই-সমস্তর চেয়ে হাজারগুণে সত্য!

সন্দীপ বল্লেন, পঞ্চাশ হাজার চাই!—আমার মাতাল মন বলে উঠ্‌ল পঞ্চাশ হাজার কিছুই নয়! এনে দেব! কোথায় পাব, কি করে পাব, সেও কি একটা কথা! এই ত আমি নিজে এক মুহূর্ত্তে কিছু-না থেকে একেবারে সব-কিছুকে যেন ছাড়িয়ে উঠেছি—এমনি করেই এক-ইসারায় সব-ঘটনা ঘটবে। পারব, পারব, পারব—একটুও সন্দেহ নেই।

চলে ত এলুম। তার পর চারদিকে চেয়ে দেখি, টাকা

কই? কল্পতরু কোথায়? বাহিরটা মনকে এমন করে লজ্জা দেয় কেন? কিন্তু তবু টাকা এনে দেবই। যেমন করেই হোক্ তাতে গ্লানি নেই। যেখানে দীনতা সেখানেই অপরাধ, শক্তিকে কোনো অপরাধ স্পর্শই করে না। চোরই চুরি করে, বিজয়ী রাজা লুঠ করে নেয়। কোথায় মালখানা, সেখানে কা'র হাতে টাকা জমা হয়, পাহারা দেয় কা'রা—এই সব সন্ধান করচি। অর্দ্ধেক রাত্রে বাহির-বাড়িতে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দফ্তর-খানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কাটিয়েচি। ঐ লোহার গরাদের মুটো থেকে পঞ্চাশ হাজার ছিনিয়ে নেব কি করে? মনে দয়া ছিল না—যারা পাহারা দিচ্চে তারা যদি মন্ত্রে ঐখানে মরে পড়ে তাহলে এখনি আমি উন্মত্ত হয়ে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যেতে পারি। এই বাড়ির রাণীর মনের মধ্যে ডাকাতের দল খাঁড়া হাতে নৃত্য করতে করতে দেবীর কাছে বর মাগ্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু বাইরের আকাশ নিঃশব্দ হয়ে রইল, প্রহরে প্রহরে পাহারা বদল হতে লাগ্‌ল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজ্‌ল, বৃহৎ রাজবাড়ি নির্ভয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে রইল।

শেষকালে একদিন অমূল্যকে ডাক্‌লুম। বল্লুম, দেশের জন্যে টাকার দরকার—খাজাঞ্চির কাছ থেকে এ টাকা বের করে আন্‌তে পারবে না?

সে বুক ফুলিয়ে বল্লে, কেন পারব না?

হায়রে, আমিও সন্দীপের কাছে এমনি করে বলেছিলুম, কেন পারব না? অমূল্যর বুক ফোলানো দেখে, একটুও আশ্বাস পেলুম না।

জিজ্ঞাসা করলুম, কি করবে বল দেখি?

অমূল্য এমনি-সব আজগুবি প্ল্যান বল্‌তে লাগল যে, সে মাসিক-কাগজের ছোট গল্পে ছাড়া আর কোথাও প্রকাশ করবারই যোগ্য নয়।

আমি বল্লুম, না, অমূল্য, ও-সব ছেলেমানুষি রাখ।

সে বল্লে, আচ্ছা, টাকা দিয়ে ঐ পাহারার লোকদের বশ করব।

টাকা পাবে কোথায়?

সে অম্লানমুখে বল্লে, বাজার লুট করে।

আমি বল্লুম, ও-সব দরকার নেই, আমার গয়না আছে তাই দিয়ে হবে।

অমূল্য বল্লে, কিন্তু খাজাঞ্চির উপর ঘুষ চল্‌বে না। খুব একটা সহজ ফিকির আছে।

কি রকম?

সে আপনার শুনে কাজ নেই। সে খুব সহজ।

তবু শুনি।

অমূল্য কোর্ত্তার পকেট থেকে প্রথমে একটা পকেট-এডিশন গীতা বের করে টেবিলের উপর রাখ্‌লে, তার পরে একটি ছোট পিস্তল বের করে আমাকে দেখালে—আর কিছু বল্লে না।

কি সর্ব্বনাশ! আমাদের বুড়ো খাজাঞ্চিকে মারার কথা মনে করতে ওর এক মুহূর্ত্তও দেরী হল না। ওর মুখখানি এমনতর যে, মনে হয় একটা কাক মারাও ওর পক্ষে শক্ত, অথচ মুখের কথা একেবারে অন্য জাতের। আসল কথা, এই সংসারে

বুড়ো খাজাঞ্চি যে কতখানি সত্য তা ও একেবারে দেখতে পাচ্চে না, সেখানে যেন ফাঁকা আকাশ। সেই আকাশে প্রাণ নেই, ব্যথা নেই, কেবল শ্লোক আছে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

আমি বল্লুম, বল কি অমূল্য! আমাদের রায়মশায়ের যে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে—তার যে—

স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই এমন মানুষ এদেশে পাব কোথায়? দেখুন আমরা যাকে দয়া বলি সে কেবল নিজের পরেই দয়া,—পাছে নিজের দুর্ব্বল মনে ব্যথা লাগে সেই জন্যেই অন্যকে আঘাত করতে পারিনে—এই ত হল কাপুরুষতার চূড়ান্ত!

সন্দীপের মুখের বুলি বালকের মুখে শুনে বুক কেঁপে উঠ্‌ল। ও যে নিতান্ত কাঁচা, ভালোকে ভালো বলে বিশ্বাস করবারই যে ওর সময়। আহা ওর যে বাঁচবার বয়েস, বাড়বার বয়েস। আমার ভিতরে মা জেগে উঠল যে। নিজের দিক থেকে আমার ভালোও ছিল না মন্দও ছিল না, ছিল কেবল মরণ, মধুর রূপ ধরে'; কিন্তু যখন এই আঠারো বছরের ছেলে এমন অনায়াসে মনে করতে পারলে একজন বুড়ো মানুষকে বিনা দোষে মেরে ফেলাই ধর্ম্ম তখন আমার গা শিউরে উঠ্‌ল। যখন দেখতে পেলুম ওর মনে পাপ নেই তখন ওর এই কথার পাপ বড় ভয়ঙ্কর হয়ে আমার কাছে দেখা দিলে। যেন বাপ মায়ের অপরাধকে কচি ছেলের মধ্যে দেখ্‌তে পেলুম।

বিশ্বাসে উৎসাহে ভরা বড় বড় ঐ দুটি সরল চোখের দিকে চেয়ে আমার প্রাণের ভিতর কেমন করতে লাগ্‌ল। অজগর সাপের মুখের মধ্যে ঢুকতে চলেচে, এঁকে কে বাঁচাবে? আমার

দেশ কেন সত্যিকার মা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এই ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরচে না? কেন এ'কে বলচে না, ওরে বাছা, আমাকে তুই বাঁচিয়ে কি করবি, তোকে যদি বাঁচাতে না পারলুম?

জানি, জানি, পৃথিবীর বড় বড় প্রতাপ সয়তানের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেচে, কিন্তু মা যে আছে একলা দাঁড়িয়ে এই সয়তানের সমৃদ্ধিকে তুচ্ছ করবার জন্যে। মা ত কার্য্যসিদ্ধি চায় না, সে-সিদ্ধি যত বড় সিদ্ধিই হোক্, মা যে বাঁচাতে চায়! আজ আমার সমস্ত প্রাণ চাচ্চে এই ছেলেটিকে দুই হাতে টেনে ধরে বাঁচাবার জন্যে।

কিছু আগেই ওকে ডাকাতি করতে বলেছিলুম, এখন যত-বড় উল্টো কথাই বলি সেটাকে ও মেয়েমানুসের দুর্ব্বলতা বলে হাস্‌বে। মেয়েমানুষের দুর্ব্বলতাকে ওরা তখনি মাথা পেতে নেয় যখন সে পৃথিবী মজাতে বসে।

অমূল্যকে বল্লুম, যাও তোমাকে কিছু করতে হবে না—টাকা সংগ্রহ করবার ভার আমারই উপর।

যখন সে দরজা পর্য্যন্ত গেছে তাকে ডাক দিয়ে ফেরালুম বল্লুম,—অমূল্য, আমি তোমার দিদি। আজ ভাইফোঁটার পাঁজির তিথি নয়, কিন্তু ভাইফোঁটার আসল তিথি বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করচি ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে অমূল্য একটু থম্‌কে রইল। তার পরেই প্রণাম করে আমার পায়ের ধুলো নিলে। উঠে যখন দাঁড়াল তার চোখ ছলছল করচে। ভাই

আমার, আমি ত মরতেই বসেচি—তোমার সব বালাই নিয়ে যেন মরি—আমা হতে তোমার কোনো অপরাধ যেন না হয়।

অমূল্যকে বল্লুম, তোমার পিস্তলটি আমাকে প্রণামী দিতে হবে।

কি করবে দিদি?

মরণ প্র্যাক্‌টিস্‌ করব।

এই ত চাই দিদি, মেয়েদেরও মরতে হবে, মারতে হবে।—এই বলে অমূল্য পিস্তলটি আমার হাতে দিলে।

অমূল্য তার তরুণ মুখের দীপ্তি-রেখা আমার জীবনের মধ্যে নূতন উষার প্রথম অরুণ-লেখাটির মত এঁকে দিয়ে গেল। পিস্তলটাকে বুকের কাপড়ের ভিতর নিয়ে বল্লুম, এই রইল আমার উদ্ধারের শেষ সম্বল, আমার ভাইফোঁটার প্রণামী।

নারীর হৃদয়ে যেখানে মায়ের আসন আমার সেইখানকার জানলাটি হঠাৎ এই একবার খুলে গিয়েছিল। তখন মনে হল এখন থেকে বুঝি তবে খোলাই রইল।

কিন্তু শ্রেয়ের পথ আবার বন্ধ হয়ে গেল, প্রেয়সী নারী এসে মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলে।

পরের দিনে সন্দীপের সঙ্গে আবার দেখা। একটা উলঙ্গ পাগ্‌লামি আবার হৃৎপিণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য সুরু করে দিলে। কিন্তু এ কি এ! এই কি আমার স্বভাব! কখনোই না।

এই নির্লজ্জকে এই নিদারুণকে এর আগে কোনো দিন দেখি নি। সাপুড়ে হঠাৎ এসে এই সাপকে আমার আঁচলের ভিতর থেকে বের করে দেখিয়ে দিলে—কিন্তু কখনই এ আমার আঁচলের

মধ্যে ছিল না, এ ঐ সাপুড়েরই চাদরের ভিতরকার জিনিষ। অপদেবতা কেমন করে আমার উপর ভর করেচে—আজ আমি যা কিছু করচি সে আমার নয়, সে তারই লীলা।

সেই অপদেবতা একদিন রাঙা মশাল হাতে করে এসে আমাকে বল্লে, আমিই তোমার দেশ, আমিই তোমার সন্দীপ, আমার চেয়ে বড় তোমার আর-কিছুই নেই—বন্দেমাতরং। আমি হাত জোড় করে বল্লুম, তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই আমার স্বর্গ, আমার যা-কিছু-আছে সব তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দেব—বন্দেমাতরং।

পাঁচহাজার চাই? আচ্ছা পাঁচহাজারই নিয়ে যাব। কালই চাই? আচ্ছা কালই পাবে। কলঙ্কে দুঃসাহসে ঐ পাঁচহাজার টাকার দান মদের মত ফেনিয়ে উঠবে—তার পরে মাতালের উৎসব, —অচলা পৃথিবী পায়ের তলায় টলমল করতে থাক্‌বে, চোখের উপর আগুন ছুট্‌বে, কানের ভিতর ঝড়ের গর্জ্জন জাগ্‌বে, সামনে কি আছে কি নেই তা বুঝতেই পারব না,—তার পরে টল্‌তে টল্‌তে পড়ব গিয়ে মরণের মধ্যে—সমস্ত আগুন এক নিমিষে নিবে যাবে, সমস্ত ছাই হাওয়ায় উড়বে,—কিছুই আর বাকি থাক্‌বেনা।

টাকা কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে কথা এর আগে কোনো মতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না। সেদিন তীব্র উত্তেজনার আলোতে এই টাকাটা হঠাৎ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেলুম।

ফি-বছর আমার স্বামী পূজোর সময় তাঁর বড় ভাজ আর মেজ ভাজকে তিনহাজার টাকা করে' প্রণামী দিয়ে থাকেন। সেই টাকা বছরে বছরে তাঁদের নামে ব্যাঙ্কে জমা হয়ে সুদে

বাড়চে। এবারেও নিয়মমত প্রণামী দেওয়া হয়েচে, কিন্তু জানি টাকাটা এখনো ব্যাঙ্কে পাঠানো হয় নি। কোথায় আছে তাও আমার জানা। আমাদের শোবার ঘরের সংলগ্ন কাপড়-ছাড়বার ছোট কুঠরির কোণে লোহার সিন্দুক আছে তারই মধ্যে টাকাটা তোলা হয়েচে।

ফি-বছরে এই টাকা নিয়ে আমার স্বামী কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা দিতে যান এবারে তাঁর আর যাওয়া হল না। এই জন্যই ত দৈবকে মানি। ঐ টাকা দেশ নেবেন বলেই আটক আছে— এ টাকা ব্যাঙ্কে নিয়ে যায় সাধ্য কার? আর এই টাকা আমি না নিই এমন সাধ্যই বা আমার কই? প্রলয়ঙ্করী খর্পর বাড়িয়ে দিয়েচেন—বল্‌চেন, আমি ক্ষুধিত, আমাকে দে,—আমি আমার বুকের রক্ত দিলুম, ঐ পাঁচ হাজার টাকায়! মাগো, এই টাকা যার গেল তার সামান্যই ক্ষতি হবে—কিন্তু আমাকে এবার তুমি একেবারে ফতুর করে নিলে!

এর আগে কতদিন বড়রাণী মেজরাণীকে আমি মনে মনে চোর বলেচি—আমার বিশ্বাসপরায়ণ স্বামীকে ভুলিয়ে তারা ফাঁকি দিয়ে কেবল টাকা নিচ্চে, এই ছিল আমার নালিশ। তাঁদের স্বামীদের মৃত্যুর পরে অনেক সরকারী জিনিষপত্র তাঁরা লুকিয়ে সরিয়েছেন, এ কথা অনেকবার আমার স্বামীকে বলেচি। তিনি তার কোনো জবাব না করে চুপ করে থাক্‌তেন। তখন আমার রাগ হত, আমি বল্‌তুম, দান করতে হয়, হাতে তুলে দান কর, কিন্তু চুরি করতে দেবে কেন?—বিধাতা সেদিন আমার এই নালিশ শুনে মুচকে হেসেছিলেন—আজ আমি আমার স্বামীর

সিন্ধুক থেকে ঐ বড়রাণীর মেজরাণীর টাকা চুরি করতে চলেচি।

রাত্রে আমার স্বামী সেই ঘরেই তাঁর কাপড় ছাড়েন, সেই কাপড়ের পকেটেই তাঁর চাবি থাকে। সেই চাবি বের করে নিয়ে লোহার সিন্ধুক খুল্‌লুম। অল্প যে-একটু শব্দ হল, মনে হল সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল। হঠাৎ একটা শীতে আমার হাত পা হিম হয়ে বুকের মধ্যে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে থাক্‌ল।

লোহার সিন্ধুকের মধ্যে একটা টানা দেরাজ আছে। সেইটে খুলে দেখ্‌লুম নোট নেই, কাগজের মোড়কে ভাগ করা গিনি সাজানো। প্রতি মোড়কে কত গিনি আছে, আমার কত দরকার, সে তখন হিসেব করবার সময় নয়। কুড়িটি মোড়ক ছিল, সব কটা নিয়েই আমার আঁচলে বাঁধলুম।

কম ভারী নয়। চুরির ভারে আমার মন যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হয় ত নোটের তাড়া হলে সেটাকে এত বেশি চুরি বলে মনে হত না। এ যে সব সোনা।

সেই রাত্রে নিজের ঘরে যখন চোর হয়ে ঢুক্‌তে হল তখন থেকে এ ঘর আমার আর আপন রইল না। এ ঘরে আমার কত বড় অধিকার—চুরি করে সব খোয়ালুম।

মনে মনে জপ্‌তে লাগলুম, বন্দেমাতরং ; বন্দেমাতরং। দেশ, আমার দেশ, আমার সোনার দেশ। সব সোনা সেই দেশের সোনা, এ আর কারো নয়।

কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে মন যে দুর্ব্বল হয়ে থাকে। স্বামী পাশের ঘরে ঘুমচ্ছিলেন, চোখ বুজে তাঁর ঘরের ভিতর থেকে

বেরিয়ে গেলুম,—অন্তঃপুরের খোলা ছাদের উপর গিয়ে সেই আঁচলে-বাঁধা চুরির উপর বুক দিয়ে মাটিতে পড়ে রইলুম—সেই মোড়কগুলো বুকে বাজতে লাগল। নিস্তব্ধ রাত্রি আমার শিয়রের কাছে তর্জ্জনী তুলে রইল। ঘরকে ত আমি দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারলুম না। আজ ঘরকে লুটেচি, দেশকেই লুটেচি —এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না, দেশও হয়ে গেল পর। আমি যদি ভিক্ষে করে দেশের সেবা করতুম, এবং সেই সেবা সম্পূর্ণ না করেও মরে যেতুম, তবে সেই অসমাপ্ত সেবাই হত পূজো, দেবতা তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু চুরি ত পূজা নয়—এ জিনিষ কেমন করে দেশের হাতে তুলে দেব? চোরাই মালে দেশের ভরা ডোবাতে বসলুম গো! নিজে মরতে বসেচি কিন্তু দেশকে আঁকড়ে ধরে তাকে সুদ্ধ কেন অশুচি করি?

এ টাকা লোহার সিন্ধুকে ফেরবার পথ বন্ধ। আবার এই রাত্রে সেই ঘরে ফিরে গিয়ে সেই চাবি নিয়ে সেই সিন্ধুক খোলবার শক্তি আমার নেই। আমি তাহলে স্বামীর ঘরের চৌকাঠের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। এখন সামনে রাস্তা ছাড়া রাস্তাই নেই।

কত টাকা নিলুম তাই যে বসে বসে গুনব সে আমি লজ্জায় পারলুম না। ও যেমন ঢাকা আছে তেমনি ঢাকা থাক, চুরির হিসেব করব না।

শীতের অন্ধকার রাত্রে আকাশে একটুও বাষ্প ছিল না; সমস্ত তারাগুলি ঝকঝক্ করচে। আমি ছাদের উপর শুয়ে শুয়ে

ভাবছিলুম—দেশের নাম করে ঐ তারাগুলি যদি একটি-একটি মোহরের মত আমাকে চুরি করতে হত—অন্ধকারের বুকের মধ্যে সঞ্চিত ঐ তারাগুলি—তার পরদিন থেকে চিরকালের জন্য রাত্রি একেবারে বিধবা,—নিশীথের আকাশ একেবারে অন্ধ,—তাহলে সে চুরি যে সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি হত। আজ আমি এই যে চুরি করে আনলুম, এও ত টাকা চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মত—এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি,—বিশ্বাস চুরি, ধর্ম্ম চুরি!

ছাদের উপর পড়ে রাত্রি কেটে গেল। সকালে যখন বুঝলুম আমার স্বামী এতক্ষণে উঠে চলে গেছেন তখন সর্ব্বাঙ্গে শাল মুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চল্লুম। তখন মেজরাণী ঘটিতে করে' তাঁর বারান্দার টবের গাছ ক'টিতে জল দিচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—ওলো, ছোটরাণী, শুনেছিস্ খবর?

আমি চুপ করে দাঁড়ালুম, আমার বুকের মধ্যে কাঁপ্তে লাগ্ল—মনে হতে লাগ্ল, আঁচলে বাঁধা গিনিগুলো শালের ভিতর থেকে বড় বেশি উঁচু হয়ে আছে, মনে হল, এখনি আমার কাপড় ছিঁড়ে গিনিগুলো বারান্দাময় ঝন্‌ঝন্ করে ছড়িয়ে পড়বে, নিজের ঐশ্বর্য্য চুরি করে ফতুর হয়ে গেছে এমন চোর আজ এই বাড়ির দাসী চাকরদের কাছেও ধরা পড়ে যাবে।

মেজরাণী বল্লেন, তোদের দেবীচৌধুরাণীর দল ঠাকুরপোর তহবিল লুঠ করবে শাসিয়ে বেনামী চিঠি লিখেচে।

আমি চোরের মতই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আজ ঠাকুরপোকে বলছিলুম তোমার শরণাপন্ন হতে। দেবী প্রসন্ন হও গো, তোমার দলবল ঠেকাও। আমরা তোমার বন্দেমাতরমের সিন্নি মানৃচি। দেখতে দেখতে অনেক কাণ্ডই ত হল, এখন, দোহাই তোমার, ঘরে সিঁদটা ঘটতে দিয়ো না।

আমি কিছু না বলে' তাড়াতাড়ি আমার শোবার ঘরে চলে গেলুম। চোরা বালীতে পা দিয়ে ফেলেচি—আর ওঠবার জো নেই—এখন যত ছটফট করব ততই ডুবতে থাকব।

এ টাকাটা এক্ষণি আমার আঁচল থেকে খসিয়ে সন্দীপের হাতে দিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচি, এ বোঝা আমি আর বইতে পারিনে —আমার পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্চে।

সকালবেলাতেই খবর পেলুম সন্দীপ আমার জন্যে অপেক্ষা করচে। আজ আর আমার সাজসজ্জা ছিল না—শাল মুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলুম।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখি সন্দীপের সঙ্গে অমূল্য বসে আছে। মনে হল আমার মান সম্ভ্রম যা কিছু বাকি ছিল সমস্ত যেন ঝিম ঝিম করে আমার গা বেয়ে নেবে গিয়ে পায়ের তলা দিয়ে একেবারে মাটির মধ্যে চলে গেল। নারীর চরম অমর্য্যাদা ঐ বালকের সামনে আজ আমাকে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে হবে! আমার এই চুরির কথা এরা আজ দলের মধ্যে বসে আলোচনা করচে? এর উপরে অল্প একটুখানিও আব্রু রাখতে দেয় নি!

পুরুষমানুষকে আমরা বুঝব না। ওরা যখন ওদের উদ্দেশ্যের রথ টানবার পথ তৈরি করতে বসে তখন বিশ্বের হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে ভেঙে পথের খোয়া বিছিয়ে দিতে ওদের

একটুও বাধে না। ওরা নিজের হাতে সৃষ্টি করবার নেশায় যখন মেতে ওঠে তখন সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকে চুরমার করতেই ওদের আনন্দ। আমার এই মর্ম্মান্তিক লজ্জা ওদের চোখের কোণেও পড়বে না—প্রাণের পরে দরদ নেই ওদের—ওদের যত ব্যগ্রতা সব উদ্দেশ্যের দিকে! হায়রে, এদের কাছে আমি কেইবা! বন্যার মুখের কাছে একটা মেঠো ফুলের মত!

কিন্তু আমাকে এমন করে নিবিয়ে ফেলে সন্দীপের লাভ হল কি? এই পাঁচ হাজার টাকা? কিন্তু আমার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না কি? ছিল বই কি। সেই খবরই ত সন্দীপের কাছেই শুনেছিলুম—আর সেই শুনেই ত আমি সংসারের সমস্তকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলুম। আমি আলো দেব, আমি জীবন দেব, আমি শক্তি দেব, আমি অমৃত দেব, সেই বিশ্বাসে সেই আনন্দে দুই কূল ছাপিয়ে আমি বাহির হয়ে পড়েছিলুম। আমার সেই আনন্দকে যদি কেউ পূর্ণ করে তুল্‌ত তাহলে আমি মরে গিয়েও বাঁচতুম, আমার সমস্ত সংসার ভাসিয়ে দিয়েও আমার লোকসান হত না।

আজ কি এরা বল্‌তে চায় এ সমস্তই মিথ্যে কথা? আমার মধ্যে যে-দেবী আছে ভক্তকে বরাভয় দেবার শক্তি তার নেই? আমি যে স্তবগান শুনেছিলুম, যে-গান শুনে স্বর্গ হতে ধূলোয় নেমে এসেছিলুম, সে কি এই ধূলোকে স্বর্গ করবার জন্যে নয়, সে কি স্বর্গকেই মাটি করবার জন্যে?

সন্দীপ আমার মুখের দিকে তার তীব্র দৃষ্টি রেখে বল্লে, টাকা চাই, রাণী!

অমূল্য আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল,—সেই বালক,—সে আমার মায়ের গর্ভে জন্মায় নি বটে কিন্তু সে ত তার মায়ের গর্ভে জন্মেছিল—সেই মা, সে যে একই মা! আহা ঐ কচি মুখ, ঐ স্নিগ্ধ চোখ, ঐ তরুণ বয়েস! আমি মেয়েমানুষ, আমি ওর মায়ের জাত,—ও আমাকে বল্লে কিনা, আমার হাতে বিষ তুলে দাও —আর আমি ওর হাতে বিষই তুলে দেব!

টাকা চাই, রাণী!—রাগে লজ্জায় আমার ইচ্ছে হল সেই সোনার বোঝা সন্দীপের মাথার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমি কিছুতেই আঁচলের গিরে যেন খুলতে পারছিলুম না, থরথর করে আমার আঙুল-গুলো কাঁপতে লাগল। তারপর টেবিলের উপর সেই কাগজের মোড়কগুলো যখন পড়ল তখন সন্দীপের মুখ কালো হয়ে উঠল। সে নিশ্চয় ভাবলে ঐ মোড়কগুলোর মধ্যে আধুলি আছে। কি ঘৃণা! অক্ষমতার উপরে কি নিষ্ঠুর অবজ্ঞা! মনে হল ও যেন আমাকে মারতে পারে। সন্দীপ ভাবলে, আমি বুঝি ওর সঙ্গে দর করতে বসেচি—ওর পাঁচ হাজার টাকার দাবী দু তিনশো টাকা দিয়ে রফা করতে চাই। একবার মনে হল, এই মোড়কগুলো নিয়ে ও জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ও কি ভিক্ষুক? ও যে রাজা।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করলে, আর নেই, রাণীদিদি?

করুণায় ভরা তার গলা। আমার মনে হল আমি বুঝি চীৎকার করে কেঁদে উঠব। প্রাণপণে হৃদয়কে যেন চেপে ধরে' একটু কেবল ঘাড় নাড়লুম। সন্দীপ চুপ করে রইল—মোড়কগুলো ছুঁলেও না, একটা কথাও বল্লে না।

চলে যাব ভাবচি কিন্তু কিছুতে আমার পা চলচে না—পৃথিবী

ছু-ফাঁক হয়ে আমাকে যদি টেনে নিত তাহলেই এই মাটির পিণ্ড মাটির মধ্যে আশ্রয় পেয়ে বাঁচত।

আমার অপমান ঐ বালকের বুকে গিয়ে বাজল। সে হঠাৎ খুব একটা আনন্দের ভান করে বলে উঠল—এই কম কি! এতেই ঢের হবে! তুমি আমাদের বাঁচিয়েচ রাণীদিদি!

বলেই সে একটা মোড়ক খুলে ফেল্লে—গিনিগুলো ঝক্‌ঝক্ করে উঠল।

এক মুহূর্ত্তে সন্দীপের মুখের যেন একটা কালো মোড়ক খুলে গেল। তারও মুখ চোখ আনন্দে ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল। মনের ভিতরকার এই হঠাৎ উল্‌টো হাওয়ার দমকা সাম্‌লাতে না পেরে সে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এল। কি তার মৎলব ছিল জানিনে। আমি বিদ্যুতের মত অমূল্যের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলুম—হঠাৎ একটা চাবুক খেয়ে তার মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে সন্দীপকে ঠেলা দিলুম। পাথরের টেবিলের উপর মাথাটা তার ঠক্ করে ঠেকল, তার পরে সেখান থেকে সে মাটিতে পড়ে গেল,—কিছুক্ষণ তার আর সাড়া রইল না। এই প্রবল চেষ্টার পরে আমার শরীরে আর একটুও বল ছিল না—আমি চৌকির উপরে বসে পড়লুম। অমূল্যের মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল—সে সন্দীপের দিকে ফিরেও তাকালে না—আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমার পায়ের কাছে বসল। ওরে ভাই, ওরে বাছা, তোর এই শ্রদ্ধাটুকু আজ আমার শূন্য বিশ্বপাত্রের শেষ সুধাবিন্দু। আর আমি পারলুম না—আমার কান্না ভেঙে পড়ল। আমি দুই

হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। মাঝে মাঝে আমার পায়ের উপর অমূল্যর করুণ হাতের স্পর্শ যতই পাই আমার কান্না ততই ফেটে পড়তে চায়।

খানিকক্ষণ পরে সাম্‌লে উঠে চোখ খুলে দেখি যেন একেবারে কিছুই হয়নি এমনি ভাবে সন্দীপ টেবিলের কাছে বসে গিনিগুলো রুমালে বাঁধচে। অমূল্য আমার পায়ের কাছ থেকে উঠে দাঁড়াল —ছল্‌ছল্‌ করচে তার চোখ।

সন্দীপ অসঙ্কোচে আমাদের মুখের দিকে চোখ তুলে বল্লে, ছ হাজার টাকা।

অমূল্য বল্লে, এত টাকা ত আমাদের দরকার নেই সন্দীপ বাবু। হিসেব করে দেখেচি সাড়ে তিন হাজার টাকা হলেই আমাদের এখনকার কাজ উদ্ধার হবে।

সন্দীপ বল্লে, আমাদের কাজ ত কেবলমাত্র এখনকার কাজই নয়। আমাদের যা দরকার তার কি সংখ্যা আছে?

অমূল্য বল্লে, তা হোক্, ভবিষ্যতে যা দরকার হবে তার জন্যে আমি দায়ী—আপনি ঐ আড়াই হাজার টাকা রাণীদিদিকে ফিরিয়ে দিন।

সন্দীপ আমার মুখের দিকে চাইলে। আমি বলে উঠলুম, না, না, ও-টাকা আমি আর ছুঁতেও চাইনে। ও নিয়ে তোমাদের যা-খুসী তাই কর।

সন্দীপ অমূল্যর দিকে চেয়ে বল্লে, মেয়েরা যেমন করে দিতে পারে এমন কি পুরুষ পারে?

অমূল্য উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লে, মেয়েরা যে দেবী।

সন্দীপ বল্লে, আমরা পুরুষরা বড় জোর আমাদের শক্তিকে দিতে পারি, মেয়েরা যে আপনাকে দেয়। ওরা আপনার প্রাণের ভিতর থেকে সন্তানকে জন্ম দেয় পালন করে, বাহির থেকে নয়। এই দানই ত সত্য দান।

এই বলে সন্দীপ আমার দিকে চেয়ে বল্লে, রাণী, আজ তুমি যা দিলে এ যদি কেবলমাত্র টাকা হত তাহলে আমি এ ছুঁতুম না, তুমি আপনার প্রাণের চেয়ে বড় জিনিষ দিয়েচ।

মানুষের বোধ হয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্চে, কিন্তু আমার আরেকটা বুদ্ধি ভোলে। সন্দীপের চরিত্র নেই, সন্দীপের শক্তি আছে। সেই জন্যে ও যে-মুহূর্ত্তে প্রাণকে জাগিয়ে তোলে সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যুবাণও মারে। দেবতার অক্ষয় তূণ ওর হাতে আছে কিন্তু তূণের মধ্যে দানবের অস্ত্র।

সন্দীপের রুমালে সব গিনি ধরছিল না, সে বল্লে, রাণী তোমার একখানি রুমাল আমাকে দিতে পার?

আমি রুমাল বের করে দিতেই সেই রুমালটি নিয়ে সে মাথায় ঠেকালে, তার পরেই হঠাৎ আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে' আমাকে প্রণাম করে বল্লে, দেবী তোমাকে এই প্রণামটি দেবার জন্যেই ছুটে এসেছিলুম, তুমি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তোমার ঐ ধাক্কাই আমার বর। ঐ ধাক্কা আমি মাথায় করে নিয়েছি।—বলে' মাথায় যেখানে লেগেছিল সেইখানটা আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি কি সত্যি ভুল বুঝেছিলুম? সন্দীপ কি দুই হাত বাড়িয়ে

দিয়ে তখন আমাকে প্রণাম করতেই এসেছিল, তার মুখে চোখে হঠাৎ যে মত্ততা ফেনিয়ে উঠল, সে ত, মনে হল, অমূল্যও দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু স্তবগানে সন্দীপ এমন আশ্চর্য্য সুর লাগাতে জানে যে, তর্ক করতে পারিনে, সত্য দেখবার চোখ যেন কোন্ আফিমের নেশায় বুজে আসে। সন্দীপকে আমি যে-আঘাত করেছি সে-আঘাত সে আমাকে দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিলে, তার মাথার ক্ষত আমার বুকের ভিতরে রক্তপাত করতে লাগল।—সন্দীপের প্রণাম যখন পেলুম আমার চুরি তখন মহিমান্বিত হয়ে উঠল। টেবিলের উপরকার গিনিগুলি সমস্ত লোকনিন্দাকে ধর্ম্মবুদ্ধির সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা করে ঝক্‌ঝক করে হাস্‌তে লাগল।

আমারি মত অমূল্যেরও মন ভুলে গেল। ক্ষণকালের জন্যে সন্দীপের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা প্রতিরুদ্ধ হয়েছিল সে আবার বাধা-মুক্ত হয়ে উছলে উঠল, আমার পূজায় এবং সন্দীপের পূজায় তার হৃদয়ের পুষ্পপাত্রটি পূর্ণ হয়ে গেল—সরল বিশ্বাসের কি স্নিগ্ধসুধা ভোরবেলাকার শুকতারার আলোটির মত তার চোখ থেকে বিকীর্ণ হতে লাগল! আমি পূজা দিলেম, আমি পূজা পেলেম, আমার পাপ জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠল। অমূল্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বল্লে, বন্দেমাতরং।

কিন্তু স্তবের বাণী ত সব সময়ে শুনতে পাইনে। নিজের মনের ভিতর থেকে নিজের পরে নিজের শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখবার সম্বল আমার যে কিছুই নেই। আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারিনে। সেই লোহার সিন্দুক আমার দিকে ভ্রূকুটি করে থাকে, আমাদের পালঙ্ক আমার দিকে যেন একটা নিষেধের হাত বাড়ায়।

আপনার ভিতরে আপনার এই অপমান থেকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে—কেবলি মনে হয় সন্দীপের কাছে গিয়ে আপনার স্তব শুনিগে। আমার অতলস্পর্শ গ্লানির গহ্বর থেকে জগতে সেই একটুমাত্র পূজার বেদী জেগে আছে—সেখান থেকে যেখানেই পা বাড়াই সেখানেই শূন্য। তাই দিনরাত্রি ঐ বেদী আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই। স্তব চাই, স্তব চাই, দিনরাত্রি স্তব চাই,—ঐ মদের পেয়ালা একটুমাত্র খালি হতে থাক্‌লেই আমি আর বাঁচিনে। তাই সমস্ত দিনই সন্দীপের কাছে গিয়ে তার কথা শোন্‌বার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদচে—আমার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পাবার জন্যে আজ পৃথিবীর মধ্যে সন্দীপকে আমার এত দরকার!

আমার স্বামী দুপুরবেলা যখন খেতে আসেন আমি তাঁর সামনে বস্‌তে পারিনে—অথচ না-বসাটা এতই বেশি লজ্জা যে, সেও আমি পারিনে—আমি তাঁর একটু পিছনের দিকে এমন করে বসি যে, তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি ঘটে না। সেদিন তেম্‌নি করে বসে আছি তিনি খাচ্চেন এমন সময় মেজরাণী এসে বস্‌লেন, বল্লেন, ঠাকুরপো, তুমি ঐ সব ডাকাতির শাসানি-চিঠি হেসে উড়িয়ে দাও কিন্তু আমার ভয় হয়। আমাদের এবারকার প্রণামীর টাকাটা তুমি এখনো ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দাওনি?

আমার স্বামী বল্লেন, না, সময় পাইনি।

মেজরাণী বল্লেন, দেখ ভাই, তুমি বড় অসাবধান, ও টাকাটা—

স্বামী হেসে বল্লেন, সে যে আমার শোবার ঘরের পাশের ঘরে লোহার সিন্দুকে আছে!

যদি সেখান থেকে নেয় বলা যায় কি?

আমার ও ঘরেও যদি চোর ঢোকে তাহলে কোন্‌দিন তোমাকেও চুরি হতে পারে!

ওগো আমাকে কেউ নেবে না, ভয় নেই তোমার। নেবার মত জিনিষ তোমার আপনার ঘরেই আছে। না ভাই, ঠাট্টা না, তুমি ঘরে টাকা রেখো না।

সদর খাজনা চালান যেতে আর দিন-পাঁচেক আছে সেই সঙ্গেই ও টাকাটা আমি কলকাতার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব।

দেখো ভাই ভুলে বোসো না, তোমার যে-রকম ভোলামন কিছুই বলা যায় না।

এ ঘর থেকে যদি টাকা চুরি যায় তাহলে আমারি টাকা চুরি যাবে তোমার কেন যাবে বউরাণী?

ঠাকুরপো, তোমার ঐ সব কথা শুন্‌লে আমার গায়ে জ্বর আসে। আমি কি আমার-তোমার ভেদ করে কথা কচ্চি? তোমারি যদি চুরি যায় সে কি আমাকে বাজ্‌বে না? পোড়া বিধাতা সব কেড়ে নিয়ে আমার যে লক্ষ্মণ দেওরটি রেখেচেন তার মূল্য বুঝি আমি বুঝিনে? আমি ভাই তোমাদের বড়রাণীর মত দিনরাত্রি দেবতা নিয়ে ভুলে থাকতে পারিনে, দেবতা আমাকে যা দিয়েচেন সেই আমার দেবতার চেয়েও বেশি। কি লো ছোটরাণী, তুই যে একেবারে কাঠের পুতুলের মত চুপ করে রইলি? জান ভাই ঠাকুরপো, ছোটরাণী মনে ভাবে আমি তোমাকে খোষামোদ করি। তা তেমন দায়ে পড়লে খোষামোদই করতে হত। কিন্তু তুমি কি আমাদের তেমনি দেওর যে খোষামোদের অপেক্ষা রাখ? যদি হতে ঐ মাধব চক্রবর্ত্তীর মত, তাহলে আমাদের বড়রাণীরও দেবসেবা আজ ঘুচে

যেত, আধপয়সাটির জন্তে তোমার হাতে পায়ে ধরাধরি করেই দিন কাটুত। তাও বলি, তাহলে ওর উপকার হত, বানিয়ে বানিয়ে তোমার নিন্দে করবার এত সময় পেত না।

এমনি করে মেজরাণী অনর্গল বকে যেতে লাগ্লেন, তারি মাঝে মাঝে ছেঁচকিটা, ঘণ্টটা, চিংড়িমাছের মুড়োটার প্রতিও ঠাকুরপোর মনোযোগ আকর্ষণ করা চল্‌তে থাক্‌ল। আমার তখন মাথা ঘুরচে। আর ত সময় নেই, এখনি একটা উপায় করতে হবে,—কি হতে পারে, কি করা যেতে পারে এই কথা যখন বারবার মনকে জিজ্ঞাসা করচি তখন মেজরাণীর বকুনি আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হতে লাগল। বিশেষত আমি জানি মেজরাণীর চোখে কিছুই এড়ায় না—তিনি ক্ষণে ক্ষণে আমার মুখের দিকে চাচ্ছিলেন, কি দেখছিলেন জানিনে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আমার মুখে সমস্ত কথাই যেন স্পষ্ট ধরা পড়ছিল।

দুঃসাহসের অন্ত নেই—আমি যেন নিতান্ত সহজ কৌতুকে হেসে উঠলুম—বলে উঠলুম—আসল কথা, আমার পরেই মেজরাণীর যত অবিশ্বাস, চোর ডাকাত সমস্ত বাজে কথা!

মেজরাণী মুচ্‌কে হেসে বল্লেন—তা ঠিক বলেছিস্‌ লো, মেয়েমানুষের চুরি বড় সর্ব্বনেশে। তা আমার কাছে ধরা পড়ুতেই হবে, আমি ত আর পুরুষমানুষ নই। আমাকে ভোলাবি কি দিয়ে?

আমি বল্‌লুম, তোমার মনে এতই যদি ভয় থাকে তবে আমার যা-কিছু আছে তোমার কাছে না-হয় জামিন রাখি, যদি কিছু লোকসান করি ত কেটে নিয়ো।

মেজরাণী হেসে বল্লেন, শোনো একবার ছোটরাণীর কথা শোনো।

এমন লোকসান আছে যা ইহকাল পরকালে জামিন দিয়ে উদ্ধার হয় না।

আমাদের এই কথাবার্ত্তার মধ্যে আমার স্বামী একটি কথাও বল্লেন না। তাঁর খাওয়া হয়ে যেতেই তিনি বাইরে চলে গেলেন, আজকাল তিনি আর বিশ্রাম করতে ঘরের মধ্যে বসেন না।

আমার অধিকাংশ দামী গয়না ছিল খাতাঞ্চির জিম্মায়। তবু আমার নিজের কাছে যা ছিল তার দাম ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আমি সেই গয়নার বাক্স নিয়ে মেজরাণীর কাছে খুলে দিলুম, বল্লুম, মেজরাণী, আমার এই গয়না রইল তোমার কাছে। এখন থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার।

মেজরাণী গালে হাত দিয়ে বল্লেন, ওমা, তুই যে অবাক্ করলি! তুই কি সত্যি ভাবিস তুই আমার টাকা চুরি করবি এই ভয়ে রাত্রে আমার ঘুম হচ্চে না?

আমি বল্লুম, ভয় করতেই বা দোষ কি? সংসারে কে কাকে চেনে বল, মেজরাণী!

মেজরাণী বল্লেন, তাই আমাকে বিশ্বাস করে শিক্ষা দিতে এসেচ বুঝি? আমার নিজের গয়না কোথায় রাখি ঠিক নেই, তোমার গয়না পাহারা দিয়ে আমি মরি আর কি? চারদিকে দাসীচাকর ঘুরচে, তোমার ও গয়না তুমি নিয়ে যাও ভাই।

মেজরাণীর কাছ থেকে চলে এসেই বাইরে বৈঠকখানাঘরে অমূল্যকে ডেকে পাঠালুম। অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গে দেখি সন্দীপ এসে উপস্থিত। আমার তখন দেরী করবার সময় ছিল না, আমি

সন্দীপকে বল্লুম, অমূল্যর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা আছে আপনাকে একবার—

সন্দীপ কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্লে, অমূল্যকে আমার থেকে আলাদা করে দেখ না কি? তুমি যদি আমার কাছ থেকে ওকে ভাঙিয়ে নিতে চাও তাহলে আমি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না।

আমি এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দীপ বল্লে, আচ্ছা বেশ, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথা শেষ করে নিয়ে তার পরে আমার সঙ্গেও একটু বিশেষ কথা কবার অবসর দিতে হবে কিন্তু, নইলে আমার হার হবে; আমি সব মানতে পারি হার মান্‌তে পারিনে। আমার ভাগ সকলের ভাগের বেশি। এই নিয়ে চিরজীবন বিধাতার সঙ্গে লড়চি। বিধাতাকে হারাব, আমি হারব না।

তীব্রকটাক্ষে অমূল্যকে আঘাত করে সন্দীপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অমূল্যকে বল্লুম, লক্ষ্মী ভাই আমার, তোমাকে আমার একটি কাজ করে দিতে হবে।

সে বল্লে, তুমি যা বল্‌বে আমি প্রাণ দিয়ে করব দিদি।

শালের ভিতর থেকে গয়নার বাক্স বের করে তার সাম্‌নে রেখে বল্লুম, আমার এই গয়না বন্ধক দিয়ে হোক্ বিক্রী করে হোক্ আমাকে ছ হাজার টাকা যত শীঘ্র পার এনে দিতে হবে।

অমূল্য ব্যথিত হয়ে বলে উঠল, না দিদি না, গয়না বিক্রী বন্ধক না, আমি তোমাকে ছ হাজার টাকা এনে দেব।

আমি বিরক্ত হয়ে বল্লুম, ওসব কথা রাখ,—আমার আর একটুও সময় নেই। এই নিয়ে যাও গয়নার বাক্স,—আজ রাত্রের

ট্রেনেই কলকাতায় যাও, পর্শুর মধ্যে ছ হাজার টাকা আমাকে এনে দিতে হবে।

অমূল্য বাক্সের ভিতর থেকে হীরের চিকটা আলোতে তুলে ধরে আবার বিষণ্ণ মুখে রেখে দিলে। আমি বল্লুম, এই সব হীরের গয়না ঠিক দামে সহজে বিক্রী হবে না, সেই জন্যে আমি তোমাকে যে গয়না দিচ্চি এর দাম ত্রিশ হাজারেরও বেশি হবে। এ সবই যদি যায় সেও ভালো—কিন্তু ছ হাজার টাকা আমার নিশ্চয়ই চাই।

অমূল্য বল্লে, দেখ দিদি, তোমার কাছ থেকে এই যে ছ হাজার টাকা নিয়েচেন সন্দীপবাবু, এর জন্যে আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেচি। বলতে পারিনে এ কি লজ্জা! সন্দীপবাবু বলেন দেশের জন্যে লজ্জা বিসর্জ্জন করতে হবে। তা হয় ত হবে। কিন্তু এ যেন একটু আলাদা কথা,—দেশের জন্যে মরতে ভয় করিনে, মারতে দয়া করিনে এই শক্তি পেয়েচি, কিন্তু তোমার হাত থেকে এই টাকা নেওয়ার গ্লানি কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারচিনে। এইখানে সন্দীপবাবু আমার চেয়ে অনেক শক্ত—ওঁর একতিলও ক্ষোভ নেই। উনি বলেন টাকা যার বাক্সে ছিল টাকা যে সত্যি তারই এই মোহটা কাটানো চাই—নইলে বন্দেমাতরং মন্ত্র কিসের!

বলতে বলতে অমূল্য উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগল। আমাকে শ্রোতা পেলে ওর এই সব কথা বলবার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। ও বলতে লাগল, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেচেন, আত্মাকে ত কেউ মারতে পারে না। কাউকে বধ করা ও একটা কথা মাত্র। টাকা হরণ করাও সেই রকম একটা কথা। টাকা কার?

ওকে কেউ সৃষ্টি করে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ও ত কারো আত্মার অঙ্গ নয়। ও আজ আমার, কাল আমার ছেলের, আর-একদিন আমার মহাজনের। সেই চঞ্চল টাকা যখন ত্বত্ত কারোই নয় তখন তোমার অকর্ম্মণ্য ছেলের হাতে না পড়ে' দেশসেবকদের সেবায় যদি লাগে তাহলে তাকে নিন্দা করলেই সে কি নিন্দিত হবে?

সন্দীপের মুখের কথা যখন এই বালকের মুখে শুনি তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকে। যারা সাপুড়ে তারা বাঁশি বাজিয়ে সাপ নিয়ে খেলুক, মরতে যদি হয় তারা জেনেশুনে মরুক। কিন্তু আহা এরা যে কাঁচা, সমস্ত বিশ্বের আশীর্ব্বাদ এদের যে নিয়ত রক্ষা করতে চায়, এরা সাপকে সাপ না জেনে হাস্‌তে হাস্‌তে তার সঙ্গে খেলা করতে যখন হাত বাড়ায় তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি এই সাপটা কি ভয়ঙ্কর অভিশাপ! সন্দীপ ঠিকই বুঝেচে— আমি নিজে তার হাতে মরতে পারি কিন্তু এই ছেলেটিকে তার হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আমি বাঁচাব।

আমি একটু হেসে অমূল্যকে বল্লুম, তোমাদের দেশসেবকদের সেবার জন্যেও টাকার দরকার আছে বুঝি?

অমূল্য সগর্ব্বে মাথা তুলে বল্লে—আছে বই কি। তারাই যে আমাদের রাজা, দারিদ্র্যে তাদের শক্তি ক্ষয় হয়। আপনি জানেন, সন্দীপ বাবুকে ফাষ্টক্লাস ছাড়া অন্য গাড়িতে কখনো চড়তে দিই নে। রাজভোগে তিনি কখনো লেশমাত্র সঙ্কুচিত হন না—তাঁর এই মর্য্যাদা তাঁকে রাখতে হয় তাঁর নিজের জন্যে নয়, আমাদের সকলের জন্যে। সন্দীপবাবু বলেন সংসারে যারা ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্যের সম্মোহনই

হচ্চে তাদের সব চেয়ে বড় অস্ত্র। দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে দুঃখগ্রহণ করা নয় সে হচ্চে আত্মঘাত।

এমন সময় নিঃশব্দে সন্দীপ হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমি তাড়াতাড়ি আমার গয়নার বাক্সর উপর শাল চাপা দিলুম। সন্দীপ বাঁকাসুরে জিজ্ঞাসা করলে, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথার পালা এখনো ফুরোয় নি বুঝি?

অমূল্য একটু লজ্জিত হয়ে বল্লে, না, আমাদের কথা হয়ে গেছে। বিশেষ কিছু না।

আমি বল্লুম, না অমূল্য, এখনো হয় নি।

সন্দীপ বল্লে, তাহলে দ্বিতীয়বার সন্দীপের প্রস্থান?

আমি বল্লুম, হাঁ।

তাহলে সন্দীপকুমারের পুনঃপ্রবেশ—

সে আজ নয়—আমার সময় হবে না।

সন্দীপের চোখ দুটো জ্বলে উঠল,—বল্লে, কেবল বিশেষ কাজেরই সময় আছে, আর সময় নষ্ট করবার সময় নেই?

ঈর্ষা! প্রবল যেখানে দুর্ব্বল সেখানে অবলা আপনার জয়ডঙ্কা না বাজিয়ে থাক্‌তে পারে কি? আমি তাই খুব দৃঢ়স্বরেই বল্লুম, না, আমার সময় নেই।

সন্দীপ মুখ কালী করে চলে গেল। অমূল্য কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে বল্লে, রাণীদিদি, সন্দীপবাবু বিরক্ত হয়েচেন।

আমি তেজের সঙ্গে বল্লুম, বিরক্ত হবার ওঁর কারণও নেই, অধিকারও নেই। একটি কথা তোমাকে বলে রাখি অমূল্য, আমার এই গয়না বিক্রীর কথা তুমি প্রাণান্তেও সন্দীপবাবুকে বল্‌তে পারবে না।

অমূল্য বল্লে, না, বল্‌ব না।

তাহলে আর দেরি কোরো না, আজ রাত্রের গাড়িতেই তুমি চলে যাও।

এই বলে অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। বাইরে এসে দেখি, বারান্দায় সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলুম এখনি সে অমূল্যকে ধরবে। সেইটে বাঁচাবার জন্যে তাঁকে ডাকতে হল— সন্দীপবাবু, কি বল্‌তে চাচ্ছিলেন?

আমার কথা ত বিশেষ কথা নয়, কেবল বাজে কথা, সময় যখন নেই তখন—

আমি বল্‌লুম, আছে সময়।

অমূল্য চলে গেল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বল্লেন, অমূল্যর হাতে একটা কি বাক্স দিলেন ওটা কিসের বাক্স?

বাক্সটা সন্দীপের চোখ এড়াতে পারেনি। আমি একটু শক্ত করেই বল্‌লুম, আপনাকে যদি বলবার হত তাহলে আপনার সামনেই দিতুম।

তুমি কি ভাবচ অমূল্য আমাকে বল্‌বে না?

না বল্‌বে না।

সন্দীপের রাগ আর চাপা রইল না, একেবারে আগুন হয়ে উঠে বল্লে, তুমি মনে করচ তুমি আমার উপর প্রভুত্ব করবে, পারবে না। ঐ অমূল্য, ওকে যদি আমার পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিই তাহলে সেই ওর সুখের মরণ হয়, ওকে তুমি তোমার পদানত করবে, আমি থাকতে সে হবে না।

দুর্ব্বল, দুর্ব্বল! এতদিন পরে সন্দীপ বুঝতে পেরেছে ও

আমার কাছে দুর্ব্বল। তাই হঠাৎ এই অসংযত রাগ। ও বুঝতে পেরেচে আমার যে শক্তি আছে তার সঙ্গে জোর-জবরদস্তি খাটবে না;—আমার কটাক্ষের ঘায়ে ওর দুর্গের প্রাচীর আমি ভেঙে দিতে পারি। সেই জন্যই আজ এই আস্ফালন। আমি একটি কথা না বলে একটুখানি কেবল হাস্‌লুম। এতদিন পরে আমি ওর উপরের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েচি—আমার এ জায়গাটুকু যেন না হারায়, যেন না নাবি। আমার দুর্গতির মধ্যেও যেন আমার মান একটু থাকে!

সন্দীপ বল্লে, আমি জানি তোমার ও-বাক্স গয়নার বাক্স।

আমি বল্লুম, আপনি যেমন-খুসি আন্দাজ করুন আমি বলব না।

তুমি অমূল্যকে আমার চেয়ে বেশী বিশ্বাস কর? জান, ঐ বালক আমার ছায়ার ছায়া, আমার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি, আমার পাশের থেকে সরে গেলে ও কিছুই নয়!

যেখানে ও তোমার প্রতিধ্বনি নয় সেইখানে ও অমূল্য, সেইখানে আমি ওকে তোমার প্রতিধ্বনির চেয়ে বিশ্বাস করি।

মায়ের পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার সমস্ত গয়না আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত আছ সে কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না। সে তোমার দেওয়াই হয়ে গেছে।

দেবতা যদি আমার কোনো গয়না বাকি রাখেন তাহলে সেই গয়না দেবতাকে দেব। আমার যে গয়না চুরি যায় সে গয়না দেব কেমন করে?

দেখ, তুমি আমার কাছ থেকে অমন-করে ফস্‌কে যাবার

চেষ্টা কোরো না। এখন আমার কাজ আছে, সেই কাজ আগে হয়ে যাক্ তার পরে তোমাদের ঐ মেয়েলি ছলাকলা বিস্তারের সময় হবে। তখন সেই লীলায় আমিও যোগ দেব।

যে-মুহূর্ত্তে আমি আমার স্বামীর টাকা চুরি করে সন্দীপের হাতে দিয়েচি সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আমাদের সম্বন্ধের ভিতরকার সুরটুকু চলে গেছে। কেবল যে আমারি সমস্ত মূল্য ঘুচিয়ে দিয়ে আমি কানাকড়ার মত সস্তা হয়ে গেছি তা নয়—আমার পরে সন্দীপেরও শক্তি ভালো করে খেলবার আর জায়গা পাচ্চে না,---মুঠোর মধ্যে যা এসে পড়ে তার উপর আর তীর মারা চলে না। সেই জন্যে সন্দীপের আজ আর সেই বীরের মূর্ত্তি নেই। ওর কথার মধ্যে কলহের কর্কশ ইতর আওয়াজ লাগচে।

সন্দীপ আমার মুখের উপর তার উজ্জ্বল চোখ দুটো তুলে বসে রইল, দেখতে দেখতে তার চোখ যেন মধ্যাহ্ন আকাশের তৃষ্ণার মত জ্বলে উঠতে লাগল। তার পা দুই-একবার চঞ্চল হয়ে উঠল—বুঝতে পারলুম সে উঠি-উঠি করচে—এখনি সে উঠে এসে আমাকে চেপে ধরবে। আমার বুকের ভিতরে দুল্‌তে লাগল—সমস্ত শরীরের শির দব্‌দব্ করচে, কানের মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করচে, বুঝলুম আর-একটু বসে থাকলে আমি আর উঠতে পারবো না। প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে চৌকি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে উঠেই দরজার দিকে ছুটলুম। সন্দীপের রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠের মধ্যে থেকে গুমরে উঠলো—কোথায় পালাও রাণী?

পরক্ষণেই সে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে ধরতে এল। এমন সময় বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যেতেই সন্দীপ তাড়াতাড়ি চৌকিতে

ফিরে এসে বস্‌ল। আমি বইয়ের শেল্‌ফের দিকে মুখ করে বইগুলোর নামের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আমার স্বামী ঘরে ঢোকবামাত্রই সন্দীপ বলে উঠ্‌ল, ওহে নিখিল, তোমার শেল্‌ফে ব্রাউনিং নেই? আমি মক্ষিরাণীকে আমাদের সেই কলেজ-ক্লাবের কথা বলছিলুম—মনে আছে ত ব্রাউনিঙের সেই কবিতাটা তর্জ্জমা নিয়ে আমাদের চার জনের মধ্যে লড়াই? বল কি, মনে নেই! সেই যে—

She should never have looked at me,
If she meant I should not love her!
There are plenty…men you call such,
I suppose…she may discover
All her soul to, if she pleases,
And yet leave much as she found them:
But I'm not so, and she knew it
When she fixed me, glancing round them.

আমি হিঁচ্‌ড়ে-মিচ্‌ড়ে তার একটা বাংলা করেছিলুম কিন্তু সেটা এমন হল না "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" এক সময়ে ঠাউরেছিলুম, কবি হলেম বুঝি, আর দেরি নেই,—বিধাতা দয়া করে আমার সে ফাঁড়া কাটিয়ে দিলেন —কিন্তু আমাদের দক্ষিণাচরণ, সে যদি আজ নিমক-মহালের ইনস্পেক্টর না হত তাহলে নিশ্চয় কবি হতে পারত; সে খাসা তর্জ্জমাটি করেছিল—পড়ে মনে হয় ঠিক যেন বাংলা ভাষা পড়ছি, যে দেশ জিয়োগ্রাফিতে নেই এমন কোনো দেশের ভাষা নয়—

আমায় ভালো বাস্‌বেনা সে এই যদি তার ছিল জানা
তবে কি তার উচিত ছিল আমার পানে দৃষ্টি হানা ?
তেমন-তেমন অনেক মানুষ আছে ত এই ধরাধামে
(যদি চ ভাই আমি তাদের গণিনেক মানুষ নামে)—
যাদের কাছে সে যদি তার খুলে দিত প্রাণের ঢাকা,
তবু তারা রইত খাড়া যেমন ছিল তেমনি ফাঁকা।
আমি ত নই তাদের মতন সে কথা সে জানত মনে
যখন মোরে বাঁধলো ধরে বিদ্ধ করে নয়ন কোণে।

না মক্ষিরাণী তুমি মিথ্যে খুঁজচ—নিখিল বিবাহের পর থেকে কবিতা পড়া একেবারে ছেড়ে দিয়েচে, বোধ হয় ওর আর দরকার হয় না। আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম কাজের তাড়ায়, কিন্তু বোধ হচ্চে যেন কাব্যজ্বরো মনুষ্যানাং আমাকে ধরবে-ধরবে করচে!

আমার স্বামী বল্লেন, আমি তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেচি সন্দীপ।

সন্দীপ বল্লে, কাব্যজ্বর সম্বন্ধে ?

স্বামী ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে বল্লেন, কিছুদিন ধরে ঢাকা থেকে মৌলবী আনাগোনা করতে আরম্ভ করচে—এ অঞ্চলের মুসলমানদের ভিতরে-ভিতরে ক্ষেপিয়ে তোল্‌বার উদ্যোগ চলেচে। তোমার উপর ওরা বিরক্ত হয়ে আছে, হঠাৎ একটা-কিছু উৎপাত করতে পারে।

পালাতে পরামর্শ দাও নাকি ?

আমি খবর দিতে এসেচি পরামর্শ দিতে চাইনে।

আমি যদি এখানকার জমিদার হতুম তাহলে ভাবনার কথা হত

মুসলমানদেরই, আমার নয়। তুমি আমাকেই উদ্বিগ্ন করে না তুলে ওদের দিকে যদি একটু উদ্বেগের চাপ দাও তাহলে সেটা তোমার এবং আমার উভয়েরই যোগ্য হয়। জান, তোমার দুর্ব্বলতায় পাশের জমিদারদের পর্য্যন্ত তুমি দুর্ব্বল করে তুলেচ?

সন্দীপ, আমি তোমাকে পরামর্শ দিই নি, তুমিও আমাকে পরামর্শ না দিলে চলত। ওটা বৃথা হচ্চে। আর একটি কথা আমার বলবার আছে। তোমরা কিছুদিন থেকে দলবল নিয়ে আমার প্রজাদের পরে ভিতরে ভিতরে উৎপাত করেচ। আর চলবে না, এখন তোমাকে আমার এলেকা ছেড়ে চলে যেতে হচ্চে।

মুসলমানের ভয়ে, না, আরো কোনো ভয় আছে?

এমন ভয় আছে যে ভয় না থাকাই কাপুরুষতা—আমি সেই ভয় থেকেই বলচি তোমাকে যেতে হবে সন্দীপ। আর দিন পাঁচেক পরে আমি কলকাতায় যাচ্চি সেই সময় তোমারও আমার সঙ্গে যাওয়া চাই। আমাদের কলকাতার বাড়িতে থাকতে পার তাতে কোনো বাধা নেই।

আচ্ছা, পাঁচদিন ভাববার সময় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে মক্ষিরাণী, তোমার মৌচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জন গান করে নেওয়া যাক্। হে আধুনিক বাংলার কবি, খোলো তোমার দ্বার, তোমার বাণী লুঠ করে নিই,—চুরি তোমারই—তুমি আমারই গানকে তোমার গান করেচ—না-হয় নাম তোমার হল কিন্তু গান আমার।

এই বলে তার বেসুর-ঘেঁষা মোটা ভাঙা গলায় ভৈরবীতে গান ধরলে,—

মধুঋতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে।
যাওয়া-আসার কান্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে।

যায় যে জনা সেই সুধু যায়, ফুল ফোটা ত ফুরোয় না হায়,
ঝরবে যে ফুল সেই কেবলি ঝরে পড়ে বেলাশেষে।
যখন আমি ছিলেম কাছে তখন কত দিয়েছি গান ;
এখন আমার দূরে যাওয়া এরো কিগো নাই কোনো দান ?
পুষ্পবনের ছায়ায় ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে
আগুন-ভরা ফাগুনকে তোর কাঁদায় যেন আষাঢ় এসে ॥

সাহসের অন্ত নেই—সে সাহসের কোনো আবরণও নেই—একেবারে আগুনের মত নগ্ন। তাকে বাধা দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না,—তাকে নিষেধ করা যেন বজ্রকে নিষেধ করা, বিদ্যুৎ সে নিষেধ হেসে উড়িয়ে দেয়।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম। বাড়ির ভিতরের দিকে যখন চলে যাচ্চি হঠাৎ দেখি অমূল্য কোথা থেকে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। বল্লে, রাণীদিদি, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমি চল্‌লুম, কিছুতেই নিষ্ফল হয়ে ফিরব না।

আমি তার নিষ্ঠাপূর্ণ তরুণ মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লুম, অমূল্য, নিজের জন্য ভাব্‌ব না, যেন তোমাদের জন্যে ভাবতে পারি।

অমূল্য চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য তোমার মা আছেন ?

আছেন।

বোন ?

নেই, আমি মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা আমার অল্প বয়সে মারা গেছেন।

যাও তুমি, তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও, অমূল্য।

দিদি, আমি যে এখানে আমার মাকেও দেখচি আমার বোনকেও দেখচি।

আমি বল্লুম, অমূল্য, আজ রাত্রে যাবার আগে তুমি এখান থেকে খেয়ে যেয়ো।

সে বল্লে, সময় হবে না, দিদিরাণী, তোমার প্রসাদ আমার সঙ্গে দিয়ো আমি নিয়ে যাব।

তুমি কী খেতে ভালবাস অমূল্য ?

মায়ের কাছে থাকলে পৌষে পেট ভরে পিঠে খেতুম। ফিরে এসে তোমার হাতের তৈরী পিঠে খাব দিদিরাণী!

ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেক্‌স্‌পিয়র

(কবির মৃত্যুর তিনশো বছর পরের স্মৃতিবার্ষিক উপলক্ষ্যে)

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি'
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল অন্তরালে
বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠেনি জেগে কবিসূর্য্য-বন্দনা-সঙ্গীতে।
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি' শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছে দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া; তাই হের যুগান্তর-শেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিক্ষা বিস্তার

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবটিকে কাজে খাটাইবার জন্য দুইটি উপায় স্থির করা যাইতে পারে। প্রথম উপায়—মাতৃভাষায় সাহিত্যের পুষ্টি সাধনের জন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, কলাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ রচনা, যাহাতে মাতৃভাষার ভিতর দিয়াই এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা হইতে পারে। দ্বিতীয় উপায়—মাতৃভাষায় এই সকল বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা, যাহাতে ছাত্র ও অধ্যাপক দুজনেরই যথার্থ মানসিক বিকাশ হইতে পারে এবং উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে। বস্তুত এই দুইটি উপায়ের মধ্যেই একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। কারণ, সাহিত্য ছাড়া শিক্ষা হয় না এবং শিক্ষা ছাড়াও সাহিত্য হয় না।

ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, কোন দেশের প্রচলিত ভাষায় এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা দুইটি উপায়ের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ইস্কুল প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা। দ্বিতীয়ত, একাডেমি বা সোসাইটি বা পরিষদের দ্বারা। ইতালী দেশে Della Cruxa Academy, ফরাসীদেশে বহুসংখ্যক Academy, এবং জর্ম্মাণি ও রাশিয়াতে State University-র সাহায্যে সেই-সেই দেশের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর গ্রন্থ রচিত হইয়া একটা বড় রকমের সাহিত্য দাঁড়াইয়া গেছে। চীনদেশে ও জাপানে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এই কাজ অগ্রসর হইতেছে। আমাদের এই ভারতবর্ষে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরিয়েণ্টাল বিভাগে এবং বেনারস কলেজে

সংস্কৃত বিভাগের জন্য উচ্চ অঙ্গের দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় Locke-এর Human Understanding গ্রন্থের অনুবাদ আছে এবং পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে লজিক, ইতিহাস, অর্থনীতিশাস্ত্রের গ্রন্থাদিও দেশীয় ভাষায় তর্জ্জমা করা হইয়াছে। কিন্তু এই দুই বিভাগেই শিক্ষার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ থাকায়, ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় ইহাদিগকে হটিতে হইয়াছে। হিন্দী প্রচারিণী সভা হইতেও একটা পরিভাষা সংকলিত হইয়া ইউরোপীয় ভাষা হইতে নানা গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া সাহিত্য-পুষ্টির চেষ্টা হইয়াছে। গুজরাটী মারাঠী ভাষাতেও এইরূপ হইয়াছে। অর্থনীতি সম্বন্ধে নানাগ্রন্থ সে সকল ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এ কাজের প্রস্তাব অনেকবার উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সে প্রস্তাব কাজে পরিণত হয় নাই। কেবল ক্যাম্পবেল স্কুল, সার্ভে স্কুল ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য শারীর বিজ্ঞান, অস্থিতত্ত্ব, পাটীগণিত, বীজগণিত, জরীপ বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা ভাষায় কতক কতক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল শিক্ষা এখন আর মাতৃভাষায় হয় না, কিম্বা সে সকল শিক্ষার স্রোত রুদ্ধপ্রায়। তাহার একটা কারণ এই মনে হয় যে, এ সকল শিক্ষার সহিত উচ্চ বিজ্ঞানের শিক্ষা জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই; সেইজন্য ইহারা প্রাণ পাইতেছে না।

বাংলাদেশে শিক্ষার ভিতর মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট ও বি এ পরীক্ষায় বংলাভাষায় পরীক্ষার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় কয়েকজন

সাহিত্যিক উৎসাহিত হন এবং ছাত্রেরা অল্প স্বল্প বাংলা পড়িতে ও লিখিতে অভ্যস্ত হয়—আমার মত একেবারে আনাড়ী থাকিয়া যায় না, এইটুকুই যা লাভ। কিন্তু তাহা কিছুই নয়, অতি সামান্য। এ ব্যবস্থায় বাংলা সাহিত্য বা ভাষা বিশেষভাবে অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিষয় হয় নাই; পরীক্ষা অনেকটা সখের জিনিষ দাঁড়াইয়া গেছে। আর ইহাতে বাংলার ভিতর দিয়া দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি শিখিবার কোন কথাই নাই; সুতরাং যথার্থ মানসিকবিকাশের কোন সুযোগ নাই। বরং বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম্ এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় মারাঠী ও গুজরাটী ভাষায় পাঠ্য বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট তালিকা অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে ঐ দুই ভাষা অধ্যয়ন সম্বন্ধে বেশ কাজ হইয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের readership আছে এবং বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতাও হয়—কিন্তু ইংরাজীতে।

আর একটি ব্যবস্থা এ সকলের চেয়েও মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের পথকে বেশ একটুখানি প্রশস্ত করিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে ইতিহাস বিষয়ে বাংলায় পরীক্ষা দিতে পারে; সে বিষয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তকও নির্দ্দিষ্ট হয়। শিক্ষক মহাশয়ও ইচ্ছা করিলেই অধ্যাপনার সময়ে বাংলাভাষা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক স্কুলে ছাত্র কিম্বা অধ্যাপক এই সুযোগটি গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রথমে Simla Committeeতে এ-সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব যখন গৃহীত হয়, তখন আশা করিয়াছিলাম যে এই নজিরে ক্রমে অঙ্ক ও ভূগোল এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার লজিক ও ইতিহাস এবং

ক্রমশঃ আরো দু একটি বিষয় বাংলার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার জন্য এ সম্ভাবনাকে আমরা হারাইতে বসিয়াছি।

কাশীতে যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, তাহাতে হিন্দী ভাষায় অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইবে। কিন্তু তাহা কতদূর কাজে দাঁড়াইবে, তাহা এখন বলা কঠিন। তবে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের এ বিষয়ে দৃষ্টি আছে, ইহাই সুখের বিষয়।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য :—

(১) বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির বাহিরে কি কাজ হইতে পারে :—

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে নানা সমিতি বা পরিষদের ভিতর দিয়া নানাবিধ শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। যেমন, সায়ান্স এসোসিয়েশনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ অনেকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা যায়—সাহিত্যপরিষদে ও সাহিত্যসভাগুলিতেও ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু এ সকল বক্তৃতার দ্বারা কোন নিয়মিত শিক্ষার কাজ হয় না। সবচেয়ে সুবিধা হয় যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের extension lectures-এর প্রোগ্রামের মধ্যে নিয়মিতরূপে বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করা যায়। সেই সঙ্গে পরীক্ষার ব্যবস্থাও থাকিবে; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ডিপ্লোমা, মেডাল প্রভৃতি দেওয়া

হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় সেই সকল বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবেন ও তাহাদিগকে প্রশংসিত পুস্তকের তালিকাভুক্ত করিবেন। এইরূপে ক্রমে বাংলায় একটা university publication শ্রেণী বা Home University শ্রেণীর মত এক শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারিবে। একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। এই সকল বক্তৃতায় শ্রোতার অভাব হইবে না—বিশেষতঃ কলিকাতায়, ঢাকায়, কিম্বা অন্য কোন প্রধান সহরে বা শিক্ষার কেন্দ্রে। কেবল যে কলেজ বা স্কুলের ছাত্ররাই আসিবে তাহা নয়, অনেক শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোক, যাঁহারা স্কুল বা কলেজ ছাড়িয়া কাজকর্ম্ম বা ব্যবসায়ে লাগিয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল বাংলা বক্তৃতাদি শুনিতে আসিবেন। এগুলি সান্ধ্য বক্তৃতার মত কাজ করিবে। এইরূপে বাংলায় শিক্ষা ও বাংলা সাহিত্য উভয়েরই ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে থাকিবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির ভিতরে বাংলায় শিক্ষা দেওয়ার কি ব্যবস্থা হইতে পারে :—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহার গোড়াপত্তন হইয়াছে, এখন ইমারত গাঁথা চাই। ম্যাট্রিকুলেশনের ইতিহাস, ইণ্টারমিডিয়েটের লজিক-এ বাংলা পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত হয় এবং ইতিহাসে বাংলায় পরীক্ষা গ্রহণও করা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প বিদ্যালয়েই বাংলায় এই সকল বিষয় শেখানো হইয়া থাকে এবং অতি অল্পসংখ্যক পরীক্ষার্থী বাংলায় ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর দেয়। যদি ছাত্রদের বা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের বা ছাত্রদের অভিভাবকদের এ বিষয়ে আগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে ক্রমশঃ ভূগোল, অঙ্ক, মেকানিক্স্,

লজিক ও ইতিহাস, এই সকল বিষয়েও বাংলায় শিক্ষাদান ও বাংলায় পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলা যাইত ও আলোচনা করা যাইত। এখনও সুযোগ আছে, এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যম আবশ্যক। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ প্রস্তাব না আনিয়াও এ বিষয়ে কিছু পরিমাণে কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব নয়। আমি কোন কোন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী অধ্যাপকের কথা জানি যাঁহারা ইণ্টারমিডিয়েট এমন কি বি,এ, শ্রেণীতেও বাংলায় শিক্ষা দিয়াছেন এবং ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে তাঁহাদের অধ্যাপনায় ছাত্রেরা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে অধ্যাপকেরা ও ছাত্রেরা স্বাধীন —বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ শিক্ষায় কোন আপত্তি করেন নাই, কোন আপত্তি করিতে পারেন না। যদি অধ্যাপক মাঝে মাঝে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় অধ্যাপনার সময়ে বাংলায় বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে সকল পক্ষেরই মঙ্গল। তাহা হইলে ছাত্রদেরও যেমন যথার্থ মানসিক উন্নতি ঘটিতে পারে, অধ্যাপকদেরও তেমনিই প্রভূত মানসিক উন্নতি ঘটিতে পারে। "শিক্ষার বাহন" আসিবার জন্য ইহাই সদর রাস্তা—একমাত্র বড় রাস্তা। আজকাল প্রত্যেক কলেজে, অনেক কলেজ-বোর্ডিংয়ে বা মেসে সাহিত্য, দর্শন বা বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনার জন্য ক্লাব আছে। ছাত্র ও অধ্যাপকে মিলিয়া সেই সকল সভাসমিতিতে বাংলা ভাষায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা চলিতে পারে। কলেজের কাগজে বা মাসিক পত্রাদিতে সেই সকল প্রবন্ধ ছাপা হইতে পারে। এ সকল উপায় অবলম্বন করা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য নয়।

(৩) সাহিত্যপরিষদ ও সাহিত্যসভাসকল পরিভাষা সঙ্কলন ও গ্রন্থ প্রকাশ বা প্রবন্ধাদির দ্বারা মাতৃভাষায় দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। সাহিত্য পরিষদ একাজে ইতিমধ্যেই ব্রতী হইয়াছেন—বিজ্ঞানের পরিভাষা এবং আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিও মাতৃভাষায় প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু শিক্ষার কেন্দ্রগুলি তৈরি না হইলে এ পরিভাষা কখনও চলিবে না। সুতরাং সেই সকল কেন্দ্র প্রস্তুত করিয়া মাতৃভাষায় উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তবেই সাহিত্য পরিষদের এতকালের চেষ্টা সফল হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

মনীষী-মঙ্গল

(প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে প্রাপ্ত-পূজা, বিজ্ঞানাচার্য্য, বহুমানাস্পদ ডাক্তার
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে)

জ্ঞানের মণি-প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে !
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জঙ্গম-জড়-জঙ্গমে !
অন্ধকারে নিত্য নব পন্থা কর আবিস্কার !
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো ! তোমায় করি নমস্কার ।

দাস্যকালি যাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে,
বিশ্বেরও নমস্য আজি প্রতিভা-বিভা-উন্মেষে ;
গরুড় তুমি গগনারূঢ় বিনতা নীড় সম্ভূত,
দেবতাসম ললাটে তব স্ফুরে কী আঁখি অদ্ভুত !

দরদী তুমি দরদ দিয়ে বুঝেছ তৃণলতার প্রাণ ;
খনির লোহা প্রাণীর লোহ পরশে তব স্পন্দমান ।
কুহকী তুমি, মায়াবী তুমি, এ কি গো তব ইন্দ্রজাল !
হুকুমে তব নৃত্য করে বনের তরু বনচাঁড়াল !

মরমী তুমি চরম খোঁজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো,
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি
পশিয়া নৃপ-বালার ভালে ছোঁয়ালে এ কি হেম-কাঠি !

হিম যা ছিল তপ্ত হল মেলিল আঁখি মূর্চ্ছিত,—
নূতন পরিচয়ের নব চন্দনেতে চর্চ্চিত!
বনের পরী তুলিল হাই, জাগিল হাওয়া নিশ্বাসে
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে!

দ্বন্দ্ব যত জনম-শোধ চুকিয়া গেল অকস্মাৎ,
চক্ষে হেরে নিখিল লোক জীবনে জড়ে নাই তফাৎ!
ভুবন ভরি বিরাজ করে অনন্ত অখণ্ড প্রাণ
প্রাণেরি অচিন্ত্য লীলা জন্তু জড়ে স্পন্দমান!

জ্ঞানের মহাসিন্ধু তুমি মিলালে যত নদনদী,
বজ্রমণি ছিদ্র করে প্রতিভা তব, তীক্ষ্ণধী!
আনন্দেরি স্বর্গে তুমি জ্ঞানের সিঁড়ি নিত্য হে,
সত্য-মহা-সমুদ্রেতে সঙ্গমেরি তীর্থ হে!

অণুর চেয়ে ক্ষুদ্র যিনি জনক মহাসমুদ্রের
করিলে জ্ঞানগম্য তাঁরে কি বিপ্রের কি শূদ্রের;
দ্বন্দ্বহারা আনন্দের করিলে পথ পরিস্কার
বিশ্বজন-বন্দ্য তুমি তোমায় করি নমস্কার।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯১৫

সবুজ পত্র

ঘরে-বাইরে

নিখিলেশের আত্মকথা

রাত্রি তিনটের সময় জেগে উঠেই আমার হঠাৎ মনে হয়, যে-জগতে আমি একদিন বাস করতুম সে যেন মরে' ভূত হয়ে আমার এই বিছানা, এই ঘর, এই সব জিনিষপত্র দখল করে বসে আছে। আমি বেশ বুঝতে পারলুম মানুষ কেন পরিচিত লোকের ভূতকেও ভয় করে। চিরকালের জানা যখন একমুহূর্ত্তে অজানা হয়ে ওঠে তখন সে এক বিভীষিকা। জীবনের সমস্ত ব্যবহার যে সহজ স্রোতে চলছিল আজ তাকে যখন এমন খাদে চালাতে হবে যে-খাদ এখনো কাটা হয়নি তখন বিষম ধাদা লেগে যায়; তখন নিজের স্বভাবকে বাঁচিয়ে চলা শক্ত হয়; তখন নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হয় আমিও বুঝি আরেকজন কেউ।

কিছুদিন থেকে বুঝতে পারচি সন্দীপের দলবল আমাদের অঞ্চলে উৎপাত সুরু করেচে। যদি আমার স্বভাবে স্থির থাকতুম তাহলে সন্দীপকে জোরের সঙ্গে বলতুম, এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু গোলেমালে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেচি। আমার পথ আর

সরল নেই। সন্দীপকে চলে যেতে বলার মধ্যে আমার একটা লজ্জা আসে। ওর সঙ্গে আর-একটা কথা এসে পড়ে; তাতে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাই।

দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিষ ছিল—সে ত কেবল আমার গৃহস্থ-আশ্রম বা সংসারযাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ। সেই জন্যে বাইরের দিক থেকে ওর উপরে একটুও জোর দিতে পারলুম না—দিতে গেলেই মনে হয় আমার দেবতাকে অপমান করচি। এ কথা কাউকে বোঝাতে পারব না। আমি হয় ত অদ্ভুত। সেই জন্যেই হয় ত ঠক্‌লুম। কিন্তু আমার বাইরেকে ঠকা থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভিতরকে ঠকাই কি করে?

যে-সত্য অন্তর থেকে বাইরেকে সৃষ্টি করে তোলে আমি সেই-সত্যের দীক্ষা নিয়েচি। তাই আজ আমাকে বাইরের জাল এমন করে ছিন্ন করতে হল। আমার দেবতা আমাকে বাইরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবেন। হৃদয়ের রক্তপাত করে সেই-মুক্তি আমি পাব। কিন্তু যখন পাব তখন অন্তরের রাজত্ব আমার হবে।

সেই-মুক্তির স্বাদ এখনি পাচ্চি। থেকে থেকে অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার অন্তরের ভোরের পাখী গান গেয়ে উঠচে। যে-বিমলা মায়ায় তৈরি সেই স্বপ্ন ছুটে গেলেও ক্ষতি হবে না, আমার ভিতরের পুরুষটি এই আশ্বাসবাণী থেকে থেকে বলে উঠচে।

মাষ্টার মশায়ের কাছে খবর পেলুম সন্দীপ হরিশকুণ্ডুর সঙ্গে যোগ দিয়ে খুব ধুম করে মহিষমর্দ্দিনী পূজোর আয়োজন করচে। এই পূজোর খরচা হরিশকুণ্ডু তার প্রজাদের কাছ থেকে আদায়

করতে লেগে গেছে। আমাদের কবিরত্ন আর বিদ্যাবাগীশ মশায়কে দিয়ে একটি স্তব রচনা করা হচ্চে যার মধ্যে দুই অর্থ হয়। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে এই নিয়ে সন্দীপের একটু তর্কও হয়ে গেছে। সন্দীপ বলে, দেবতার একটা এভোল্যুশন আছে; পিতামহরা যে-দেবতা সৃষ্টি করেছিলেন, পৌত্রেরা যদি সেই-দেবতাকে আপনার মত না করে তোলে তাহলে যে নাস্তিক হয়ে উঠবে। পুরাতন দেবতাকে আধুনিক করে তোলাই আমার মিশন্, দেবতাকে অতীতের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই আমার জন্ম। আমি দেবতার উদ্ধারকর্ত্তা। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসচি সন্দীপ হচ্চে আইডিয়ার যাদুকর,—সত্যকে আবিষ্কার করায় ওর কোনো প্রয়োজন নেই, সত্যের ভেল্‌কি বানিয়ে তোলাতেই ওর আনন্দ। মধ্য আফ্রিকায় যদি ওর জন্ম হত, তাহলে, নরবলি দিয়ে নরমাংস ভোজন করাই যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা এই কথা নূতন যুক্তিতে প্রমাণ করে ও পুলকিত হয়ে উঠত। ভোলানোই যার কাজ নিজেকেও না ভুলিয়ে সে থাকতে পারে না। আমার বিশ্বাস, সন্দীপ কথার মন্ত্রে যতবার নূতন-নূতন কুহক সৃষ্টি করে প্রত্যেকবার নিজেই মনে করে সত্যকে পেয়েচি,—তার এক-সৃষ্টির সঙ্গে আরেক-সৃষ্টির যতই বিরোধ থাক্।

যাই হোক্ দেশের মধ্যে মায়ার এই তাড়ি-খানা বানিয়ে তোলায় আমি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারব না। যে তরুণ যুবকেরা দেশের কাজে লাগতে চাচ্চে গোড়া থেকেই তাদের নেশা অভ্যাস করানোর চেষ্টায় আমার যেন কোনো হাত না থাকে। মন্ত্রে ভুলিয়ে যারা কাজ আদায় করতে চায় তারা কাজটারই দাম বড়

করে দেখে, যে-মানুষের মনকে ভোলায় সেই মনের দাম তাদের কাছে কিছুই নেই। প্রমত্ততা থেকে দেশকে যদি বাঁচাতে না পারি তবে দেশের পূজা হবে দেশের বিষনৈবেদ্য, দেশের কাজ বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্রের মত দেশের বুকে এসে বাজবে।

বিমলার সাম্‌নেই সন্দীপকে বলেচি, তোমাকে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এতে হয় ত বিমলা এবং সন্দীপ দুজনেই আমার মৎলবকে ভুল বুঝবে। কিন্তু এই ভুল বোঝার ভয় থেকে মুক্তি চাই। বিমলাও আমাকে ভুল বুঝুক্।

ঢাকা থেকে মৌলবী প্রচারকের আনাগোনা চল্‌চে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতই ঘৃণা করত। কিন্তু দুই-এক জায়গায় গোরু জবাই দেখা দিল। আমি আমার মুসলমান প্রজারই কাছে তার প্রথম খবর পাই এবং তার প্রতিবাদও শুনি। এবারে বুঝলুম, ঠেকানো শক্ত হবে। ব্যাপার-টার মূলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে অকৃত্রিম করে তোলা হবে। সেইটেই ত আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চাল।

আমার প্রধান-প্রধান হিন্দুপ্রজাকে ডাকিয়ে অনেক করে' বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বল্লুম, নিজের ধর্ম্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্ম্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে' শাক্ত ত রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কি? মুসলমানকেও নিজের ধর্ম্মমতে চল্‌তে দিতে হবে। তোমরা গোলমাল কোরো না।

তারা বল্লে, মহারাজ এতদিন ত এ সব উপসর্গ ছিল না।

আমি বল্লুম, ছিল না, সে ওদের ইচ্ছা। আবার ইচ্ছা করেই যাতে নিবৃত্ত হয় সেই পথই দেখ। সে ত ঝগড়ার পথ নয়।

তারা বল্লে, না মহারাজ, সেদিন নেই, শাসন না করলে কিছুতেই থামবে না।

আমি বল্লুম, শাসনে গোহিংসা ত থাম্‌বেই না, তার উপরে মানুষের প্রতি হিংসা বেড়ে উঠতে থাকবে।

এদের মধ্যে একজন ছিল, ইংরেজি-পড়া; সে এখনকার বুলি আওড়াতে শিখেচে। সে বল্লে, দেখুন, এটা ত কেবল একটা সংস্কারের কথা নয়, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান—এদেশে গোরু যে—

আমি বল্লুম,—এদেশে মহিষেও দুধ দেয় মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম্ম মনে মনে হাসেন কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে উঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।

ইংরেজি পড়া বল্লে, এর পিছনে কে আছে সেটা কি দেখতে পাচ্চেন না? মুসলমানরা জান্‌তে পেরেছে তাদের শাস্তি হবে না —পাঁচুড়েতে কি কাণ্ড তারা করেচে শুনেছেন ত?

আমি বল্লুম, এই যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপরে হানা সম্ভব হচ্চে—এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েচি—ধর্ম্ম যে এমনি করেই বিচার করেন। আমরা যা এতকাল ধরে জমিয়েচি আমাদের উপরেই তা খরচ হবে।

ইংরেজি-পড়া বল্লে, আচ্ছা ভালো, তাই খরচ হয়ে যাক্‌। কিন্তু

এর মধ্যে আমাদেরও একটা সুখ আছে—আমাদেরই এবার জিৎ—যে আইন ওদের সকলের চেয়ে বড় শক্তি সেই আইনকে আজ আমরা ধূলিসাৎ করেচি, এতদিন ওরা রাজা ছিল আজ ওদেরও আমরা ডাকাতি ধরাব। একথা ইতিহাসে কেউ লিখবে না কিন্তু এ কথা চিরদিন আমাদের মনে থাকবে।

এদিকে কাগজে কাগজে অখ্যাতিতে আমি বিখ্যাত হয়ে পড়লুম। শুনচি চক্রবর্ত্তীদের এলাকায় নদীর ধারে শ্মশানঘাটে দেশসেবকের দল আমার কুশপুত্তলী বানিয়ে খুব ধুম করে সেটাকে দাহ করেচে—তার সঙ্গে আরো অনেক অপমানের আয়োজন ছিল। এরা কাপড়ের কল খুলে যৌথ কারবার করবে বলে আমাকে খুব বড় শেয়ার কেনাতে এসেছিল। আমি বলেছিলুম, যদি কেবল আমার এই ক'টি টাকা লোকসান যেত খেদ ছিল না, কিন্তু তোমরা যদি কারখানা খোল তবে অনেক গরীবের টাকা মারা যাবে এই জন্যেই আমি শেয়ার কিন্‌ব না।

কেন মশায়? দেশের হিত কি আপনি পছন্দ করেন না?

কারবার করলে দেশের হিত হতেও পারে, কিন্তু দেশের হিত করব বল্লেই ত কারবার হয় না। যখন ঠাণ্ডা ছিলুম তখন আমাদের ব্যবসা চলেনি,—আর ক্ষেপে উঠেচি বলেই কি আমাদের ব্যবসা হুহু করে চল্‌বে?

এক কথায় বলুন না আপনি শেয়ার কিন্‌বেন না।

কিন্‌ব যখন তোমাদের ব্যবসাকে ব্যবসা বলে বুঝব। তোমাদের আগুন জ্বলচে বলেই যে তোমাদের হাঁড়িও চড়বে সেটার ত কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখচিনে।

এরা মনে করে আমি খুব হিসাবী আমি কৃপণ। আমার স্বদেশী কারবারের হিসাবের খাতাটা এদের খুলে দেখাতে ইচ্ছা করে। আর সেই যে একদিন মাতৃভূমিতে ফসলের উন্নতি করতে বসেছিলুম তার ইতিহাস এরা বুঝি জানে না! ক'বছর ধরে জাভা মরিশস্ থেকে আখ আনিয়ে চাষ করালুম; সরকারী কৃষি বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শে যত রকমের কর্ষণ বর্ষণ হতে পারে তার কিছুই বাকি রাখিনি, অবশেষে তার থেকে ফসলটা কি হল? সে আমার এলাকার চাষীদের চাপা অট্টহাস্য। আজো সেটা চাপা রয়ে গেছে। তার পরে সরকারী কৃষিপত্রিকা তর্জ্জমা করে যখন ওদের কাছে জাপানী সিম কিম্বা বিদেশী কাপাশের চাষের কথা বল্‌তে গেছি তখন দেখতে পেয়েছি সেই পুরোনো চাপা হাসি আর চাপা থাকে না। দেশে তখন দেশসেবকদের কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, বন্দেমাতরং মন্ত্র তখন নীরব। আর সেই যে আমার কলের জাহাজ—দূর হোক্, সে সব কথা তুলে লাভ কি? দেশহিতের যে আগুন এরা জ্বাল্‌লে তাতে আমারি কুশপুত্তলী দগ্ধ হয়ে যদি থামে তবে ত রক্ষা!

* * * *

এ কি খবর! আমাদের চকুয়ার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গেছে! কাল রাত্রে সদরখাজনার সাড়ে সাত হাজার টাকার এক কিস্তি সেখানে জমা হয়েছিল আজ ভোরে নৌকা করে আমাদের সদরে রওনা হবার কথা। পাঠাবার সুবিধা হবে বলে নায়েব ট্রেজরি থেকে টাকা ভাঙিয়ে দশ কুড়ি টাকার নোট করে তাড়াবন্দী করে রেখেছিল। অর্দ্ধেক রাত্রে ডাকাতের দল বন্দুক

পিস্তল নিয়ে মালখানা লুটেছে। কাসেম সর্দ্দার পিস্তলের গুলি খেয়ে জখম হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ডাকাতরা কেবল ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি দেড় হাজার টাকার নোট ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে চলে এসেচে। অনায়াসে সব টাকাই নিয়ে আস্‌তে পারত। যাই হোক্, ডাকাতের পালা শেষ হল এইবার পুলিশের পালা আরম্ভ হবে। টাকা ত গেছেই এখন শান্তিও থাক্‌বে না।

বাড়ি ভিতরে গিয়ে দেখি সেখানে খবর রটে গেছে। মেজ রাণী এসে বল্লেন, ঠাকুরপো, এ কি সর্ব্বনাশ!

আমি উড়িয়ে দেবার জন্য বল্লুম, সর্ব্বনাশের এখনো অনেক বাকী আছে। এখনো কিছুকাল খেয়ে-পরে কাটাতে পারব।

না ভাই, টাট্টা নয়, তোমারই উপর এদের এত রাগ কেন? ঠাকুরপো, তুমি না-হয় ওদের একটু মন রেখেই চল না! দেশ-সুদ্ধ লোককে কি—

দেশসুদ্ধ লোকের খাতিরে দেশকে সুদ্ধ মজাতে পারব না ত।

এই সেদিন শুন্‌লুম নদীর ধারে তোমাকে নিয়ে ওরা এক কাণ্ড করে বসেচে। ছি ছি! আমি ত ভয়ে মরি! ছোটরাণী মেমের কাছে পড়েচে ওর ত ভয় ডর নেই—আমি কেনারাম পুরুতকে ডাকিয়ে শান্তি স্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে বাঁচি। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, তুমি কলকাতায় যাও—এখানে থাক্‌লে ওরা কোন্ দিন কি করে বসে!

মেজরাণীদিদির ভয় ভাবনা আজ আমার প্রাণে সুধাবর্ষণ করলে! অন্নপূর্ণা, তোমাদের হৃদয়ের দ্বারে আমাদের ভিক্ষা কোনোদিন ঘুচবে না।

ঠাকুরপো, তোমার শোবার ঘরের পাশে ঐ যে টাকাটা রেখেচ ওটা ভালো করচ না। কোন্‌দিক থেকে ওরা খবর পাবে আর শেষকালে—আমি টাকার জন্যে ভাবিনে ভাই—কি জানি—

আমি মেজরাণীকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বল্লুম, আচ্ছা, ও-টাকাটা বের করে এখনি আমাদের খাতাঞ্চিখানায় পাঠিয়ে দিচ্চি। পর্শু দিনই কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে আসব।

এই বলে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি পাশের ঘর বন্ধ। দরজাটা ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে বিমলা বল্লে—আমি কাপড় ছাড়চি।

মেজরাণী বল্লেন—এই সকালবেলাতেই ছোটরাণীর সাজ হচ্চে! অবাক করলে! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বস্‌বে! ওলো, ও দেবীচৌধুরাণী, লুটের মাল বোঝাই হচ্চে নাকি?

আর-একটু পরে এসে সব ঠিক করা যাবে—এই বলে বাইরে এসে দেখি সেখানে পুলিস্ ইন্‌স্পেক্টর উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু সন্ধান পেলেন?

সন্দেহ ত করচি।

কাকে?

ঐ কাসেম সর্দ্দারকে।

সে কি কথা? ঐ ত জখম হয়েচে!

জখম কিছু নয়—পায়ের চামড়া ঘেঁষে একটুখানি রক্ত পড়েচে—সে ওর নিজেরই কীর্ত্তি।

কাসেমকে আমি কোনোমতেই সন্দেহ করতে পারিনে—ও বিশ্বাসী।

বিশ্বাসী, সে কথা মান্‌তে রাজি আছি কিন্তু তাই বলেই যে

চুরি করতে পারে না তা বলা যায় না। এও দেখেচি পঁচিশ বৎসর যে-লোক বিশ্বাস রক্ষা করে এসেচে সেও একদিন হঠাৎ—

তা যদি হয় আমি ওকে জেলে দিতে পারব না।

আপনি দেবেন কেন? যার হাতে দেবার ভার সেই দেবে।

কাসেম ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি টাকাটা ফেলে রাখলে কেন?

ঐ ধোঁকাটা মনে জন্মে দেবার জন্যেই। আপনি যাই বলুন, লোকটা পাকা। ও আপনাদের কাছারীতে পাহারা দেয় এদিকে কাছাকাছি এ অঞ্চলে যত চুরি ডাকাতি হয়েচে নিশ্চয় তার মূলে ও আছে।

লাটিয়ালরা পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি সেরে এক রাত্রেই কেমন করে ফিরে এসে মনিবের কাছারিতে হাজরি লেখাতে পারে ইন্‌স্পেক্টর তার অনেক দৃষ্টান্ত দেখালেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কাসেমকে এনেচেন?

তিনি বল্লেন, না, সে থানায় আছে—এখনি ডেপুটিবাবু তদন্ত করতে আস্‌বেন।

আমি বল্লুম, আমি তাকে দেখতে চাই।

কাসেমের সঙ্গে দেখা হবামাত্র সে আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্লে, খোদার কসম, মহারাজ, আমি এ কাজ করিনি।

আমি বল্লুম, কাসেম, আমি তোমাকে সন্দেহ করিনে। ভয় নেই তোমার—বিনা দোষে তোমার শাস্তি ঘট্‌তে দেব না।

কাসেম ডাকাতদের ভালো বর্ণনা করতে পারলে না—কেবল খুবই অত্যুক্তি করতে লাগল— চারশো পাঁচশো লোক, এত-বড়-বড়

বন্দুক তলোয়ার ইত্যাদি। বুঝলুম এ সমস্ত বাজে কথা; হয়, ভয়ের দৃষ্টিতে সব বেড়ে উঠেচে, নয় পরাভবের লজ্জা চাপা দেবার জন্যে বাড়িয়ে তুলেচে। ওর ধারণা, হরিশকুণ্ডুর সঙ্গে আমার শত্রুতা, এ তারই কাজ—এমন কি, তাদের এক্রাম্ সর্দ্দারের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুন্‌তে পেয়েচে বলে তার বিশ্বাস।

আমি বল্লুম, দেখ্ কাসেম, আন্দাজের উপর ভর করে খবরদার পরের নাম জড়াস্‌নে। হরিশকুণ্ডু এর মধ্যে আছে কি না সে কথা বানিয়ে তোলবার ভার তোর উপর নেই।

বাড়ি ফিরে এসে মাষ্টার মশায়কে ডেকে পাঠালুম। তিনি মাথা নেড়ে বল্লেন—আর কল্যাণ নেই। ধর্ম্মকে সরিয়ে দিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসিয়েছি—এখন দেশের সমস্ত পাপ উদ্ধত হয়ে ফুটে বেরবে, তার আর কোনো লজ্জা থাক্‌বে না।

আপনি কি মনে করেন, একাজ—

আমি জানিনে কিন্তু পাপের হাওয়া উঠেচে। দাও, দাও, তোমার এলেকা থেকে ওদের এখনি বিদায় করে দাও।

আর একদিন সময় দিয়েচি—পর্শু এরা সব যাবে।

দেখ, আমি একটি কথা বলি, বিমলাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। এখান থেকে তিনি বাইরেটাকে সঙ্কীর্ণ করে দেখচেন, সব মানুষের, সব জিনিষের, ঠিক পরিমাণ বুঝতে পারচেন না। ওঁকে তুমি একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে দাও—মানুষকে, মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রকে, উনি একবার বড় জায়গা থেকে দেখে নিন্।

আমিও ঐ কথাই ভাবছিলুম।

কিন্তু আর দেরি কোরো না। দেখ নিখিল, মানুষের ইতিহাস

পৃথিবীর সমস্ত দেশকে সমস্ত জাতকে নিয়ে তৈরি হয়ে উঠচে, এই জন্যে পালিটিক্সেও ধর্ম্মকে বিকিয়ে দেশকে বাড়িয়ে তোলা চল্‌বে না। আমি জানি য়ুরোপ একথা মনের সঙ্গে মানে না কিন্তু তাই বলেই যে য়ুরোপই আমাদের গুরু এ আমি মান্‌ব না। সত্যের জন্যে মানুষ মরে অমর হয়, কোনো জাতিও যদি মরে, তাহলে মানুষের ইতিহাসে সেও অমর হবে। সেই সত্যের অনুভূতি জগতের মধ্যে এই ভারতবর্ষেই খাঁটি হয়ে উঠুক্ সয়তানের অভ্রভেদী অট্টহাসির মাঝখানে! কিন্তু বিদেশ থেকে এ কি পাপের মহামারী এসে আমাদের দেশে প্রবেশ করলে?

সমস্ত দিন এই সব নানা হাঙ্গামে কেটে গেল। শ্রান্ত হয়ে রাত্রে শুতে গেলুম। সেই টাকাটা আজ বের না করে কাল সকালে বের করে নেব স্থির করেচি।

রাত্রে কখন্ এক সময়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার। একটা কিসের শব্দ যেন শুন্‌তে পাচ্চি। বুঝি কেউ কাঁদচে।

থেকে থেকে বাদ্‌লা রাতের দম্‌কা হাওয়ার মত চোখের জলে ভরা এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুন্‌তে পাচ্চি। আমার মনে হল, আমার এই ঘরটার বুকের ভিতরকার কান্না!

আমার ঘরে আর-কেউ নেই। বিমলা কিছুদিন থেকে কোনো একটা পাশের ঘরে শোয়। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি বিমলা মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েচে।

এসব কথা লিখতে পারা যায় না। এ যে কী, তা কেবল

তিনিই জানেন যিনি বিশ্বের মর্ম্মের মধ্যে বসে জগতের সমস্ত বেদনাকে গ্রহণ করচেন। আকাশ মূক, তারাগুলি নীরব, রাত্রি নিস্তব্ধ—তারি মাঝখানে ঐ একটি নিদ্রাহীন কান্না!

আমরা এই সব সুখদুঃখকে সংসারের সঙ্গে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভালোমন্দ একটা কিছু নাম দিয়ে চুকিয়ে ফেলে দিই। কিন্তু অন্ধকারের বক্ষ ভাসিয়ে দিয়ে এই যে ব্যথার উৎস উঠচে এর কি কোনো নাম আছে! সেই নিশীথরাত্রে সেই লক্ষকোটি তারার নিঃশব্দতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি যখন ওর দিকে চেয়ে দেখলুম তখন আমার মন সভয়ে বলে উঠল, আমি এ'কে বিচার করবার কে। হে প্রাণ, হে মৃত্যু, হে অসীম বিশ্ব, হে অসীম বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাদের মধ্যে যে রহস্য রয়েছে আমি জোড়হাতে তাকে প্রণাম করি।

একবার ভাবলুম, ফিরে যাই। কিন্তু পারলুম না। নিঃশব্দে বিমলার শিয়রের কাছে বসে তার মাথার উপর হাত রাখলুম। প্রথমটা তার সমস্ত শরীর কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠল—তার পরেই সেই কঠিনতা যেন ফেটে ভেঙে কান্না সহস্রধারায় বেয়ে যেতে লাগল। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এত কান্না যে কোথায় ধরতে পারে সে ত ভেবে পাওয়া যায় না।

আমি আস্তে আস্তে বিমলার মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম। তার পরে কখন্ একসময়ে হাৎড়ে হাৎড়ে সে আমার পা দুটো টেনে নিলে—বুকের উপরে এমনি করে চেপে ধরলে যে, আমার মনে হল সেই আঘাতে তার বুক ফেটে যাবে।

বিমলার আত্মকথা

আজ সকালে অমূল্যর কলকাতা থেকে ফেরবার কথা। বেহারাকে বলে রেখেচি সে এলেই যেন খবর দেয়। কিন্তু স্থির থাকতে পারচি নে। বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসে রইলুম।

অমূল্যকে যখন আমার গয়না বেচবার জন্যে কলকাতায় পাঠালুম তখন নিজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বুঝি মনেই ছিল না। এ-কথা একবারো আমার বুদ্ধিতে এলই না যে, সে ছেলেমানুষ, অত টাকার গয়না কোথাও বেচতে গেলে সবাই তাকে সন্দেহ করবে। মেয়েমানুষ, আমরা এত অসহায় যে, আমাদের নিজের বিপদ অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে আমাদের যেন উপায় নেই। আমরা মরবার সময় পাঁচজনকে ডুবিয়ে মারি।

বড় অহঙ্কার করে বলেছিলুম, অমূল্যকে বাঁচাব। যে নিজে তলিয়ে যাচ্চে সে না কি অন্যকে বাঁচাতে পারে! হায়, হায়, আমিই বুঝি ওকে মারলুম! ভাই আমার, আমি তোর এম্‌নি দিদি, যেদিন মনে মনে তোর কপালে ভাইফোঁটা দিলুম সেইদিনই বুঝি যম মনে মনে হাস্‌লে। আমি যে অকল্যাণের বোঝাই নিয়ে ফিরচি আজ!

আমার আজ মনে হচ্চে মানুষকে এক-এক সময়ে যেন অমঙ্গলের প্লেগে ধরে, হঠাৎ কোথা হতে তার বীজ এসে পড়ে, আর, একরাত্রেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সেই সময়ে সকল সংসার থেকে খুব দূরে কোথাও তাকে সরিয়ে রাখা যায় না কি? স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি তার ছোঁয়াচ যে বড় ভয়ানক! সে যে বিপদের মশালের মত, নিজে পুড়তে থাকে সংসারে আগুন লাগাবার জন্যেই।

নটা বাজ্‌ল। আমার কেমন বোধ হচ্চে, অমূল্য বিপদে পড়েছে, ওকে পুলিসে ধরেছে। আমার গয়নার বাক্স নিয়ে থানায় গোলমাল পড়ে গেছে—কার বাক্স, ও কোথা থেকে পেলে, তার জবাব ত শেষকালে আমাকেই দিতে হবে, সমস্ত পৃথিবীর লোকের সাম্‌নে! কি জবাবটা দেব? মেজরাণী, এতকাল তোমাকে বড় অবজ্ঞাই করেচি! আজ তোমার দিন এল! তুমি আজ সমস্ত পৃথিবীর রূপ ধরে শোধ তুল্‌বে। হে ভগবান, এইবার আমাকে বাঁচাও—আমার সমস্ত অহঙ্কার ভাসিয়ে দিয়ে মেজরাণীর পায়ের তলায় পড়ে থাক্‌ব!

আর থাক্‌তে পারলুম না—তখনি বাড়ি ভিতরে মেজরাণীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তিনি তখন বারান্দায় রোদ্দুরে বসে পান সাজচেন, পাশে থাকো বসে। থাকোকে দেখে মুহূর্ত্তের জন্যে মনটা সঙ্কুচিত হল—তখনি সেটা কাটিয়ে নিয়ে মেজরাণীর পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি বলে উঠ্‌লেন,—ও কি লো ছোটরাণী, তোর হল কি? হঠাৎ এত ভক্তি কেন?

আমি বল্লুম, দিদি, আজ আমার জন্মতিথি। অনেক অপরাধ করেচি, কর দিদি, আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন কোনোদিন তোমাদের কোনো দুঃখ না দিই! আমার ভারি ছোট মন!

বলেই তাঁকে আবার প্রণাম করে তাড়াতাড়ি উঠে এলুম। তিনি পিছন থেকে বল্‌তে লাগলেন, বলি, ও ছুটু, তোর জন্মতিথি, একথা আগে বলিস্‌নি কেন? আমার এখানে দুপুরবেলা তোর নিমন্ত্রণ রইল। লক্ষ্মী বোন, ভুলিস্‌নে!

ভগবান, এমন কিছু কর যাতে আজ আমার জন্মতিথি হয়।

একেবারে নতুন হতে পারিনে কি? সব ধুয়ে-মুছে আর-একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা কর, প্রভু!

বাইরে বৈঠকখানা ঘরে যখন ঢুকতে যাচ্চি এমন সময় সেখানে সন্দীপ এসে উপস্থিত হল। বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠল। আজ সকালের আলোয় তার যে-মুখ দেখ্‌লুম তাতে প্রতিভার জাদু একটুও ছিল না। আমি বলে উঠলুম,—আপনি যান এখান থেকে!

সন্দীপ হেসে বল্লে, অমূল্য ত নেই, এবারে বিশেষ কথার পালা যে আমার।

পোড়া কপাল! যে-অধিকার আমিই দিয়েচি সে-অধিকার আজ ঠেকাই কি করে? বল্লুম, আমার একলা থাকবার দরকার আছে।

রাণী, আর-একজন লোক ঘরে থাক্‌লেও একলা থাকার ব্যাঘাত হয় না। আমাকে তুমি মনে কোরো না, ভিড়ের লোক,—আমি সন্দীপ, লক্ষ লোকের মাঝেও আমি একলা।

আপনি আর-এক সময়ে আস্‌বেন, আজ সকালে আমি—

অমূল্যর জন্যে অপেক্ষা করচেন?

আমি বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করচি এমন সময় সন্দীপ তার শালের ভিতর থেকে আমার গয়নার বাক্স বের করে ঠক্ করে পাথরের টেবিলের উপর রাখলে।

আমি চম্‌কে উঠলুম, বল্লুম, তাহলে অমূল্য যায় নি?

কোথায় যায় নি?

কলকাতায়?

সন্দীপ একটু হেসে বল্লে, না।

বাঁচলুম! আমার ভাইফোঁটা বাঁচল! আমি চোর, বিধাতার দণ্ড ঐ পর্য্যন্তই পৌঁছক্—অমূল্য রক্ষা পাক্!

সন্দীপ আমার মুখের ভাব দেখে বিদ্রূপ করে বল্লে, এত খুসী, রাণী? গয়নার বাক্সর এত দাম? তবে কোন্ প্রাণে এই গয়না দেবীর পূজায় দিতে চেয়েছিলে? দিয়ে ত ফেলেচ, দেবতার হাত থেকে আবার কি ফিরিয়ে নিতে চাও?

অহঙ্কার মরতে মরতেও ছাড়ে না—ইচ্ছে হল দেখিয়ে দিই এ-গয়নার পরে আমার শিকি পয়সার মমতা নেই। আমি বল্লুম, এ-গয়নায় আপনার যদি লোভ থাকে নিয়ে যান না।

সন্দীপ বল্লে, আজ বাংলা দেশে যেখানে যত ধন আছে সমস্তর পরেই আমার লোভ। লোভের মত এত বড় মহৎ বৃত্তি কি আর-কিছু আছে? পৃথিবীর যারা ইন্দ্র লোভ তাদের ঐরাবত। তাহলে এ সমস্ত গয়না আমার?

এই বলে, সন্দীপ বাক্সটি তুলে নিয়ে শালের মধ্যে ঢাকা দিতেই অমূল্য ঘরের মধ্যে ঢুক্‌ল। তার চোখের গোড়ায় কালী পড়েচে, মুখ শুক্‌নো, উস্কখুস্ক চুল—একদিনেই তার তরুণ বয়সের লাবণ্য যেন ঝরে গিয়েচে। তাকে দেখবামাত্রই আমার বুকের ভিতরটায় কামড়ে উঠল।

অমূল্য আমার দিকে না তাকিয়েই একেবারে সন্দীপকে গিয়ে বল্লে, আপনি গয়নার বাক্স আমার তোরঙ্গ থেকে বের করে এনেচেন?

গয়নার বাক্স তোমারি না কি?

না, কিন্তু তোরঙ্গ আমার।

সন্দীপ হা হা করে হেসে উঠল। বল্লে, তোরঙ্গ সম্বন্ধে আমি-তুমির ভেদ-বিচার ত তোমার বড় সূক্ষ্ম হে, অমূল্য। তুমিও মরবার আগে ধর্ম্মপ্রচারক হয়ে মরবে দেখচি।

অমূল্য চৌকির উপর বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের উপর মাথা রাখলে। আমি তার কাছে এসে তার মাথায় হাত রেখে বল্লুম, অমূল্য, কি হয়েচে ?

তখনি সে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, দিদি, এ গয়নার বাক্স আমিই নিজের হাতে তোমাকে এনে দেব এই আমার সাধ ছিল—সন্দীপ বাবু তা জান্‌তেন—তাই উনি তাড়াতাড়ি—

আমি বল্লুম, কি হবে আমার ঐ গয়নার বাক্স নিয়ে—ও যাক্ না, তাতে ক্ষতি কি ?

অমূল্য বিস্মিত হয়ে বল্লে, যাবে কোথায় ?

সন্দীপ বল্লে, এ গয়না আমার—এ আমার রাণীর দেওয়া অর্ঘ্য।

অমূল্য পাগলের মত বলে উঠল, না, না, না,—কখনই না! দিদি, এ আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েচি, এ তুমি আর কাউকে দিতে পারবে না!

আমি বল্লুম, ভাই তোমার দান চিরদিন আমার মনে রইল, কিন্তু গয়নায় যার লোভ সে নিয়ে যাক্ না!

অমূল্য তখন হিংস্র জন্তুর মত সন্দীপের দিকে তাকিয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে বল্লে, দেখুন, সন্দীপবাবু, আপনি জানেন, আমি ফাঁসিকে ভয় করিনে। এ গয়নার বাক্স যদি আপনি নেন—

সন্দীপ বিদ্রূপের হাসি হাসবার চেষ্টা করে বল্লে, অমূল্য, তোমারও এতদিনে জানা উচিত তোমার শাসনকে আমি ভয়

করিনে। মক্ষিরাণী, এ গয়না আজ আমি নেব বলে আসি নি —তোমাকে দেব বলেই এসেছিলুম। কিন্তু আমার জিনিষ তুমি যে অমূল্যর হাত থেকে নেবে সেই অন্যায় নিবারণ করবার জন্যেই প্রথমে এ বাক্সে আমার দাবি স্পষ্ট করে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। এখন আমার এই জিনিষ তোমাকে আমি দান করচি,—এই রইল! এবারে ঐ বালকের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া কর, আমি চল্লুম। কিছুদিন থেকে তোমাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ কথা চল্‌চে, আমি তার মধ্যে নেই, যদি কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটে ওঠে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। অমূল্য তোমার তোরঙ্গ, বই প্রভৃতি যা-কিছু আমার ঘরে ছিল সমস্তই বাজারে তোমার বাসা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েচি। আমার ঘরে তোমার কোনো জিনিষ রাখা চল্‌বে না।

এই বলে সন্দীপ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল।

আমি বল্লুম, অমূল্য, তোমাকে আমার গয়না বিক্রি করতে দিয়ে অবধি মনে আমার শান্তি ছিল না।

কেন দিদি?

আমার ভয় হচ্ছিল এ গয়নার বাক্স নিয়ে পাছে তুমি বিপদে পড়—পাছে তোমাকে কেউ চোর বলে সন্দেহ করে' ধরে। আমার সে ছ হাজার টাকায় কাজ নেই। এখন আমার একটি কথা তোমাকে শুনতে হবে—এখনি তুমি বাড়ি যাও—যাও তোমার মায়ের কাছে।

অমূল্য চাদরের ভিতর থেকে একটা পুঁটুলি বের করে বল্লে, দিদি, ছ হাজার টাকা এনেচি।

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় পেলে ?

তার কোনো উত্তর না দিয়ে বল্লে, গিনির জন্যে অনেক চেষ্টা করলুম সে হল না, তাই নোট এনেচি।

অমূল্য, মাথা খাও সত্যি করে বল, এ-টাকা কোথায় পেলে ?

সে আপনাকে বলব না।

আমি চোখে যেন অন্ধকার দেখতে লাগলুম। বল্লুম—কি কাণ্ড করেচ অমূল্য ? এ টাকা কি—

অমূল্য বলে উঠল, আমি জানি তুমি বল্‌বে এ টাকা আমি অন্যায় করে এনেচি—আচ্ছা তাই স্বীকার। কিন্তু যত বড় অন্যায় তত বড়ই দাম, সে দাম আমি দিয়েচি। এখন এ-টাকা আমার।

এ টাকার সমস্ত বিবরণ আমার আর শুন্‌তে ইচ্ছে হল না। শিরগুলো সঙ্কুচিত হয়ে আমার সমস্ত শরীরকে যেন গুটিয়ে আন্‌তে লাগ্‌ল। আমি বল্লুম, নিয়ে যাও অমূল্য, এ-টাকা যেখান থেকে নিয়ে এসেচ এখনি সেখানে দিয়ে এস।

সে যে বড় শক্ত কথা।

না, শক্ত নয় ভাই। কি কুক্ষণে তুমি আমার কাছে এসেছিলে ! সন্দীপও তোমার যত বড় অনিষ্ট করতে পারেনি আমি তাই করলুম !

সন্দীপের নামটা যেন তাকে খোঁচা মারলে। সে বল্লে, সন্দীপ ! তোমার কাছে এলুম বলেই ত ওকে চিন্‌তে পেরেচি। জান, দিদি, তোমার কাছ থেকে সেদিন ও যে-ছহাজার টাকার গিনি নিয়ে গেছে তার থেকে এক পয়সাও খরচ করেনি। এখান থেকে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রুমাল থেকে

সমস্ত গিনি মেজের উপর ঢেলে রাশ করে তুলে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বল্লে, এ টাকা নয়, এ ঐশ্বর্য্য-পারিজাতের পাপ্‌ড়ি,—এ অলকাপুরীর বাঁশি থেকে সুরের মত ঝরে পড়তে পড়তে শক্ত হয়ে উঠেছে, এ'কে ত ব্যাঙ্কনোটে ভাঙানো চলে না, এ যে সুন্দরীর কণ্ঠহার হয়ে থাকবার কামনা করচে—ওরে অমূল্য, তোরা এ'কে স্থূলদৃষ্টিতে দেখিস্‌নে, এ হচ্চে লক্ষ্মীর হাসি, ইন্দ্রাণীর লাবণ্য—না, না, ঐ অরসিক নায়েবটার হাতে পড়বার জন্যে এর সৃষ্টি হয়নি। দেখ অমূল্য, নায়েবটা নিছক মিথ্যা কথা বলেচে, পুলিশ সেই নৌকোচুরির কোনো খবর পায়নি—ও এই সুযোগে কিছু করে নিতে চায়। দেখ অমূল্য, নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠি-তিনটে আদায় করতে হবে।—আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেমন করে?—সন্দীপ বল্লে, জোর করে, ভয় দেখিয়ে!—আমি বল্লুম, রাজি আছি, কিন্তু এই গিনিগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে।—সন্দীপ বল্লে, আচ্ছা সে হবে।—কেমন করে ভয় দেখিয়ে নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠিগুলি আদায় করে পুড়িয়ে ফেলেচি সে অনেক কথা।—সেই রাত্রেই আমি সন্দীপের কাছে এসে বলেচি, আর ভয় নেই, গিনিগুলি আমাকে দিন, কাল সকালেই আমি দিদিকে ফিরিয়ে দেব।—সন্দীপ বল্লে, এ কোন্‌ মোহ তোমাকে পেয়ে বস্‌ল! এবার দিদির আঁচলে দেশ ঢাকা পড়ল বুঝি! বল বন্দেমাতরং—মোহ্‌ কেটে যাক্‌!—তুমি ত জান, দিদি, সন্দীপ কি মন্ত্র জানে! গিনি তারই কাছে রইল। আমি অন্ধকার রাত্রে পুকুরের ঘাটের চাতালের উপরে বসে বন্দে মাতরং জপতে লাগলুম। কাল যখন তুমি গয়না বেচতে দিলে

তখন সন্ধ্যার সময় আবার ওর কাছে গেলুম। বেশ বুঝলুম, তখন ও আমার উপরে রাগে জ্বলচে। সে রাগ প্রকাশ করলে না; বল্লে, দেখ, যদি আমার কোনো বাক্সয় সে গিনি থাকে ত নিয়ে যাও। বলে' আমার গায়ের উপর চাবির গোছাটা ফেলে দিলে। কোথাও নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় রেখেচেন বলুন। —সন্দীপ বল্লে, আগে তোমার মোহ ভাঙবে তারপরে আমি বল্‌ব। এখন নয়।—আমি দেখলুম কিছুতেই তাকে নড়াতে পারব না, তখন আমাকে অন্য উপায় নিতে হয়েছিল। এর পরেও ওকে এই ছ হাজার টাকা নোট দেখিয়ে সেই গিনি-ক'টা নেবার অনেক চেষ্টা করেচি। গিনি এনে দিচ্চি বলে আমাকে ভুলিয়ে রেখে ওর শোবার ঘর থেকে আমার তোরঙ্গ ভেঙে গয়নার বাক্স নিয়ে তোমার কাছে এসেচে—এ বাক্স তোমার কাছে আমাকে নিয়ে আস্‌তে দিলে না! আবার বলে কিনা এ গয়না ওরি দান! আমাকে যে কতখানি বঞ্চিত করেচে সে আমি কাকে বল্‌ব? এ আমি কখনো মাপ করতে পারবনা।—দিদি ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেছে। তুমিই ছুটিয়ে দিয়েচ।

আমি বল্লুম, ভাই আমার, আমার জীবন সার্থক হয়েচে। কিন্তু, অমূল্য, এখনো বাকি আছে। শুধু মায়া কাটালে হবে না, যে কালী মেখেছি সে ধুয়ে ফেল্‌তে হবে। দেরি কোরো না, অমূল্য, এখনি যাও, এ টাকা যেখান থেকে এনেচ সেইখানেই রেখে এস। পারবে না, লক্ষ্মী ভাই?

তোমার আশীর্ব্বাদে পারব দিদি।

এ শুধু তোমার একলার পারা নয়। এর মধ্যে যে আমারও

পারা আছে। আমি মেয়েমানুষ বাইরের রাস্তা আমার বন্ধ, নইলে তোমাকে আমি যেতে দিতুম না, আমিই যেতুম। আমার পক্ষে এইটেই সব চেয়ে কঠিন শাস্তি, যে, আমার পাপ তোমাকে সাম্‌লাতে হচ্চে।

ও-কথা বোলোনা দিদি! যে-রাস্তায় চলেছিলুম সে তোমার রাস্তা নয়। সে-রাস্তা দুর্গম বলেই আমার মনকে টেনেছিল। দিদি, এবার তোমার রাস্তায় ডেকেচ—এ রাস্তা আমার আরও হাজার গুণে দুর্গম হোক্, কিন্তু তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে জিতে আস্‌বো—কোনো ভয় নেই! তাহলে এ টাকা যেখান থেকে এনেচি সেইখানেই ফিরিয়ে দিতে হবে এই তোমার হুকুম?

আমার হুকুম নয় ভাই, উপরের হুকুম।

সে আমি জানিনে। সেই উপরের হুকুম তোমার মুখ দিয়ে এসেচে এই আমার যথেষ্ট। কিন্তু দিদি তোমার কাছে আমার নিমন্ত্রন্ন আছে। সেইটে আজ আদায় করে তবে যাব। প্রসাদ দিতে হবে। তার পরে সন্ধ্যের মধ্যেই যদি পারি কাজ সেরে আসব।

হাস্‌তে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল—বল্লুম, আচ্ছা!

অমূল্য চলে যেতেই আমার বুক দমে গেল। কোন্ মায়ের বাছাকে বিপদে ভাসালুম! ভগবান, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন সর্ব্বনেশে ঘটা করে' কেন? এত লোককে নিমন্ত্রণ? আমার একলায় কুলল না? এত মানুষকে দিয়ে তার ভার বহন করাবে? আহা ঐ ছেলেমানুষকে কেন মারবে?

তাকে ফিরে ডাকলুম, অমূল্য!—আমার গলা এমন ক্ষীণ হয়ে

বাজল, সে শুন্‌তে পেলে না। দরজার কাছে গিয়ে আবার ডাক্‌লুম, অমূল্য! তখন সে চলে গেছে।

বেহারা, বেহারা!

কি রাণী মা!

অমূল্যবাবুকে ডেকে দে!

কি জানি, বেহারা অমূল্যর নাম বোধ হয় জানে না, তাই সে একটু পরেই সন্দীপকে ডেকে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বল্লে, যখন তাড়িয়ে দিলে তখনি জানতুম ফিরে ডাক্‌বে। যে-চাঁদের টানে ভাঁটা সেই-চাঁদের টানেই জোয়ার। এম্‌নি নিশ্চয় জানতুম তুমি ডাক্‌বে যে, আমি দরজার কাছে অপেক্ষা করে বসেছিলুম। যেম্‌নি তোমার বেহারাকে দেখেচি অম্‌নি সে কিছু বলবার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্চি, এখনি যাচ্চি!—ভোজপুরীটা আশ্চর্য্য হয়ে হাঁ করে রইল। ভাবলে লোকটা মন্ত্রসিদ্ধ। মক্ষিরাণী, সংসারে সব চেয়ে বড় লড়াই এই মন্ত্রের লড়াই। সম্মোহনে সম্মোহনে কাটাকাটি। এর বাণ শব্দ-ভেদী বাণ—আবার নিঃশব্দভেদী বাণও আছে! এতদিন পরে এ লড়াইয়েই সন্দীপের সমকক্ষ মিলেচে। তোমার তূণে অনেক বাণ আছে, রণরঙ্গিণী! পৃথিবীর মধ্যে দেখলুম, কেবল তুমিই সন্দীপকে আপন ইচ্ছামতে ফেরাতে পারলে, আবার আপন ইচ্ছামতে টেনে আনলে। শিকার ত এসে পড়ল। এখন এ'কে নিয়ে কি করবে বল? একেবারে নিঃশেষে মারবে, না, তোমার খাঁচায় পূরে রাখবে? কিন্তু আগে থাক্‌তে বলে রাখচি, রাণী, এই জীবটিকে বধ করাও যেমন শক্ত, বদ্ধ করাও তেমনি!

অতএব দিব্য অস্ত্র তোমার হাতে যা আছে তার পরীক্ষা করতে বিলম্ব কোরোনা।

সন্দীপের মনের ভিতরে একটা পরাভবের সংশয় এসেচে বলেই সে আজ এমন অনর্গল বকে গেল। আমার বিশ্বাস, ও জান্‌ত আমি অমূল্যকেই ডেকেচি—বেহারা খুব সম্ভব তারই নাম বলেছিল ও তাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে এসে উপস্থিত হয়েচে। আমাকে বল্‌তে দেবার সময় দিলে না যে, ওকে ডাকিনি, অমূল্যকে ডেকেচি। কিন্তু আস্ফালন মিথ্যে—এবার দুর্ব্বলকে দেখতে পেয়েচি। এখন আমার জয়লব্ধ জায়গাটির সূচ্যগ্রভূমিও ছাড়তে পারব না।

আমি বল্লুম, সন্দীপবাবু, আপনি গল্‌গল্‌ করে এত কথা বলে যান কেমন করে? আগে থাক্‌তে বুঝি তৈরি হয়ে আসেন?

একমুহূর্ত্তে সন্দীপের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। আমি বল্লুম, শুনেচি কথকদের খাতায় নানারকমের লম্বালম্বা বর্ণনা লেখা থাকে, যখন যেটা যেখানে দরকার খাটিয়ে দেয়। আপনার সে-রকম খাতা আছে নাকি?

সন্দীপ চিবিয়ে চিবিয়ে বল্‌তে লাগল, বিধাতার প্রসাদে তোমাদের ত হাবভাব ছলাকলার অন্ত নেই, তার উপরেও দরজির দোকান স্যাকরার দোকান তোমাদের সহায়, আর বিধাতা কি আমাদেরই এমনি নিরস্ত্র করে রেখেচেন যে—

আমি বল্লুম, সন্দীপবাবু, খাতা দেখে আসুন—এ-কথাগুলো ঠিক হচ্চে না। দেখচি এক-একবার আপনি উল্টোপাল্টা বলে বসেন—খাতা-মুখস্থর ঐ একটা মস্ত দোষ।

সন্দীপ আর থাক্‌তে পারলে না—একেবারে গর্জ্জে উঠল,

তুমি! তুমি আমাকে অপমান করবে! তোমার কী না আমার কাছে ধরা পড়েচে, বল ত? তোমার যে—

ওর মুখ দিয়ে আর কথা বেরল না। সন্দীপ যে মন্ত্রব্যবসায়ী, মন্ত্র যে-মুহূর্ত্তে খাটে না সে-মুহূর্ত্তেই ওর আর জোর নেই—রাজা থেকে একেবারে রাখাল হয়ে যায়! দুর্ব্বল! দুর্ব্বল! ও যতই রূঢ় হয়ে উঠে কর্কশ কথা বলতে লাগল ততই আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। আমাকে বাঁধবার নাগপাশ ওর ফুরিয়ে গেছে— আমি মুক্তি পেয়েচি। বাঁচা গেছে, বাঁচা গেছে। অপমান কর, আমাকে অপমান কর, এইটেই তোমার সত্য, আমাকে স্তব কোরো না, সেইটেই মিথ্যা।

এমন সময় আমার স্বামী ঘরের মধ্যে এলেন। অন্য দিন সন্দীপ মুহূর্ত্তেই আপনাকে যেরকম সাম্‌লে নেয় আজ তার সে-শক্তি ছিল না। আমার স্বামী তার মুখের দিকে চেয়ে একটু আশ্চর্য্য হলেন। আগে হলে আমি এ'তে লজ্জা পেতুম। কিন্তু স্বামী যাই মনে করুন না আমি আজ খুসি হলুম। আমি ঐ দুর্ব্বলকে দেখে নিতে চাই।

আমরা দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইলুম দেখে আমার স্বামী একটু ইতস্তত করে চৌকিতে বস্‌লেন। বল্লেন, সন্দীপ, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম, শুনলুম এই ঘরেই আছ।

সন্দীপ কথাটার উপর একটু বিশেষ ঝোক দিয়ে বল্লে, হাঁ, মক্ষিরাণী সকালেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যে মৌচাকের দাসমক্ষিকা, কাজেই হুকুম শুনেই সব কাজ ফেলে চলে আস্‌তে হল।

স্বামী বল্লেন, কাল কলকাতায় যাচ্চি, তোমাকে যেতে হবে।

সন্দীপ বল্লে, কেন বল দেখি? আমি কি তোমার অনুচর না কি?

আচ্ছা, তুমিই কলকাতায় চল, আমিই তোমার অনুচর হব।

কলকাতায় আমার কাজ নেই।

সেই জন্যেই ত কলকাতায় যাওয়া তোমার দরকার। এখানে তোমার বড্ড বেশি কাজ।

আমি ত নড়চি নে।

তাহলে তোমাকে নাড়াতে হবে।

জোর?

হাঁ জোর।

আচ্ছা বেশ—নড়ব। কিন্তু জগৎটা ত কলকাতা আর তোমার এলাকা এই দুই ভাগে বিভক্ত নয়। ম্যাপে আরও জায়গা আছে।

তোমার গতিক দেখে মনে হয়েছিল জগতে আমার এলেকা ছাড়া আর-কোনো জায়গাই নেই।

সন্দীপ তখন দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে,—মানুষের এমন অবস্থা আসে যখন সমস্ত জগৎ এতটুকু জায়গায় এসে ঠেকে। তোমার এই বৈঠকখানাটির মধ্যে আমার বিশ্বকে আমি প্রত্যক্ষ করে দেখেচি—সেই জন্যেই এখান থেকে নড়িনে। মক্ষিরাণী, আমার কথা এরা কেউ বুঝতে পারবে না—হয়ত তুমিও বুঝবে না। আমি তোমাকে বন্দনা করি। আমি তোমারই বন্দনা করতে চল্লুম। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্র বদল হয়ে গেছে। বন্দে মাতরং নয়—বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং। মা আমাদের

রক্ষা করেন—প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন—বড় সুন্দর সেই বিনাশ। সেই মরণ-নৃত্যের নূপূর-ঝঙ্কার বাজিয়ে তুলেচ আমার হৃৎপিণ্ড! এই কোমলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বাংলা দেশের রূপ তুমি তোমার এই ভক্তের চক্ষে এক মুহূর্ত্তে বদলে দিয়েচ—দয়ামায়া তোমার নেই গো—এসেচ মোহিনী, তুমি তোমার বিষ পাত্র নিয়ে—সেই বিষ পান করে সেই বিষে জর্জ্জর হয়ে, হয় মরব, নয় মৃত্যুঞ্জয় হব! মাতার দিন আজ নেই—প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া, দেবতা স্বর্গ ধর্ম্ম সত্য সব তুমি তুচ্ছ করে দিয়েচ, পৃথিবীর আর-সমস্ত সম্বন্ধ আজ ছায়া, নিয়ম-সংযমের সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন! প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া, তুমি যে-দেশে দুটি পা দিয়ে দাঁড়িয়েছ তার বাইরের সমস্ত পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারই ছাইয়ের উপর আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য করতে পারি! এরা ভালোমানুষ, এরা অত্যন্ত ভালো—এরা সবার ভালো করতে চায়—যেন সবই সত্য। কখনই না, এমন সত্য বিশ্বে আর কোথাও নেই, এই আমার একমাত্র সত্য। বন্দনা করি তোমাকে—তোমার প্রতি নিষ্ঠা আমাকে নিষ্ঠুর করেচে, তোমার পরে ভক্তি আমার মধ্যে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়েচে,—আমি ভালো নই, আমি ধার্ম্মিক নই, আমি পৃথিবীতে কিছুই মানিনে, আমি যাকে সকলের চেয়ে প্রত্যক্ষ করতে পেরেচি কেবলমাত্র তাকেই মানি!

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এই কিছু-আগেই আমি এ'কে সমস্ত মন দিয়ে ঘৃণা করেছিলুম! যাকে ছাই বলে দেখেছিলুম তার মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে উঠেচে। এ একেবারে খাঁটি আগুন

তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিধাতা এমন করে মিশিয়ে কেন মানুষকে তৈরি করেন? সে কি কেবল তাঁর অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাবার জন্যে? আধ ঘণ্টা আগেই আমি মনে মনে ভাবছিলুম এই মানুষটাকে একদিন রাজা বলে ভ্রম হয়েছিল বটে কিন্তু এ যাত্রার দলের রাজা,—তা নয় তা নয়—যাত্রার দলের পোষাকের মধ্যেও এক-এক সময় রাজা লুকিয়ে থেকে যায়। এর মধ্যে অনেক লোভ, অনেক স্থূল, অনেক ফাঁকি আছে, স্তরে স্তরে মাংসের মধ্যে এ ঢাকা, কিন্তু তবুও—আমরা জানিনে, আমরা শেষ কথাটাকে জানিনে, এইটেই স্বীকার করা ভালো, আপনাকেও জানিনে। মানুষ বড় আশ্চর্য্য—তাকে নিয়ে কি প্রচণ্ড রহস্যই তৈরি হচ্চে তা সেই রুদ্র দেবতাই জানেন—মাঝের থেকে দগ্ধ হয়ে গেলুম! প্রলয়! প্রলয়ের দেবতাই শিব, তিনিই আনন্দময়, তিনি বন্ধন মোচন কর্ব্বেন।

কিছুদিন থেকে বারেবারে মনে হচ্চে আমার দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারচে সন্দীপের এই প্রলয়-রূপ ভয়ঙ্কর—আর-এক বুদ্ধি বল্‌চে এই ত মধুর। জাহাজ যখন ডোবে তখন চারদিকে যারা সাঁতার দেয় তাদের টেনে নেয়—সন্দীপ যেন সেই মরণের মূর্ত্তি—ভয় ধরবার আগেই ওর প্রচণ্ড টান এসে ধরে—সমস্ত আলো সমস্ত কল্যাণ থেকে, আকাশের মুক্তি থেকে, নিশ্বাসের বাতাস থেকে, চিরদিনের সঞ্চয় থেকে, প্রতিদিনের ভাবনা থেকে চোখের পলকে একটা নিবিড় সর্ব্বনাশের মধ্যে একেবারে লোপ করে দিতে চায়। কোন্ মহামারীর দূত হয়ে ও এসেচে—অশিব মন্ত্র পড়তে-পড়তে রাস্তা দিয়ে চলেছে,

আর ছুটে আস্‌চে দেশের সব বালকরা সব যুবকরা। বাংলাদেশের হৃদয়পদ্মে যিনি মা বসে আছেন তিনি কেঁদে উঠেচেন—তাঁর অমৃতভাণ্ডারের দরজা ভেঙে ফেলে এরা সেখানে মদের ভাণ্ড নিয়ে পানসভা বসিয়েছে—ধূলার উপর ঢেলে ফেলতে চায় সব সুধা, চুরমার করতে চায় চিরদিনের সুধাপাত্র! সবই বুঝলুম কিন্তু মোহকে ত ঠেকিয়ে রাখতে পারিনে! সত্যের কঠোর তপস্যার পরীক্ষা করবার জন্যে সত্যদেবেরই এই কাজ—মাৎলামি স্বর্গের সাজ পরে এসে তাপসদের সাম্‌নে নৃত্য করতে থাকে—বলে, তোমরা মূঢ়, তপস্যায় সিদ্ধি হয় না, তার পথ দীর্ঘ, তার কাল মন্থর—তাই বজ্রধারী আমাকে পাঠিয়েচেন—আমি তোমাদের বরণ করব,—আমি সুন্দরী, আমি মত্ততা, আমার আলিঙ্গনেই নিমেষের মধ্যে সমস্ত সিদ্ধি।

একটুখানি চুপ করে থেকে সন্দীপ আবার আমাকে বল্লে, এবার দূরে যাবার সময় এসেচে দেবী! ভালোই হয়েচে। তোমার কাছে আসার কাজ আমার হয়ে গেছে। তার পরেও যদি থাকি তাহলে একে-একে আবার সব নষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড় তাকে লোভে পড়ে সস্তা করতে গেলেই সর্ব্বনাশ ঘটে—মুহূর্ত্তের অন্তরে যা অনন্ত তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়। আমরা সেই অনন্তকে নষ্ট করতে বসেছিলুম—ঠিক এমন সময়ে তোমারই বজ্র উদ্যত হল, তোমার পূজাকে তুমি রক্ষা করলে, আর তোমার এই পূজারিকেও। আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সকলের চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌ল। দেবী, আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলুম—আমার মাটির

মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না,—এ মন্দির প্রত্যেক পলকে ভাঙবে-ভাঙবে করছিল—আজ তোমার বড় মূর্ত্তিকে বড় মন্দিরে পূজা করতে চল্লুম—তোমার কাছ থেকে দূরেই তোমাকে সত্য করে পাব—এখানে তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, সেখানে তোমার কাছ থেকে বর পাব!

টেবিলের উপর আমার গয়নার বাক্স ছিল। আমি সেটা তুলে ধরে বল্লুম, আমার এই গয়না আমি তোমার হাত দিয়ে যাঁকে দিলুম তাঁর চরণে তুমি পৌঁছে দিয়ো।

আমার স্বামী চুপ করে রইলেন। সন্দীপ বেরিয়ে চলে গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈরাগ্য

চুপ, চুপ, চুপ কর্ তোরা।

কেন, কি হয়েচে ?

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

সর্ব্বনাশ !

কেরে ? কে বাজায় বাঁশি ?

কেন ভাই, কি হয়েচে ?

মহারাজেব মন খারাপ হয়েচে।

সর্ব্বনাশ !

ছেলেগুলো দাপাদাপি করচে কার ?

আমাদের মণ্ডলদের।

মণ্ডলকে সাবধান করে দে ! ছেলেগুলোকে ঠেকাক্ !

মন্ত্রী কোথায় গেলেন ?

এই যে এখানেই আছি।

খবর পেয়েছেন কি ?

কি বল দেখি !

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

কিন্তু প্রত্যন্তবিভাগ থেকে যুদ্ধের সংবাদ এসেচে যে !

যুদ্ধ চলুক কিন্তু তার সংবাদটা এখন চল্‌বে না।

চীন সম্রাটের দূত অপেক্ষা করচেন।

অপেক্ষা করতে দোষ নেই কিন্তু সাক্ষাৎ পাবেন না।

ঐযে মহারাজ দর্পণ হাতে করে আস্‌চেন।

জয় হোক্ মহারাজের।

মহারাজ, সভায় যাবার সময় হল।

যাবার সময় হল বৈ কি, কিন্তু সভায় যাবার নয়!

সে কি কথা, মহারাজ?

সভা ভাঙবার ঘণ্টা বেজেচে শুনতে পেয়েচি।

কই, আমরা ত কেউ—

তোমরা শুন্‌বে কি করে? ঘণ্টা একেবারে আমারই কানের কাছে বাজিয়েচে।

এত বড় স্পর্দ্ধা কার হতে পারে?

মন্ত্রী, এখনো বাজাচ্চে।

মহারাজ, দাসের স্থূলবুদ্ধি মাপ করবেন, বুঝতে পারলুম না।

এই চেয়ে দেখ—

মহারাজের চুল—

ওখানে একজন ঘণ্টা-বাজিয়েকে দেখতে পাচ্চ না?

দাসের সঙ্গে পরিহাস?

পরিহাস আমার নয়, মন্ত্রী, যিনি পৃথিবীসুদ্ধ জীবের কানে ধরে পরিহাস করেন এ তাঁরই। গত রজনীতে আমার গলায় মল্লিকার মালা পরাবার সময় মহিষী চম্‌কে উঠে বল্লেন, এ কি মহারাজ, আপনার কানের কাছে দুটো পাকাচুল দেখচি যে!

মহারাজ এজন্য খেদ করবেন না—রাজবৈদ্য আছেন তিনি—

এ বংশের প্রথম রাজা ইক্ষাকুরও রাজবৈদ্য ছিলেন, তিনি কি

করতে পেরেছিলেন?—মন্ত্রী, যমরাজ আমার কানের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণপত্র ঝুলিয়ে রেখে দিয়েচেন। মহিষী এ দুটো চুল তুলে ফেল্‌তে চেয়েছিলেন, আমি বল্লুম, কি হবে রাণী? যমের পত্রই যেন সরালুম কিন্তু যমের পত্রলিখককে ত সরানো যায় না। অতএব এ পত্র শিরোধার্য্য করাই গেল!—এখন তাহলে—

যে আজ্ঞা, এখন তাহলে রাজকার্য্যের আয়োজন—

কিসের রাজকার্য্য! রাজকার্য্যের সময় নেই—শ্রুতিভূষণকে ডেকে আন।

সেনাপতি বিজয়বর্ম্মা—

না, বিজয়বর্ম্মা না, শ্রুতিভূষণ।

মহারাজ, এদিকে চীনসম্রাটের দূত—

তাঁর চেয়ে বড় সম্রাটের দূত অপেক্ষা করচেন। ডাক শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজ প্রত্যন্তসীমার সংবাদ—

মন্ত্রী প্রত্যন্ততম সীমার সংবাদ এসেচে, ডাক শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজের শ্বশুর—

আমি যাঁর কথা বল্‌চি তিনি আমার শ্বশুর নন্। ডাক শ্রুতিভূষণকে!

আমাদের কবিশেখর তাঁর কল্পমঞ্জরী কাব্য নিয়ে—

নিয়ে তিনি তাঁর কল্পদ্রুমের শাখায় প্রশাখায় আনন্দে সঞ্চরণ করুন, ডাক শ্রুতিভূষণকে।

যে আদেশ, তাঁকে ডাক্‌তে পাঠাচ্চি।

বোলো, সঙ্গে যেন তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথিটা আনেন।

প্রতিহারী, বাইরে ঐ কারা গোল করচে, বারণ কর, আমি একটু শান্তি চাই।

নাগপত্তনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, প্রজারা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।

আমার ত সময় নেই মন্ত্রী! আমি শান্তি চাই।

তারা বল্‌চে তাদের সময় আরো অনেক অল্প—তারা মৃত্যুর দ্বার প্রায় লঙ্ঘন করেচে—তারা ক্ষুধাশান্তি চায়।

মন্ত্রী, সময়ের মাপ কি বৎসর মাস দিয়ে হয়? আমার যা আয়োজন তাতে হাজার বছরও কিছু নয়, অথচ আজ যদি আমি কেবল আরো পঞ্চাশ বছর মাত্র বাঁচি সেটা কি ওদের ঐ পাঁচ দিনের চেয়ে বেশি?

তাহলে মহারাজ, ঐ হতভাগ্যদের—

ঐ হতভাগ্যদের প্রতি এই হতভাগ্যের উপদেশ এই যে, কাল-ধীবরের জাল ছিন্ন করবার জন্যে ছটফট করা বৃথা, আজই হোক্ কালই হোক্ সে টেনে তুল্‌বেই।

অতএব—

অতএব শ্রুতিভূষণকে প্রয়োজন এবং তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথি।

প্রজারা তাহলে দুর্ভিক্ষ—

দেখ মন্ত্রী, ভিক্ষা ত অন্নের নয়, ভিক্ষা আয়ুর। সেই ভিক্ষায় জগৎ জুড়ে দুর্ভিক্ষ—কি রাজার কি প্রজার—কে কাকে রক্ষা করবে?

অতএব—

অতএব শ্মশানেশ্বর শিব যেখানে ডমরুধ্বনি করচেন সেই-খানেই সকলের সব প্রার্থনা ছাইচাপা পড়বে—তবে কেন মিছে গলা ভাঙা! এই যে শ্রুতিভূষণ, প্রণাম!

শুভমস্তু!

শ্রুতিভূষণ মশায়, মহারাজকে একটু বুঝিয়ে বল্‌বেন যে অবসাদ-গ্রস্ত নিরুৎসাহকে লক্ষ্মী পরিহার করেন।

শ্রুতিভূষণ, মন্ত্রী আপনাকে কি বল্‌চেন?

উনি বল্‌চেন লক্ষ্মীর স্বভাব সম্বন্ধে মহারাজকে কিছু উপদেশ দিতে।

আপনার উপদেশ কি?

বৈরাগ্যবারিধিতে একটি চৌপদী আছে—

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন অবসানে
সেই পদ্ম মুদে দল সকলেই জানে।
গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃ পুনঃ
সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ কর, শুন মূঢ় শুন!

অহো, আপনার উপদেশের এক ফুৎকারেই আশা-প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা নির্ব্বাপিত হয়ে যায়। আমাদের আচার্য্য বলেচেন না—

দন্তং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চতি আশাভাণ্ডং!

মহারাজ, আশার কথা যদি তুল্লেন তবে বারিধি থেকে আর একটি চৌপদী শোনাই—

শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,
আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্ভুত এ ভবে।
সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,
সে বন্ধন ছাড়ে যারে স্থির হয়ে থাকে।

হায় হায় অমূল্য আপনার বাণী! শ্রুতিভূষণকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এখনি—ও কি মন্ত্রী, আবার কারা গোল করচে?

সেই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজারা।

ওদের এখনি শান্ত হতে বল।

তাহলে, মহারাজ, শ্রুতিভূষণকে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিন না—আমরা ততক্ষণ যুদ্ধের পরামর্শটা—

না, না, যুদ্ধ পরে হবে, শ্রুতিভূষণকে ছাড়তে পারচিনে।

মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দেবার কথা বলছিলেন কিন্তু সে দান যে ক্ষয় হয়ে যাবে। বৈরাগ্যবারিধি লিখচেন—

স্বর্ণদান করে যেই করে দুঃখ দান
যত স্বর্ণ ক্ষয় হয় ব্যথা পায় প্রাণ।
শত দাও, লক্ষ দাও, হয়ে যায় শেষ,
শূন্য ভাণ্ড ভরি শুধু থাকে মনঃক্লেশ।

আহা, শরীর রোমাঞ্চিত হল। প্রভু কি তাহলে—

না, আমি সহস্রমুদ্রা চাইনে!

দিন্ দিন্ একটু পদধূলি দিন্! সহস্র মুদ্রা চান্‌না। এত বড় কথা!

মহারাজ, এই সহস্র মুদ্রা অক্ষয় হয়ে যাতে মহারাজের পুণ্যফলকে অসীম করে আমি এমন কিছু চাই! গোধন-সমেত আপনার ঐ কাঞ্চনপুর জনপদটি যদি ব্রহ্মত্রদান করেন কেবলমাত্র ঐটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব কারণ বৈরাগ্যবারিধি বল্‌চেন—

বুঝেছি শ্রুতিভূষণ, এর জন্যে আর বৈরাগ্যবারিধির প্রমাণ দরকার নেই। মন্ত্রী, কাঞ্চনপুর জনপদটি যাতে শ্রুতিভূষণের বংশে চিরন্তন—আবার কি, বারবার কেন চীৎকার করচে?

চীৎকারটা বারবার করচে বটে কিন্তু কারণটা একই রয়ে গেছে। ওরা সেই মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

মহারাজ, ব্রাহ্মণী মহারাজকে বল্‌তে বলেচেন তিনি তাঁর সর্ব্বাঙ্গে মহারাজের যশোঝঙ্কার ধ্বনিত করতে চান কিন্তু আভরণের অভাববশত শব্দ বড়ই ক্ষীণ হয়ে বাজ্‌চে।

মন্ত্রী!

মহারাজ!

ব্রাহ্মণীর আভরণের অভাবমোচন করতে যেন বিলম্ব না হয়!

আর মন্ত্রীমশায়কে বলে দিন, আমরা সর্ব্বদাই পরমার্থচিন্তায় রত, বৎসরে বৎসরে গৃহসংস্কারের চিন্তায় মন দিতে হলে চিত্তবিক্ষেপ হয় অতএব রাজ-শিল্পী যদি আমার গৃহটি সুদৃঢ় করে নির্ম্মাণ করে দেয় তাহলে তার তলদেশে শান্তমনে বৈরাগ্য সাধন করতে পারি।

মন্ত্রী, রাজশিল্পীকে যথাবিধি আদেশ করে দাও।

মহারাজ, এবৎসর রাজকোষে ধনাভাব।

সে ত প্রতিবৎসরেই শুনে আসচি। মন্ত্রী তোমাদের উপর ভার ধন বৃদ্ধি করবার, আর আমার উপর ভার অভাব বৃদ্ধি করবার! এই দুইয়ে মিলে সন্ধি করে হয় ধনাভাব।

মহারাজ, মন্ত্রীকে দোষ দিতে পারিনে। উনি দেখচেন আপনার অর্থ, আর আমরা দেখচি আপনার পরমার্থ সুতরাং উনি যেখানে দেখতে পাচ্চেন অভাব আমরা সেইখানে দেখতে পাচ্চি ধন। বৈরাগ্যবারিধিতে লিখচেন—

রাজকোষ পূর্ণ হয়ে তবু শূন্যমাত্র,
যোগ্য হাতে যাহা পড়ে লভে সৎপাত্র।
পাত্র নাই ধন আছে, থেকেও না থাকা,
পাত্র হাতে ধন, সেই রাজকোষ পাকা।

আহা হা! আপনাদের সঙ্গ অমূল্য!

কিন্তু মহারাজের সঙ্গ কত মূল্যবান, শ্রুতিভূষণমশায় তা বেশ জানেন। তাহলে আসুন শ্রুতিভূষণ, বৈরাগ্যসাধনের ফর্দ্দ যা দিলেন সেটা সংগ্রহ করা যাক্! এই ক্ষয়শীল সংসারে উপকরণ প্রতিমুহূর্ত্তে হ্রাস হয়ে আসে এইজন্যই এখানে আরাম করে বৈরাগ্য করা এতই কঠিন!

চলুন তবে চলুন, বিলম্বে কাজ নেই। মন্ত্রী এই সামান্য বিষয় নিয়ে যখন এত অধীর হয়েচেন তখন ওঁকে শান্ত করে এখনি আবার ফিরে আসচি!

আমার সর্ব্বদা ভয় হয় পাছে আপনি রাজাশ্রয় ছেড়ে অরণ্যে চলে যান!

মহারাজ, মনটা মুক্ত থাকলে কিছুই ত্যাগ করতে হয় না—এই রাজগৃহে যতক্ষণ আমার সন্তোষ আছে ততক্ষণ এই যে আমার অরণ্য! এক্ষণে তবে আসি! মন্ত্রী, চল, চল।

ঐ যে কবিশেখর আস্‌চে—আমার তপস্যা ভাঙলে বুঝি! ওকে ভয় করি! ওরে পাকাচুল, কান ঢেকে থাক্‌রে, কবির বাণী যেন প্রবেশপথ না পায়!

মহারাজ, আপনার এই কবিকে না কি বিদায় করতে চান?

কবিত্ব যে বিদায়-সংবাদ পাঠালে এখন কবিকে রেখে হবে কি!

সংবাদটা কোথায় পৌঁছল?

ঠিক আমার কানের উপর! চেয়ে দেখ!

পাকাচুল? ওটাকে আপনি ভাবচেন কি?

যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে শাদা করার চেষ্টা!

কারিকরের মৎলব বোঝেন নি। ঐ শাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রং লাগবে।

কই রঙের আভাস ত দেখিনে!

সেটা গোপনে আছে। শাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

চুপ, চুপ, চুপ কর, কবি, চুপ কর!

মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হল ত হোক না! আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসচেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েচেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চল্‌চে।

আরে, আরে, তুমি দেখচি বিপদ বাধাবে কবি! যাও যাও তুমি যাও—ওরে শ্রুতিভূষণকে দৌড়ে ডেকে নিয়ে আয়!

তাঁকে কেন, মহারাজ?

বৈরাগ্যসাধন করব।

সেই খবর শুনেই ত ছুটে এসেচি, এ সাধনায় আমিই ত আপনার সহচর!

তুমি?

হাঁ মহারাজ, আমরাই ত পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

বুঝতে পারলুম না।

এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম তবু বুঝতে পারলে না? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য! সেইজন্যেই ত লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই!

তোমাদের মন্ত্রটা কি?

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি থালি আঁক্‌ড়ে বসে থাকিস্‌নে—বেরিয়ে পড়্‌ প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল!

সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হল?

তা নয় ত কি মহারাজ? সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে সেই ত বৈরাগী, সেই ত পথিক, সেই ত কবি-বাউলের চেলা!

তাহলে শান্তি পাব কি করে?

শান্তির উপরে ত আমাদের একটুও আসক্তি নেই, আমরা যে বৈরাগী।

কিন্তু ধ্রুব সম্পদটি ত পাওয়া চাই!

ধ্রুব সম্পদে আমাদের একটুও লোভ নেই, আমরা যে বৈরাগী।

সে কি কথা?—বিপদ বাধাবে দেখচি! ওরে শ্রুতিভূষণকে ডাক্‌!

আমরা অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী। আমরা কেবলি ছাড়তে ছাড়তে পাই তাই ধ্রুবটাকে মানিনে।

এ তোমার কি রকম কথা?

পাহাড়ের গুহা ছেড়ে যে নদী বেরিয়ে পড়েচে তার বৈরাগ্য কি দেখেন নি মহারাজ? সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে-দিতেই আপনাকে পায়, নদীর পক্ষে ধ্রুব হচ্চে বালির মরুভূমি—তার মধ্যে সেঁধলেই বেচারা গেল! তার দেওয়া যেম্‌নি ঘোচে অম্‌নি তার পাওয়াও ঘোচে!

ঐ শোন কবিশেখর, কান্না শোন। ঐ ত তোমার সংসার!

ওরা মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

আমার প্রজা? বল কি কবি? সংসারের প্রজা ওরা! এ দুঃখ কি আমি সৃষ্টি করেচি? তোমার কবিত্ব-মন্ত্রের বৈরাগীরা এ দুঃখের কি প্রতিকার করতে পারে বল ত?

মহারাজ, এ দুঃখকে ত আমরাই বহন করতে পারি! আমরা যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে বয়ে চলেচি। নদী কেমন করে ভার বহন করে দেখেচেন ত? মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই ত সে ভারকে কেবলি ভারী করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক চিরে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে তাই ত সে আপনার ভার লাঘব করেচে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েচি সকলের সব সুখ দুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক। আমাদের বৈরাগীর সর্দ্দার যিনি, তিনি এই সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেচেন তাই ত বসে থাক্‌তে পারিনে,—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে'
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পথের হাওয়ায় কি সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে,
বাজে বেদনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পূর্ণিমাতে সাগর হতে
ছুটে এল বান,
আমার লাগ্‌ল প্রাণে টান।

আপন মনে মেলে' আঁখি
আর কেন বা পড়ে থাকি
কিসের ভাবনায় ?
আমার ঘরে থাকাই দায় ॥

যাক্‌গে শ্রুতিভূষণ ! ওহে কবিশেখর, আমার কি মুস্কিল হয়েচে জান ? তোমার কথা আমি এক বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারিনে অথচ তোমার সুরটা আমার বুকে গিয়ে বাজে। আর শ্রুতিভূষণের ঠিক তার উল্টো ;—তার কথাগুলো খুবই স্পষ্ট বোঝা যায় হে,—ব্যাকরণের সঙ্গেও মেলে—কিন্তু সুরটা—সে আর কি বলব !

মহারাজ, আমাদের কথা ত বোঝবার জন্যে হয়নি, বাজবার জন্যে হয়েচে !

এখন তোমার কাজটা কি বল ত কবি ?

মহারাজ, ঐ যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেচে ঐ কান্নার মাঝখান দিয়ে এখন ছুটতে হবে।

ওহে কবি, বল কি তুমি ! এ সমস্ত কেজোলোকের কাজ, দুর্ভিক্ষের মধ্যে তোমরা কি করবে ?

কেজোলোকেরা কাজ বেসুরো করে ফেলে, তাই, সুর বাঁধবার জন্যে আমাদের ছুটে আস্‌তে হয় !

ওহে কবি, আর একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা কও !

মহারাজ, ওরা কর্ত্তব্যকে ভালোবাসে বলে কাজ করে আমরা প্রাণকে ভালবাসি বলে কাজ করি—এইজন্যে ওরা আমাদের গাল দেয়, বলে নিষ্কর্ম্মা, আমরা ওদের গাল দিই, বলি নির্জ্জীব!

কিন্তু জিৎটা হল কার?

আমাদের, মহারাজ, আমাদের!

তার প্রমাণ?

পৃথিবীতে যা কিছু সকলের বড় তার প্রমাণ নেই। পৃথিবীতে যত কবি যত কবিত্ব সমস্ত যদি ধুয়েমুছে ফেলতে পার তাহলেই প্রমাণ হবে এতদিন কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফসলক্ষেতের মূলের রস জুগিয়ে এসেচে কারা! মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে ঐ যে কান্না উঠেচে সে কান্না থামায় কারা? যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেচে তারা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েচে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েচে তারাও নয়, যারা কর্ত্তব্যের শুষ্করুদ্রাক্ষের মালা জপ্‌চে তারাও নয়, যারা অপর্য্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েচে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, যাদের সাধনা কেবলই কর্ম্মের সাধনা নয় প্রাণের সাধনা, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায় তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে,—সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সবচেয়ে বড় বৈরাগ্যের মন্ত্র!

ওহে কবি, তাহলে তুমি আমাকে কি করতে বল?

উঠ্‌তে বলি, মহারাজ, চল্‌তে বলি! ঐ যে কান্না, ওযে প্রাণের

কাছে প্রাণের আহ্বান! কিছু করতে পারব কিনা সে পরের কথা—কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি না দুলে ওঠে তবে অকর্ত্তব্য হল বলে ভাবনা নয়, তবে ভাবনা মরেচি বলে!

কিন্তু মরবই যে, কবিশেখর, আজ হোক্ আর কাল হোক্!

কে বল্লে মহারাজ! মিথ্যা কথা! যখন দেখচি বেঁচে আছি তখন জানচি যে বাঁচবই;—যে আপনার সেই বাঁচাটাকে সব দিক থেকে যাচাই করে দেখলে না সেই বলে মরব—সেই বলে "নলিনীদলগত জলমতি তরলং তদ্বৎজীবনমতিশয় চপলং।"

কি বল হে, কবি, জীবন চপল নয়?

চপল বই কি, কিন্তু অনিত্য নয়। চপল জীবনটা চিরদিন চপলতা করতে-করতেই চল্‌বে। মহারাজ, আজ তুমি তার চপলতা বন্ধ করে মরবার পালা অভিনয় করতে বসেচ?

ঠিক বল্‌চ কবি? আমরা বাঁচবই?

বাঁচবই!

যদি বাঁচবই তবে ত বাঁচার মত করেই বাঁচতে হবে—কি বল!

হাঁ মহারাজ!

প্রতিহারী!

কি মহারাজ!

ডাক, ডাক, মন্ত্রীকে এখনি ডাক।

কি মহারাজ।

মন্ত্রী, আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেচ কেন?

ব্যস্ত ছিলুম।

কিসে?

বিজয়বর্ম্মাকে বিদায় করে দিতে।

কি মুস্কিল! বিদায় করবে কেন? যুদ্ধের পরামর্শ আছে যে!

চীনের সম্রাটের দূতের জন্যে বাহনের ব্যবস্থা—

কেন, বাহন কিসের জন্যে?

মহারাজের ত দর্শন হবেনা তাই তাঁকে ফিরিয়ে দেবার—

মন্ত্রী আশ্চর্য্য করলে দেখচি—রাজকার্য্য কি এমনি করেই চল্‌বে? হঠাৎ তোমার হল কি?

তার পরে আমাদের কবিশেখরের বাসা ভাঙবার জন্যে লোকের সন্ধান কর্‌ছিলুম—আর ত কেউ রাজি হয় না, কেবল দিঙ্‌নাগের বংশে যাঁরা অলঙ্কারের আর ব্যাকরণ শাস্ত্রের টোল খুলেচেন তাঁরা দলে দলে সাবল হাতে ছুটে আস্‌চেন।

সর্ব্বনাশ! মন্ত্রী পাগল হলে না কি? কবিশেখরের বাসা ভেঙে দেবে? আর আজ ফাল্গুনে বসন্তের নিকুঞ্জবনের পাখীগুলোকে নিয়ে পলায় প্রস্তুত করতে চাও না কি?

ভয় নেই মহারাজ, বাসাটা একেবারে ভাঙতে হবে না। শ্রুতিভূষণ খবর পেয়েই স্থির করেচেন কবিশেখরের ঐ বাসাটা আজ থেকে তিনি দখল করবেন।

কি বিপদ! সরস্বতী যে তা হলে তাঁর বীণাখানা আমার মাথার উপর আছড়ে ভেঙে ফেলবেন! না, না, সে হবে না!

আর একটা কাজ ছিল—শ্রুতিভূষণকে কাঞ্চনপুরের সেই বৃহৎ জনপদটা—

ও হো, সেই জনপদটার দানপত্র তৈরি হয়েচে বুঝি? সেটা কিন্তু আমাদের এই কবিশেখরকে—

সে কি কথা মহারাজ! আমার পুরস্কার ত জনপদ নয়—আমরা জন-পদের সেবা ত কখনো করিনি—তাই ঐ পদপ্রাপ্তিটা আশাও করিনে।

আচ্ছা, তবে ওটা শ্রুতিভূষণের জন্যেই থাক্!

আর, মহারাজ, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের বিদায় করবার জন্যে সৈন্যদলকে আহ্বান করেচি।

মন্ত্রী আজ দেখচি পদে পদে তোমার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘট্‌চে। দুর্ভিক্ষকাতর প্রজাদের বিদায় করবার ভালো উপায় অন্ন দিয়ে, সৈন্য দিয়ে নয়।

মহারাজ!

কি প্রতিহারী!

বৈরাগ্যবারিধি নিয়ে শ্রুতিভূষণ এসেচেন!

সর্ব্বনাশ করলে! ফেরাও তাকে ফেরাও! মন্ত্রী দেখো হঠাৎ যেন শ্রুতিভূষণ না এসে পড়ে! আমার দুর্ব্বল মন, হয়ত সাম্‌লাতে পারব না, হয়ত অন্যমনস্ক হয়ে বৈরাগ্যবারিধির ডুব-জলে গিয়ে পড়ব। ওহে কবিশেখর, আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না—প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখ—একটা যা-হয়-কিছু কর—যেমন এই ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুসি-তাই করচে তেমনিতর! হাতে কিছু তৈরি আছে হে? একটা নাটক, কিম্বা প্রকরণ, কিম্বা রূপক, কিম্বা ভাণ, কিম্বা—

তৈরি আছে—কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভাণ তা ঠিক বলতে পারব না!

যা রচনা করেচ তার অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে পারব?

না মহারাজ! রচনা ত অর্থ গ্রহণ করবার জন্যে নয়।

তবে?

সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্যে। আমি ত বলেচি আমার এ সব জিনিস বাঁশির মত, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।

বল কি হে কবি, এর মধ্যে তত্ত্বকথা কিছুই নেই?

কিচ্ছু না!

তবে তোমার ও রচনাটা বল্‌চে কি?

ও বল্‌চে, আমি আছি! শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ? শিশু হঠাৎ শুন্‌তে পায় জলস্থল আকাশ তাকে চারদিক থেকে বলে উঠেচে—"আমি আছি"—তারই উত্তরে ঐ প্রাণটুকু সাড়া দিয়ে ওঠে—"আমি আছি!" আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া!

তার বেশি আর কিচ্ছু না?

কিচ্ছু না! আমার রচনার মধ্যে প্রাণ বলে' উঠেচে, সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে জয় এই আমি-আছির জয়, জয় এই আনন্দময় আমি-আছির জয়!

ওহে কবি, তত্ত্ব না থাক্‌লে আজকের দিনে তোমার এ জিনিস্ চল্‌বে না।

সে কথা সত্য মহারাজ! আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জ্জন করতে চায় উপলব্ধি করতে চায় না! ওরা বুদ্ধিমান!

তা হলে শ্রোতা কাদের ডাকা যায়, টোলের নবীন ছাত্রদের ডাকব কি?

না মহারাজ, তারা কাব্য শুনেও তর্ক করে! নতুন শিং-ওঠা হরিণশিশুর মত ফুলের গাছকেও গুঁতো মেরে মেরে বেড়ায়!

তবে?

ডাক দেবেন যাদের চুলে পাক ধরেচে।

সে কি কথা কবি?

হাঁ মহারাজ, সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েচে। তারা আর ফল চায় না, ফল্‌তে চায়!

ওহে কবি, তবে ত এতদিন পরে ঠিক আমার কাব্য শোনবার বয়েস হয়েচে। তাহলে বিজয়বর্ম্মাকেও ডাকা যাক্!

ডাকুন্!

চীনসম্রাটের দূতকে?

ডাকুন!

আমার শ্বশুর এসেছেন শুন্‌চি—

তাঁকে ডাক্‌তে পারেন—কিন্তু শ্বশুরের ছেলেটির সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

তাই বলে' শ্বশুরের মেয়ের কথাটা ভুলোনা কবি।

আমি ভুল্‌লেও তাঁর সম্বন্ধে ভুল হবার আশঙ্কা নেই।

আর শ্রুতিভূষণকে?

না মহারাজ, তাঁর প্রতি ত আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই, তাঁকে কেন দুঃখ দিতে যাব?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর্য্যধর্ম্মের সহিত বাহ্যধর্ম্মের যোগাযোগ

সম্প্রতি আমাদের মাসিকপত্রে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি নিয়ে একটি তর্ক উপস্থিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, ও দুটি ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম হতে উৎপন্ন হয়েছে; শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় বলেন, তা নয়। এ সমস্যার মীমাংসা করা আমার সাধ্যাতীত। তবে এ আলোচনায় যোগদান করবার অধিকারে ইংরাজিশিক্ষিত লোকেরাও বঞ্চিত নন্, কেননা যাকে আমরা হিন্দুসভ্যতা বলি তা কোন্ অংশে আর্য্য, আর কোন্ অংশে অনার্য্য এ কথা জানবার কৌতূহল বিশেষ করে আমাদেরই আছে।

বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় যাকে আর্য্যধর্ম্ম বলেন তাকে বৈদিক ধর্ম্ম বলাই শ্রেয়। কেননা, আর্য্য বল্‌তে ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ থাক্‌তে পারে এবং আছে। শাস্ত্রীমহাশয় "বৈদিক-ধর্ম্ম"-অর্থেই "আর্য্যধর্ম্ম" শব্দ ব্যবহার করেছেন; তিনি আর্য্যমতকে বরাবর বেদপন্থীদের মত বলেই উল্লেখ করে গেছেন। "বেদপন্থী" শব্দটিও আমি বর্জ্জন করা আবশ্যক মনে করি,—কেননা বেদের শতপথ থাক্‌তে পারে, সুতরাং সকল বেদপন্থীরা চাই-কি একমতও না হতে পারেন; অপর পক্ষে বেদ শব্দের অর্থ যে কি সে-বিষয়ে মীমাংসক এবং বৈদান্তিক উভয়েই একমত। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেন—

"ব্রাহ্মণ সহিত ঋক সাম যজুঃকে বেদ কহা যায়। এস্থলে "অগ্নিমীলেঽগ্নির্বৈ দেবানামবম" ইত্যাদি এবং "সংসমিদ্যুবসেঽথ মহাব্রতম্" ইত্যন্ত বাক্যসমূহ এবং তাহার অবয়বভূত সকল বাক্যের প্রতিই বেদ শব্দ প্রয়োগ করা হয়।"

বেদ যে কেবল শব্দসমূহ এ বিষয়ে মেধাতিথির সঙ্গে শঙ্কর একমত। তিনি বলেছেন—

"উপনিষদ্ বেদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরাবিদ্যেতি প্রাধান্যেন বিবক্ষিতং নোপনিষচ্ছব্দরাশিঃ। বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্বিবক্ষিতঃ।—অর্থাৎ উপনিষদ-বেদ্য যে অক্ষর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহাই এখানে—"পরাবিদ্যা" বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু উপনিষদের শব্দসমূহ নহে। পক্ষান্তরে, বেদশব্দে কিন্তু সর্ব্বত্রই শব্দসমূহ মাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে।"

সুতরাং জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম বেদমূলক কি না—তাই হচ্ছে এস্থলে যথার্থ আলোচনার বিষয়। এ বিষয়ে পুরাকালে বহু তর্ক করা হয়েছে, সে তর্কের ফল সেকালে কি দাঁড়িয়েছিল মেধাতিথির মনুভাষ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ" ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা সূত্রে মেধাতিথি বলেন—

"শাক্যভোজক ক্ষপণকাদির ধর্ম্ম বেদমূলক নহে, কেননা ইহারা বেদ যে অপ্রামাণ্য ইহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রত্যক্ষ-বেদবিরুদ্ধ উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্মৃতিতে বেদপাঠ নিষিদ্ধ। তৎসত্বেও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মের বেদমূলত্ব সম্ভব কিনা তাহা বিচার করা যাউক্। যেস্থলে এক বস্তুর সহিত অপর কোন বস্তুর সম্বন্ধ দুরাপেত সে স্থলে একের মূল যে অপর এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। তদ্ব্যতীত এ সকল ধর্ম্মের স্মৃতিপরম্পরায় মূলান্তরও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিক্ষু প্রভৃতির সুগতি এবং দুর্গতিও ত আমি দিব্যচক্ষে নিত্যই দেখিতে পাই। ভোজক পাঞ্চরাত্রিক নিগ্রন্থ অর্থবাদ পাশুপত প্রভৃতি বাহ্য ধর্ম্মাবলম্বীরা স্বসিদ্ধান্ত-প্রণেতৃ মহাপুরুষদিগকে কিম্বা দেবতাবিশেষকে সেই সেই সিদ্ধান্তের অর্থের প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া মনে করে। এবং বেদমূলক ধর্ম্মকে মান্য করে না।

কেবল তাহাই নয়, তাহারা প্রত্যক্ষ-বেদে যে সকল বিরোধ দৃষ্ট হয় বিশেষ করিয়া তাহাই উপদেশ দেয়।"

শুধু বৌদ্ধ জৈন নয়, বৈষ্ণব শৈব প্রভৃতি বেদবাহ্য ধর্ম্মসকল যে বেদমূলক নয় এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় এবং মেধাতিথি একমত। এবং আমার বিশ্বাস এই মতই ভারতবর্ষের সনাতন মত।

এর উত্তরে হয় ত অনেকে বল্‌বেন, যে এ-মত ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের সাম্প্রদায়িক মত, সুতরাং তাঁদের কথা ঐতিহাসিক সত্যস্বরূপে গ্রাহ্য নয়। এ আপত্তি কিন্তু জাতির বাহ্য ইতিহাস সম্বন্ধেই খাটে, মানসিক ইতিহাস সম্বন্ধে নয়। কোন বাহ্য ঘটনার সত্যাসত্য অবশ্য কোনও ব্যক্তিবিশেষ কিম্বা সম্প্রদায়বিশেষের মতামতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না এবং তা প্রমাণান্তরের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ধর্ম্মমতসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক মতই মুখ্যতঃ গ্রাহ্য। এরূপস্থলে স্মৃতি-পরম্পরাকে উপেক্ষা করায় ঐতিহাসিক বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না।

(২)

যেক্ষেত্রে একই শব্দ একজন এক অর্থে ব্যবহার করেন এবং আর-একজন আর-এক অর্থে ব্যবহার করেন সে ক্ষেত্রে তর্কবিতর্কের কোনও শেষ নেই। হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের সকল আলোচনা যে প্রায়ই কথার-কথা হয়ে ওঠে তার কারণ,—আমরা ধর্ম্ম শব্দ তিন্‌টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। Religion, Morality এবং Law—এ তিনের প্রতিই আমরা নির্ব্বিচারে ধর্ম্ম শব্দ প্রয়োগ করি। এ তিনের মধ্যে অবশ্য যোগাযোগ আছে। ধর্ম্ম

অবশ্য এই ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেই দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে একে-তিন, তিনে-এক হলেও এ তিনটির পার্থক্য বিস্মৃত হলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল বিচার পণ্ড হয়। সুতরাং বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্ম বেদমূলক কি না তা নির্ণয় করতে হলে ধর্ম্মশাস্ত্রে "ধর্ম্ম" শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা আবশ্যক।

আমরা যাকে religion বলি সে অর্থে ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। এ শাস্ত্র মুখ্যতঃ law এবং গৌণতঃ moralitiy-র শাস্ত্র।

"বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যোধর্ম্মস্তন্নিবোধত ॥"

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই প্রথম শ্লোকের মেধাতিথি এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন :—

"এস্থলে সাক্ষাদ্ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইতেছে। ধর্ম্মশব্দ অষ্টকাদি* অনুষ্ঠান বচন। বাহ্যদর্শীরা কিন্তু ভস্মকপাল ধারণ করাকেও ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। তাহাই নিবর্ত্তন করিবার জন্য "বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ" ইত্যাদি বিশেষণ পদ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধু ব্যক্তিরা হিতের প্রাপ্তি এবং অহিতের পরিহারের জন্য যত্নবান হইয়া থাকেন। হিতাহিত ত দৃষ্ট এবং প্রসিদ্ধ। অদৃষ্ট হিতাহিতই বিধিপ্রতিষেধের দ্বারা লক্ষিত হয়। যাহারা সেই (বৈদিক) অনুষ্ঠানের বাহ্য তাহাদিগকেই অসাধু কহা যায়। "ধর্ম্ম" শব্দের প্রতি যে "নিত্য" বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার কারণ ইতর ধর্ম্মের ন্যায় অষ্টকাদি ধর্ম্ম কোনও ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যতদিন সংসার থাকিবে ততদিন এই ধর্ম্মই থাকিবে। অপর পক্ষে বাহ্যধর্ম্মসকল মূর্খ এবং দুঃশীল পুরুষদিগের কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

---

* বৈদিক শ্রাদ্ধবিশেষ।

হইয়া কিছু দিনের জন্য অবসর লাভ করে, তাহার পর অন্তর্হিত হয়। ইহার কারণ, ব্যামোহ যুগসহস্রানুবর্ত্তী হইতে পারে না। সম্যক্‌জ্ঞান অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও তৎক্ষয়ে পুনর্ব্বার নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। সম্যক্‌জ্ঞানের নির্ম্মলতার কোন রূপ ছেদ সম্ভাবনা নাই।—"অদ্বেষরাগিভিঃ" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বাহ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কারণ দর্শান হইয়াছে। "রাগদ্বেষ" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা লোভাদি প্রবৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। লোভ হইতেই মন্ত্রতন্ত্রাদির প্রবর্ত্তন হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ভোগোপযোগী আত্মচেষ্টার দ্বারা জীবধারণ করিতে অসমর্থ তাহারাই লিঙ্গধারণাদির দ্বারা জীবনধারণ করে। এই কারণেই বলা হইয়াছে ভস্মকপালধারণ, নগ্নতা, কাষায় বাস ধারণ এ সকল বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তিদের জীবিকামাত্র।"

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বৈদিকধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য মানবের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অভ্যুদয় সাধন করা। মেধাতিথি সংক্ষেপে ধর্ম্মের এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করেছেন—"যাবতা ধর্ম্মোঽত্র বক্তব্যতয়া প্রতিজ্ঞাতঃ স চ বিধি প্রতিষেধ লক্ষণঃ।" অর্থাৎ Do এবং Dont নিয়েই এ ধর্ম্মের কারবার, এক-কথায় এ ধর্ম্মের অর্থ Law এবং Morality.

অতএব একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, Religion হিসেবে বাহ্যধর্ম্মসকল বেদমূলক নয়। বৈদিক অনুষ্ঠানের অদৃষ্ট-ফলে বিশ্বাসই সে ধর্ম্মের Sacred অংশ এবং সে অংশ, সকল বাহ্যধর্ম্ম সমান পরিহার করেছিল। শুধু তাই নয়, বাহ্যধর্ম্মাবলম্বী-দের স্বর্গলাভ করবার প্রবৃত্তিও ছিল না। বৈদিকধর্ম্ম সামাজিক মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে ধর্ম্ম মুখ্যতঃ Social ;—Spiritual নয়। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, উপনিষদ বেদ নয়, শ্রুতি। এমন কি, স্মার্ত্তমতে উপনিষদ যে বেদবাহ্য একথা স্বয়ং শঙ্করও

স্বীকার করেছেন। সুতরাং বাহ্যধর্ম্মের মূল বেদান্ত কিনা সে হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রশ্ন। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নি, সুতরাং এস্থলে তার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। শাস্ত্রীমহাশয় কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থাৎ স্মৃতির প্রমাণ দেখিয়েছেন; সুতরাং জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সে শাস্ত্রের কাছে Law এবং Morality বিষয়ে কতটা ঋণী সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

(৩)

ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধে মেধাতিথি বলেছেন "ইহতু সাক্ষাদ্ধর্ম্ম উপদিশ্যতে"। সাক্ষাদ্ধর্ম্মের অর্থ,—যে-সকল বিধি-নিষেধের দ্বারা মানবসমাজ শাসিত এবং চালিত হয়। শাস্ত্র (Law) এবং আচার (Custom) হচ্ছে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ দেহ। ইংরাজের আইন এবং স্বসমাজের আচার—এ যুগে আমাদের প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম। আত্মার সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় সম্বন্ধে মতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই, কোন কালে কোন দেশে সমাজ-রক্ষার সকল ব্যবস্থা বিলকুল উল্টে যায় না।

ইউরোপ খৃষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে কিন্তু রোমের আইন ত্যাগ করেনি। অদ্যাবধি রোমের সমাজ-শাসন (Civil Law) এবং নিজ নিজ দেশের আচারের (Common Law) উপরেই ইউরোপের প্রতি দেশের সাক্ষাদ্ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতির সংসারধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও নূতন শাস্ত্র গড়বার প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষের বাহ্যধর্ম্মসকল প্রবৃত্তিমূলক নয়, নিবৃত্তিমূলক। সংসার-ত্যাগই সে সকল ধর্ম্মের পরম পুরুষার্থ। অর্থকাম নয়, মোক্ষলাভ করাই ছিল সে সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য।

এরূপ ধর্ম্মমত থেকে কর্ম্মজীবনের কোনও নূতন ব্যবস্থা জন্মলাভ করতে পারে না। মেধাতিথি বলেন যে, যদি নিষ্কামধর্ম্মই সত্য হয় তাহলে "ইদং আপতিতং ন কিঞ্চিৎ কেনচিৎকর্ত্তব্যং সর্ব্বৈস্তূষ্ণীং-ভূতৈঃ স্থাতব্যম্"। সুতরাং বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের কোনও স্বতন্ত্র ব্যবহারশাস্ত্র থাক্‌বার কথা নয় এবং সম্ভবতঃ নেই।

(৪)

একশ্রেণীর ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে Moralityর কোনও কথা নেই; সে শাস্ত্রে যা আছে তা শুধু Law। অপর পক্ষে এইমতে বৌদ্ধশাস্ত্রে যা আছে তা শুধু Morality। এরূপ মত প্রচার করায় অবশ্য নিতান্ত একদেশদর্শী-তার পরিচয় দেওয়া হয়। Moralityর সঙ্গে সম্পর্কহীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠালাভ করা যেমন অসম্ভব, কেবলমাত্র Moralityর উপর ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করাও তেমনি অসম্ভব। যদি কেবলমাত্র হিতবাদের উপর ধর্ম্মস্থাপন করা সম্ভবপর হত তাহলে Mill এবং Comteও পৃথিবীতে নূতন নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করতে পারতেন, এবং বিশ্ব-মানবের সেবাধর্ম্ম এবং অনুশীলনের ধর্ম্ম প্রভৃতি আঁতুড়ে মারা যেত না। অপর পক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে Morality নেই একথা বলায় Lawএর সঙ্গে Moralityর সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ সে বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়। মেধাতিথি বলেন যে "স্মার্ত্ত-বৈদিকয়োর্নিত্যং ব্যতিষঙ্গাৎ পরস্পরম্।" স্মৃতির সঙ্গে বেদের যে সম্বন্ধ, Lawএর সঙ্গে Moralityরও সেই সম্বন্ধ।

অর্থাৎ এ দুই পরস্পর একান্ত জড়িত। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে এ দুটি বস্তু পৃথক করা হয়নি তার কারণ এ শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য কর্ত্তব্য

কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া নয়, আদেশ দেওয়া। তৎসত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রে যে সকল শীলের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সে সকলের উপদেশ ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে। এর থেকে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় প্রমাণ কর্‌তে চান যে, বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম হতে উৎপন্ন। বাহ্যধর্ম্ম এবং বৈদিকধর্ম্মের এই শীলগত ঐক্য থেকে তার একটি যে অপর-আর-একটি থেকে উৎপন্ন এরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। নচেৎ এ অনুমানও সঙ্গত যে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল হতে উৎপন্ন; কেননা চুরি করা, হিংসা করা, পরদার সেবন করা, মিথ্যা কথা বলা এবং পরদ্রব্যে লোভ করা মনুর মতেও অধর্ম্ম, Moses এর মতেও অধর্ম্ম। এ প্রকার যুক্তি অনুসরণ করলে বরং এই সত্যে উপস্থিত হতে হয় যে বৈদিকধর্ম্ম বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্ম হতে উৎপন্ন, কেননা কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রসকল বুদ্ধের জন্মের পরবর্ত্তী কালে লিখিত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস যে, এ বিষয়ে ভারতবর্ষের কোনও ধর্ম্ম অপর-কোনও ধর্ম্মের নিকট ঋণী নয়। এই ধর্ম্মজ্ঞান ভারতবর্ষের উত্তরাপথের প্রাচীন সভ্যতার অন্বয়াগত সম্পত্তি। এবং এই কারণেই ধর্ম্মশাস্ত্রে Moral Lawsকে সামান্য-ধর্ম্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। "চুরি করো না"—এ নিষেধ বর্ণাশ্রমনির্বিচারে সকলের পক্ষে সমান প্রযোজ্য। অপর পক্ষে বেদাধ্যয়ন করো এবং বেদাধ্যয়ন করো না—এ দুটি হচ্ছে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের সম্বন্ধে বিশেষ বিধি এবং বিশেষ নিষেধ। অতএব বৈদিক বৌদ্ধ এবং জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের শীল যে একই আর্য্য মনোভাব হতে উৎপন্ন হয়েছে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়।

(৫)

বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় আরও বলেন যে—

"বেদপন্থীদের জ্ঞানদর্শন আচারব্যবহার শিক্ষাদীক্ষা রীতিনীতি মূল করিয়া বৌদ্ধ এবং জৈন উভয় ধর্ম্মেরই সন্ন্যাসিগণের বিধিনিষেধ প্রণীত হইয়াছে"—

এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে যে সভ্যতার উল্লেখ করা হয়েছে তাতে গার্হস্থ্য এবং আরণ্যক উভয় ধর্ম্মেরই প্রচলন ছিল। বাহ্যধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন সন্যাসধর্ম্ম, এবং বেদধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন গার্হস্থ্যধর্ম্ম। শুন্‌তে পাই কোন কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার গার্হস্থ্য ব্যতীত অপর কোনও আশ্রম অঙ্গীকার করেন না। এর উত্তরে মেধাতিথি বলেন যে, অপর তিনটি আশ্রমকে গার্হস্থ্যের বিকল্পস্বরূপেই গ্রাহ্য করা হয়। সে যাই হোক মনু-সংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায় যদি লুপ্ত হয়ে যেত তাহলেও সে শাস্ত্রের যে কোনরূপ অঙ্গহানি হত না—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। উভয়ের প্রস্থানভূমি এক হলেও, কর্ম্মমার্গে এবং ত্যাগমার্গে প্রভেদ বিস্তর, সুতরাং বেদধর্ম্ম এবং বাহ্যধর্ম্ম যে পরস্পর পরস্পারের শত্রু হয়ে উঠেছিল এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সুতরাং এর একটি হতে অপরটির উদ্ভবের কল্পনা করা যুক্তিসিদ্ধ হবে না।

এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মূল আর যেখানেই নিহিত থাক্, বেদে নেই। সুতরাং শাস্ত্রকারেরা বেদকে কি অর্থে স্মৃতির মূলস্বরূপে স্বীকার করেন তাও একটু খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

(৬)

"মূল" শব্দ দ্ব্যর্থবাচক। ধর্ম্মের মূল কোথায় এ প্রশ্ন ঐতিহাসিকও জিজ্ঞাসা করেন, দার্শনিকও জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু

এ উভয়ের জিজ্ঞাস্য-বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐতিহাসিক, ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করেন দেশে ও কালে; দার্শনিক সে মূল অনুসন্ধান করেন দেশকালের অতিরিক্ত কোনও পদার্থে। কোনও একটি বিশেষ ধর্ম্ম কোন্ যুগে কোন্ দেশে কোন্ জাতির অন্তরে আবির্ভূত হয়েছিল,—কোন্ পূর্ব্বমত হতে তা উদ্ভূত—এই হচ্ছে ঐতিহাসিকের জিজ্ঞাস্য বিষয়, অপর পক্ষে ধর্ম্মের মূল মানবের হৃদয়ে কি সমাজে, আগমে কি আপ্তবাক্যে নিহিত—এই হচ্ছে দার্শনিকের জিজ্ঞাস্য বিষয়।

শাস্ত্রীমহাশয়েরা আজ যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন—সে হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রশ্ন এবং শাস্ত্রকারেরা যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে হচ্ছে দার্শনিক প্রশ্ন।

খৃষ্ট-ধর্ম্মের মূল যে বাইবেল, এত ঐতিহাসিক সত্য। এ সত্য যার খুসি তিনিই যখন খুসি তখনই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কিন্তু স্মৃতি যে বেদমূলক, তা উক্ত জাতীয় সত্য নয়। কেননা প্রত্যক্ষ-বেদে যে সে মূল দৃষ্ট হয় না এ কথা মীমাংসকেরাও স্বীকার করেন। এ কথা স্বীকার করতে তাঁদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি ছিল না, কেননা তাঁদের মতে ধর্ম্মের মূল কস্মিনকালেও প্রত্যক্ষ হতে পারে না। মেধাতিথি বলেন,—

"পূর্ব্বপক্ষের মতে অননুভূত বস্তুর স্মরণ উপপত্তি হয় না। কোনরূপ প্রমাণের দ্বারা অনুভব না করিয়াও মনুপ্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কবিগণ যেরূপ কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যে কথাবস্তু উৎপাদন করিয়া কহিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে, এরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকিত যদি না স্মৃতিতে কর্ত্তব্যতার উপদেশ দেওয়া হইত। অনুষ্ঠানার্থই কর্ত্তব্যতার উপদেশ দেওয়া হয়। এমন কোনও ব্যক্তি নাই, যিনি নিজের ইচ্ছা এবং নিজের

বুদ্ধির সাহায্যে ব্যবহারিক অনুষ্ঠান সকল নির্ম্মাণ করিতে পারেন। আর যদি ইহাই হয় যে ভ্রান্ত অনুষ্ঠানসকল সিদ্ধিলাভ করিতে পারে তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যাবৎ সংসার তাবৎ একের ভ্রান্তি জগৎকে ভ্রান্ত করিয়া রাখিবে। এ কল্পনা অলৌকিকী। অতএব মনুপ্রভৃতির শাস্ত্র যে বেদমূলক, সে বিষয়ে ভ্রান্তির কোন অবসর নাই। মন্বাদি, ধর্ম্মের যে সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। ইন্দ্রিয়ের সহিত পদার্থের সন্নিকর্ষজ যে জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ধর্ম্ম কখনও ইন্দ্রিয় গোচর হইতে পারে না, কেননা তাহা কর্ত্তব্যতা-স্বভাব। সেই কারণে বেদকে কর্ত্তব্যতা-স্মরণের অনুরূপ কারণস্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সে বেদ অনুমানের দ্বারাই মনুপ্রভৃতির উপলব্ধ হইয়াছিল। বেদের যে শাখা স্মার্ত্ত ধর্ম্মের আশ্রয় সে শাখা ইদানীং উৎসন্ন হইয়াছে।”

সুতরাং দেখা গেল যে, মীমাংসকদের মতে বেদ যে স্মৃতির মূল এও কল্পনামাত্র। তা ছাড়া বেদকে সামান্য-ধর্ম্মের (morality) মূলস্বরূপেই কল্পনা করা হয়েছে, বিশেষ ধর্ম্মের নয়। মেধাতিথি বলেন,—“বিশেষনির্দ্ধারণে তু ন কিঞ্চিৎ প্রমাণাং ন চ প্রয়োজনম্”।

সুতরাং বেদে ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করতে গেলে শুধু বাহ্যধর্ম্মের নয়, বৈদিক ধর্ম্মেরও বিশেষত্ব উপেক্ষা করা হয়। বস্তুর বিশেষ জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান। সুতরাং এ সকল ধর্ম্মের ভিতর যা সর্ব্বসামান্য কেবলমাত্র তার প্রতি মনোযোগ দেওয়াতে আমাদের অতীতের জ্ঞান এক পদও অগ্রসর হয় না।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বেদ এবং বাহ্যধর্ম্মের সমন্বয় করা অতি গর্হিত কার্য্য বলে মনে করতেন। ধর্ম্মের সঙ্গে বেদান্তের, ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৈষ্ণবের, শৈবের সঙ্গে বৌদ্ধের এবং চার্ব্বাকের সঙ্গে মীমাংসকের সমন্বয় করা এ যুগের

ধর্ম্ম;—সেকালের ধর্ম্ম, বিরোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাগ-যজ্ঞাদির প্রতি বাহ্যধর্ম্মের যেরূপ অশ্রদ্ধা ছিল চৈত্যবন্দনাদির প্রতি বেদধর্ম্মের তদপেক্ষা বেশি অশ্রদ্ধা ছিল। অনেকের বিশ্বাস যে ভগবদ্গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করা হয়েছিল কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেননা "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ো পরোধর্ম্ম ভয়াবহ" —এ হচ্ছে গীতারই বচন। গীতাকারের মতে সমাজের পক্ষে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির চাইতে আর বেশি বিপত্তি নেই। অসবর্ণ বিবাহ কি সমাজে কি মনোরাজ্যে ব্রাহ্মণদের মতে সমান জঘন্য ও হেয় ছিল। সুতরাং পুরাকালে কোনও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী জন্মগ্রহণ করলে ব্রাহ্মণেরা বেণ রাজার প্রতি যে ব্যবহার করে ছিলেন তাঁর প্রতিও ঠিক সেই ব্যবহার করতেন। তবে যে প্রাচীন ভারতের সকল ধর্ম্ম মিলেমিশে খিঁচুড়ি পাকিয়ে নবীন হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হয়েছে—তার কারণ পূর্ব্বাচার্য্যেরা সহস্র চেষ্টাতেও যেমন আর্য্য-অনার্য্যজাতির রক্তের মিশ্রণ বন্ধ করতে পারেন নি, তেমনি বেদ ও বাহ্য ধর্ম্মের মিশ্রণও বন্ধ করতে পারেন নি।

সুতরাং দেখা গেল যে বেদপন্থীরা যে কারণে স্বধর্ম্মের বেদ-মূলত্ব স্বীকার করেন—সে হচ্ছে theoretical,—historical নয়। তাঁরা স্পষ্ট বলেছেন যে, এ মূল "ন স্থিতি হেতুতয়া বৃক্ষস্যেব।"

আমরা যা খুঁজি তা হচ্ছে ধর্ম্মবৃক্ষের শিকড়। সে শিকড় সেকালে যখন বেদধর্ম্মে খুঁজে পাওয়া যাইনি তখন একালে যে পাওয়া যাবে সে সম্ভাবনা অতি অল্প।

মেধাতিথি বলেছেন—"বাহ্যধর্ম্মসকলের স্মৃতিপরম্পরায় মূলান্তরও প্রাপ্ত হওয়া যায়"—কিন্তু সেই অপর মূল সকল যে কি, তা

তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি, তবে তাঁর কথার ভাবে বোঝা যায় যে তিনি বাহ্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক-পুরুষদেরই নিজ নিজ ধর্ম্মমতের মূলস্বরূপে গ্রাহ্য করেছিলেন।

আমরা তাঁদের পিছনেও যেতে চাই, এবং বুদ্ধপ্রভৃতির মত আর্য্যমত কি না বিশেষ করে তাই জানতে চাই।

আর্য্য শব্দ যদি Aryan শব্দের প্রতিবাক্য হয় তাহলে বৌদ্ধ জৈন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মকেও আর্য্যধর্ম্ম বলে স্বীকার করবার পক্ষে আমি কোনরূপ বাধা দেখতে পাইনে। Aryan শব্দ জাতিবাচক এবং অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে অর্থে সমগ্র ইউরোপ আর্য্য, সে অর্থে বুদ্ধ মহাবীর বাসুদেবও আর্য্য। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন শাক্যকুলে, মহাবীর জ্ঞাতৃক কুলে, এবং বাসুদেব যদুকুলে। এ সকল কুলই (clan) আর্য্যকুল। এ সত্য বেদ-পন্থীরাও স্বীকার করেছেন, কেননা তাঁরা এঁদের ক্ষত্রিয় অর্থাৎ দ্বিজ বলেই উল্লেখ করেন। তবে যে তাঁরা এঁদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বাহ্যধর্ম্ম নামে অভিহিত করেন তার কারণ এই যে, যে আর্য্য-কুল হতে বৈদিক ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সে একটি স্বতন্ত্র কুল।

সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী এই দুই দেব নদীর অভ্যন্তরে যে দেশ অবস্থিত তার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এবং তৎপার্শ্বস্থিত কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাঞ্চাল এবং শূরসেন এই চারটি ব্রহ্মর্ষিদেশ। ভারতবর্ষের এই ভূভাগে যে আর্য্যকুল বাস করতেন সেই কুলেরই পারম্পর্য্য-ক্রমাগত যে আচার শাস্ত্রকারদের মতে তাই সদাচার। এই আর্য্যদের কুলাচারই শাস্ত্রমতে আর্য্যধর্ম্ম। এ অর্থে অবশ্য বৌদ্ধ জৈন এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম নয়, কেননা বৃষ্ণিকুল, জ্ঞাতৃককুল

এবং শাক্যকুলের বাসস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং ব্রহ্মর্ষিদেশের বহির্ভূত দেশ। কিন্তু সে সকল দেশ ত শাস্ত্রমতে আর্য্যদেশ। মনু বলেন, যে দেশের পূর্ব্বে এবং পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত সেই সমগ্র দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। মেধাতিথি বলেন যে "আর্য্যা বর্ত্তন্তে তত্র" "এবং ম্লেচ্ছেরা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও সে দেশে চিরস্থায়ী হইতে পারে না"—এই কারণেই এ দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। তাঁর মতে দেশের নাম থেকে জাতির নাম হয় না, জাতির নাম থেকেই দেশের নাম-করণ হয়।

ভারতবর্ষের উত্তরাপথে, যে সকল আর্য্যকুল বাস করতেন—তাঁদের মধ্যে পরস্পরের ভাষার যেমন ঐক্য ছিল, মনোভাবেরও তেমনি ঐক্য ছিল। এঁরাই ভারতবর্ষে আর্য্যসভ্যতা স্থাপন করেন, এবং সেই আর্য্যসভ্যতাই এ-দেশের সকল প্রাচীন ধর্ম্মমতের মূল। এই সকল বিভিন্নকুলের আধ্যাত্মিক মনোভাবের যে পার্থক্য ছিল সম্ভবতঃ সেই পার্থক্য হতেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়েছে। বুদ্ধ মহাবীরপ্রভৃতিকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসকলের মূল যে তাঁদের নিজ নিজ কুলধর্ম্মে নিহিত ছিল এরূপ অনুমান করবার বৈধ কারণ আছে। এই উভয় ধর্ম্মমতে শাক্যসিংহের পূর্ব্বে অপর বুদ্ধ এবং মহাবীরের পূর্ব্বে অপর তীর্থঙ্কর ছিল। এতেই প্রমাণ হয় যে এ-সকল ধর্ম্মমত অতি প্রাচীন ধর্ম্মমত, বুদ্ধাদির হাতে তা শুধু সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। যে আর্য্যকুল আদিতে ব্রহ্মাবর্ত্তেই উপনিবেশ স্থাপন করেন তাঁরা স্বীয় কুলধর্ম্মকেই আর্য্যধর্ম্ম বলে প্রচার করেছিলেন। আর্য্য শব্দের এই সঙ্কীর্ণ অর্থে শাক্য ক্ষপণকাদির ধর্ম্ম অবশ্য বাহ্যধর্ম্ম কিন্তু সে সকল ধর্ম্মমত Non-Aryan নয়।

(৭)

একদলের আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, শাক্যসাত্বতাদি কুল আর্য্যবংশীয় নয়। কিন্তু এ মত যে সত্য তার কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই। এস্থলে Ethnology নামক উপ-বিজ্ঞানের আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে। তবে এইটুকু বলে রাখা দরকার যে Ethnologist-দের হাত এখন আমাদের মাথা থেকে নেমে নাকের উপর এসে পড়েছে, সম্ভবতঃ পরে দাঁতে গিয়ে ঠেক্‌বে। যাঁরা মস্তকের পরিমাণ থেকে মানবের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং হীনত্ব নির্ণয় কর্‌তেন তাঁদের মস্তিষ্কের পরিমাণ যে স্বল্প ছিল—এ সত্য Ethnologist-রাই প্রমাণ করেছেন। এখন এঁদের বিজ্ঞানের প্রাণ নাসিকাগত হয়েচে। কিন্তু সে প্রাণ যতদিন না ওষ্ঠাগত হয় ততদিন এঁরা শাক্যসিংহের জাতি নির্ণয় কর্‌তে পারবেন না। কেননা বুদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত হয়েছে, নাসিকা হয় নি। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে মহাবীর, বাসুদেব, বুদ্ধদেব প্রভৃতিকে আর্য্য বলে গ্রাহ্য কর্‌তে বাধ্য। এঁদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতসকল আর যেখান থেকেই হোক শূদ্রবুদ্ধি অর্থাৎ ক্ষুদ্রবুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হয়নি। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত এ-হিসেবে সত্য যে, বাহ্যধর্ম্মসকল বৈদিকধর্ম্ম হতে উৎপন্ন হয়নি; অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয়ের মতও এই হিসেবে সত্য যে, এ সকল ধর্ম্মমত Non-Aryan নয়। এর চাইতে বেশি কিছু জোর করে বলা চলে না। ইতি—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শিক্ষার নব আদর্শ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয় যে এ দেশের চল্‌তি শিক্ষার দর যাচাই করতে উদ্যত হয়েছেন এ অতি সুখের কথা। কেননা বাঙ্গালী যদি কোনও বস্তু লাভ করবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ত সে হচ্ছে শিক্ষা—সুতরাং আমরা দেশসুদ্ধ ভদ্রসন্তান প্রাণপাত করে যা পাই, জহুরির কাছে তার মূল্য যে কি তা জানায় ক্ষতি নেই।

আমরা যে কত শিক্ষালোভী তার প্রমাণ আমাদের পাঁচ বৎসর বয়েসে হাতে-খড়ি হয়। আর কম্‌সে-কম্ একুশ বৎসর বয়েসে হাতে-কালি, মুখে-কালি আমরা সেনেট-হাউস থেকে লিখে আসি। কিন্তু এতেও আমাদের শিক্ষার সাধ মেটে না। এর পরে আমরা সারাজীবন যখন যা-কিছু পড়ি—তা কবিতাই হোক আর গল্পই হোক—আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে আমরা এ পড়ে কি শিক্ষা লাভ করলুম? এ প্রশ্নের উত্তর মুখে-মুখে দেওয়া অসম্ভব, কেননা সাহিত্যের যা শিক্ষা তা হাতে-হাতে পাওয়া যায় না। সাহিত্য যা দেয় তা আনন্দ; কিন্তু ও-বস্তু আমরা জানিনে বলে মানিনে। আমাদের শিক্ষার ভিতর আনন্দ নেই বলে, আনন্দের ভিতর যে শিক্ষা থাক্‌তে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

ফলে পাঠকমাত্রই যখন শিক্ষার্থী তখন লেখকমাত্রকেই দায়ে-পড়ে শিক্ষক হতে হয়। পাঠক-সমাজ যখন আমাদের কাছে শিক্ষা নিতে প্রস্তুত তখন অবশ্য শিক্ষা দিতে আমাদের নারাজ হওয়া উচিত নয়;—কেননা লেক্‌চার জিনিষটে দেওয়া সহজ, শোনাই কঠিন। তবে যে আমরা পাঠকদের সকল-সময় শিক্ষা

না দিয়ে সময়-সময় আনন্দ দেবার বৃথাচেষ্টা করে তাঁদের বিরাগভাজন হই তার একটি বিশেষ কারণ আছে।

বাঙ্গলা-সাহিত্যের যে শুধু পাঠক আছেন তা নয়, পাঠিকাও আছেন। দলে বোধ হয় উভয়েই সমান পুরু হবেন—অথচ এ উভয়ের ভিতর বিদ্যার প্রভেদ বিস্তর। পাঠকেরা-সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ, পাঠিকারা বালিকা-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণাও নন্। সুতরাং পাঠকদের জন্য লেখকদের post graduate লেক্‌চার দেওয়া কর্ত্তব্য এবং পাঠিকাদের জন্য নিম্ন প্রাইমারির। অথচ শ্রোতাদের শিক্ষা দিতে হলে আমাদের পক্ষে সেইরূপ বক্তৃতা করা আবশ্যক—যা সকলের পক্ষে সমান উপযোগী হয়। অসাধ্য সাধন কর্‌বার দুঃসাহস সকলের নেই, সম্ভবতঃ সেই কারণে বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্য শিক্ষাদানের ভার হাতে নেয়নি।

কিন্তু এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের পক্ষে সমান শিক্ষাপ্রদ সাহিত্য যে রচনা করা যায় না—এ ধারণা অমূলক। উপর উপর দেখলেই এ দেশের শিক্ষিত লোক এবং অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রভেদ মস্ত দেখায়—কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, আমরা মনে সকলেই এক। মনোরাজ্যে যে আমাদের লিঙ্গভেদ নেই, বর্ণভেদ নেই, বয়োভেদ নেই তার প্রমাণ হাতে-কলমে দেখানো যেতে পারে। "ঘরে-বাইরে" লেখ্‌বার কৈফিয়ৎ তলব করে একটি ভদ্রমহিলা রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন তা যে-কোনও এম্-এ-পাস-করা প্রোফেসর লিখতে পারতেন—এবং উক্ত গল্প পাঠ করে একটি এম্-এ-পাস-করা প্রোফেসরের মনে যে সমস্যার উদয় হয়েছে তা যে কোনও ভদ্রমহিলার মনে

উদয় হতে পারত--অতএব যে-কোনও শিকারী সাহিত্যিক একটি বাক্যবাণে এ দুটি পাখীকেই বিদ্ধ করতে পারেন। বস্তুগত্যা আমাদের মন হচ্ছে হরীতকী জাতীয়; শিক্ষার গুণে সে মন পাকে না,—শুধু শুকিয়ে যায়। সুতরাং বাঙ্গলার অশিক্ষিত স্ত্রীলোক ও শিক্ষিত পুরুষ,—এ দুয়ের মনের ভিতর প্রভেদ এই যে, এর একটি কাঁচা আর অপরটি শুকনো। দেশসুদ্ধ লোক সেই শিক্ষা চান যে-শিক্ষার গুণে স্ত্রীপুরুষ সকলের মন সমান শুকিয়ে ওঠে। কেননা হরীতকী যত বেশি শুকোয়, যত বেশি তিতো হয় তত বেশি তা উপকারী হয়। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ সেই শিক্ষার সন্ধানে ফিরছেন যে শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মন-হরীতকী পেকে উঠবে এবং যার আস্বাদ গ্রহণ করে স্বজাতি অমরত্ব লাভ করবে। এ ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই—কেননা উভয়ের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আমাদের পক্ষে কি শিক্ষা ভাল তা নির্ণয় করবার পূর্ব্বে আমরা কি হতে চাই সে বিষয়ে মনস্থির করা আবশ্যক;—কেননা একটা স্পষ্ট জাতীয় আদর্শ না থাকলে, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে না। ধরুন যদি অশ্বত্ব-লাভ-করা গর্দ্দভদের জাতীয় আদর্শ করে তোলা যায়, তাহলে অবশ্য সে জাতির শিক্ষকেরা তাদের জন্য পেটলের ব্যবস্থা করবেন—অপর পক্ষে গর্দ্দভত্ব লাভ করা যদি অশ্বদের জাতীয় আদর্শ করে তোলা যায় তাহলে সে জাতির শিক্ষকেরাও তাদের জন্য ঐ পেটলেরই ব্যবস্থা করবেন। হয় গাধা-পিটে-ঘোড়া, নয় ঘোড়া-পিটে-গাধা করাই যে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য সাধারণতঃ এইটেই হচ্ছে লোকের ধারণা। এবং

আমরা এই উভয়ের মধ্যে যে কোন্ জাতীয় সে বিষয়ে দেশে-বিদেশে বিষম মতভেদ থাকলেও—পেটল দেওয়াটাই যে শিক্ষা দেবার একমাত্র পদ্ধতি সে-বিষয়ে বিশেষ কোন মতভেদ নেই। কাজেই আমাদের শিক্ষকেরা একহাতে সংস্কৃত, আর-একহাতে ইংরেজি ধরে আমাদের উপর দুহাতে চাবুক চালাচ্ছেন। এর ফলে কত গাধা ঘোড়া এবং কত ঘোড়া গাধা হচ্ছে—তা বলা কঠিন; কেননা এ বিষয়ের কোনও Statistics অদ্যাবধি সংগ্রহ করা হয়নি।

সে যাই হোক, যে-জাতীয় আদর্শের উপর জাতীয়শিক্ষা নির্ভর করে, তা যুগপৎ মনের এবং জীবনের আদর্শ হওয়া দরকার। যে দেশে জাতীয়শিক্ষা আছে সে দেশের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টিপাত করলেই এ সত্য সকলের কাছেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। ইউরোপে আমরা দেখতে পাই যে, জর্ম্মাণি চেয়েছিল—"যা নই তাই হব" ইংলণ্ড—"যা আছি তাই থাকব" আর ফ্রান্স—"যা আছি তাও থাকব না, যা নই তাও হব না" এবং এই তিন দেশের গত পঞ্চাশ বৎসরের কাজ ও কথার ভিতর নিজ নিজ জাতীয় আদর্শের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

কিন্তু আমাদের বিশেষত্ব এই যে, আমরা জীবনে এক পথে চলতে চাই—মনে আর-এক পথে।

আমাদের ব্যক্তিগত মনের আদর্শ হচ্চে—"যা ছিলুম তাই হওয়া" আর আমাদের জাতিগত জীবনের আদর্শ হচ্ছে—"যা ছিলুমনা তাই হওয়া"। ফলে আমাদের সামাজিক বুদ্ধির মুখ প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে আর আমাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধির মুখ নবীন ইউরোপের

দিকে। এই আদর্শের উভয়-সঙ্কটে পড়ে, আমরা শিক্ষার একটা সুপথ ধরতে পাচ্ছিনে,—স্কুলেও নয়, সাহিত্যেও নয়।

একজন ইংরেজ দার্শনিক বলেছেন যে সমস্যাটা যে কোথায় ও তা কি সেইটে ধরাই কঠিন, তার মীমাংসা করা সহজ। এ কথা সত্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তাই "ঘরে-বাইরে" আমাদের জাতীয় সমস্যার ছবি এঁকেছেন, কেননা—ও-উপন্যাসখানি একটি রূপক-কাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। নিখিলেশ হচ্ছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউরোপ আর বিমলা– বর্ত্তমান ভারত। এই দোটানার ভিতর পড়েই বিমলা বেচারা নাস্তানাবুদ হচ্ছে, মুক্তির পথ যে কোন্‌দিকে তা সে খুঁজে পাচ্ছে না। এরূপ অবস্থায় এক সৎশিক্ষা ব্যতীত তার উদ্ধারের উপায়ান্তর নেই। অতএব এ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে শিক্ষার একটি আদর্শ খুঁজে-পেতে বার করা দরকার।

আমি বহু গবেষণার ফলেও সে আদর্শ আজও আবিষ্কার করতে পারিনি, সুতরাং সে আদর্শ নিজেই আমি গড়তে বাধ্য হয়েছি। আমি স্বজাতিকে অনুরোধ করি যে, আমার এই গড়া আদর্শ যেন বিনা পরীক্ষায় পরিহার না করেন।

শ্রীমতী লীলা মিত্র নামক জনৈক ভদ্রমহিলা "সবুজ পত্রে" এই মত প্রকাশ করেন যে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ভুল। সুতরাং তার পদ্ধতিও নিরর্থক। তাঁর মতে আমরা স্ত্রীজাতিকে সেই শিক্ষা দিতে চাই, যাতে তারা পুরুষজাতির কাজে লাগে সুতরাং সে শিক্ষা নিষ্ফল। এ কথা সম্ভবতঃ সত্য। তিনি চান যে স্ত্রীজাতি নিজের শিক্ষার ভার নিজ-হস্তে গ্রহণ করেন—এ হলে তো আমরা বাঁচি।

আমাদের মেয়েরা যদি নিজের বিবাহের ভার নিজের হাতে নেন তাহ'লে দেশসুদ্ধ লোক যেমন কন্যাদায় হতে অগ্নি নিষ্কৃতি লাভ করে তেমনি মা-লক্ষ্মীরা যদি নিজগুণে মা-সরস্বতী হয়ে ওঠেন তাহলে স্ত্রীশিক্ষার সমস্যা আমাদের আর মীমাংসা করতে হয় না।

সে যাই হোক, আমি বলি পুরুষজাতিকে সেই শিক্ষা দেওয়া হোক যাতে তারা স্ত্রীজাতির কাজে লাগে। শিক্ষার এ আদর্শ কোনকালে কোনদেশে ছিল না বলেই আমাদের পক্ষে তা গ্রাহ্য করা উচিত। পুরুষজাতি যদি এই আদর্শে শিক্ষিত হয় তাহলে আর-কিছু না হোক, পৃথিবীর মারামারি কাটাকাটি সব থেমে যাবে। নিখিলেশ ও সন্দীপ যদি বিমলাকে নিজের নিজের কাজে লাগাতে চেষ্টা না কোরে—নিজেদের বিমলার কাজে লাগাতে চেষ্টা করতেন তাহলে গোল ত সব মিটেই যেত। অতএব আমরা যাতে বিমলার কাজে লাগি সেই রকম আমাদের শিক্ষা হওয়া কর্ত্তব্য।

বীরবল।

সবুজ পত্র

রূপ

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
উঠে অট্টহাসি';
ধূলা বালি
দিয়ে করতালি
নিত্য নিত্য
করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে;
আকাশে শিশুর মত অবিরত কোলাহলে।

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি'
তাদের খেলায় হতে সাথী।
স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল;

ঘরে-বাইরে

বিমলার আত্মকথা

অমূল্যর জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরী করতে বসেছিলুম এমন সময় মেজরাণী এসে বল্লেন, কিলো ছুটু, নিজের জন্মতিথিতে নিজেকেই খাওয়াবার উজ্জুগ হচ্চে বুঝি?

আমি বল্লুম, নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খাওয়াবার নেই না কি?

মেজরাণী বল্লেন, আজ ত তোর খাওয়াবার কথা নয় আমরা খাওয়াব। সেই জোগাড়ও ত করছিলুম, এমন সময় খবর শুনে পিলে চমকে গেছে—আমাদের কোন্ কাছারিতে না কি পাঁচ-ছশো ডাকাত পড়ে ছ হাজার টাকা লুটে নিয়েচে। লোকে বলচে এইবার তারা আমাদের বাড়ি লুট করতে আস্‌বে।

এই খবর শুনে আমার মনটা হাল্কা হল। এ তবে আমাদেরি টাকা! এখনি অমূল্যকে ডাকিয়ে বলি, এই ছ হাজার টাকা এইখানেই আমার সাম্‌নে আমার স্বামীর হাতে সে ফিরিয়ে দিক্ তার পরে আমার যা বল্‌বার সে আমি তাঁকে বল্‌ব!

মেজরাণী আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে বল্লেন, অবাক্ করলে! তোর মনে একটুও ভয় ডর নেই?

আমি বল্লুম, আমাদের বাড়ি লুট করতে আস্‌বে এ আমি বিশ্বাস করতে পারি নে!

বিশ্বাস করতে পার না! কাছারি লুঠ করবে এইটেই বা বিশ্বাস করতে কে পারত।

কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে পুলিপিঠের মধ্যে নারকেলের পূর দিতে লাগলুম। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে তিনি বল্লেন, যাই, ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠাই, আমাদের সেই ছ হাজার টাকাটা এখনি বের করে নিয়ে কলকাতায় পাঠাতে হবে, আর দেরি করা নয়।

এই বলে তিনি চলে যেতেই আমি পিঠের বারকোস সেইখানে আলগা ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি সেই লোহার সিন্ধুকের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম। আমার স্বামীর এমনি ভোলামন যে দেখি তাঁর যে-কাপড়ের পকেটে চাবি থাকে সে-কাপড়টা তখনো আল্‌নায় ঝুল্‌চে। চাবির রিং থেকে লোহার সিন্ধুকের চাবিটা খুলে আমার জ্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্লুম।

এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়ল। বল্লুম, কাপড় ছাড়চি।—শুন্‌তে পেলুম, মেজরাণী বল্লেন, এই কিছু আগে দেখি পিঠে তৈরি করচে, আবার এখনি সাজ করবার ধুম পড়ে গেল! কত লীলাই যে দেখ্‌ব! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বস্‌বে। ওলো, ও দেবীচৌধুরাণী, লুঠের মাল বোঝাই হচ্চে না কি?

কি মনে করে' একবার আস্তে আস্তে লোহার সিন্ধুকটা খুল্‌লুম। বোধ হয় মনে ভাবছিলুম, যদি সমস্তটা স্বপ্ন হয়;— যদি হঠাৎ সেই ছোট দেরাজটা টেনে খুল্‌তেই দেখি সেই কাগজের মোড়কগুলি ঠিক তেমনিই সাজানো রয়েচে! হায় রে, বিশ্বাসঘাতকের নষ্ট বিশ্বাসের মতই সব শূন্য!

মিছামিছি কাপড় ছাড়তেই হল। কোনো দরকার নেই তবু

নতুন করে চুল বাঁধলুম। মেজরাণীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন, বলি এত সাজ কিসের?—আমি বল্লুম, জন্মতিথির!

মেজরাণী হেসে বল্লেন, একটা কিছু ছুতো পেলেই অমনি সাজ! ঢের দেখেছি, তোর মত এমন ভাবুনে দেখি নি!

অমূল্যকে ডাকবার জন্যে বেহারার খোঁজ করচি এমন সময় সে এসে পেন্সিলে লেখা একটি ছোট চিঠি আমার হাতে দিলে। তাতে অমূল্য লিখচে, দিদি, খেতে ডেকেছিলে কিন্তু সবুর করতে পারলুম না। আগে তোমার আদেশ পালন করে আসি তার পরে তোমার প্রসাদ গ্রহণ করব। হয় ত ফিরে আস্‌তে সন্ধ্যা হবে।

অমূল্য কার হাতে টাকা ফেরাতে চল্‌ল, আবার কোন্ জালের মধ্যে নিজেকে জড়াতে গেল! আমি তাকে তীরের মত কেবল ছুঁড়তেই পারি কিন্তু লক্ষ্য ভুল হলে তাকে আর কোনোমতে ফেরাতে পারি নে।

এই অপরাধের মূলে যে আমি আছি এই কথাটা এখনি স্বীকার করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু মেয়েরা সংসারের বিশ্বাসের উপরেই বাস করে, সেই যে তাদের জগৎ। সেই বিশ্বাসকে লুকিয়ে ফাঁকি দিয়েছি এই কথাটা জানিয়ে তার পরে সংসারে টিঁকে থাকা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন। যা আমরা ভাঙব ঠিক তার উপরেই যে আমাদের দাঁড়াতে হবে—সেই ভাঙা জিনিসের খোঁচা নড়তে-চড়তে আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তেই বাজতে থাকবে। অপরাধ করা শক্ত নয় কিন্তু সেই অপরাধের সংশোধন করা মেয়েদের পক্ষে যত কঠিন এমন আর কারো নয়।

কিছুদিন থেকে আমার স্বামীর সঙ্গে বেশ সহজে কথাবার্ত্তা কওয়ার প্রণালীটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই হঠাৎ এত বড় একটা কথা কেমন করে এবং কখন্ যে তাঁকে বল্‌ব তা কিছুতেই ভেবে পেলুম না। আজ তিনি অনেক দেরিতে খেতে এসেচেন—তখন বেলা দুটো। অন্যমনস্ক হয়ে কিছুই প্রায় খেতে পারলেন না। আমি যে তাঁকে একটু অনুরোধ করে খেতে বল্‌ব সে অধিকারটুকু খুইয়েচি। মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছলুম।

একবার ভাবলুম সঙ্কোচ কাটিয়ে বলি, ঘরের মধ্যে একটু বিশ্রাম কর' সে, তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্চে!—একটু কেশে কথাটা যেই তুল্‌তে যাচ্চি এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে দারোগাবাবু কাসেম সর্দ্দারকে নিয়ে এসেচে। আমার স্বামী উদ্বিগ্ন মুখে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

তিনি বাইরে যাওয়ার একটু পরেই মেজরাণী এসে বল্লেন, ঠাকুরপো কখন খেতে এলেন আমাকে খবর দিলিনে কেন? আজ তাঁর খাবার দেরি দেখে নাইতে গেলুম,—এরি মধ্যে কখন্—

কেন, কি চাই!

শুন্‌চি তোরা কাল কলকাতায় যাচ্চিস্। তাহলে আমি এখানে থাক্‌তে পারব না। বড়রাণী তাঁর রাধাবল্লভ ঠাকুরকে ছেড়ে কোথাও নড়বেন না। কিন্তু আমি এই ডাকাতির দিনে যে তোমাদের এই শূন্য ঘর আগলে বসে কথায়-কথায় চম্‌কে-চম্‌কে মরব, সে আমি পারব না। কাল যাওয়াই ত ঠিক?

আমি বল্লুম, হাঁ ঠিক।—মনে মনে ভাবলুম, সেই যাওয়ার

আগে এইটুকু সময়ের মধ্যে কত ইতিহাসই যে তৈরি হয়ে উঠবে তার ঠিকানা নেই। তার পরে কলকাতাতেই যাই, কি এখানেই থাকি সব সমান। তার পর থেকে সংসারটা যে কেমন, জীবনটা যে কি, কে জানে! সব ধোঁয়া, স্বপ্ন!

এই যে আমার অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়ে উঠল-বলে,' আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র আছে—এই সময়টাকে কেউ একদিন থেকে আরেক দিন পর্য্যন্ত সরিয়ে সরিয়ে টেনে টেনে খুব দীর্ঘ করে দিতে পারে না? তাহলে এরি মধ্যে আমি ধীরে ধীরে একবার সমস্তটা যথাসাধ্য সেরে-সুরে নিই—অন্তত এই আঘাতটার জন্য নিজেকে এবং সংসারকে প্রস্তুত করে তুলি। প্রলয়ের বীজ যতক্ষণ মাটির নীচে থাকে ততক্ষণ অনেক সময় নেয়—সে এত সময় যে, মনে হয় ভয়ের বুঝি কোনো কারণ নেই—কিন্তু মাটির উপর একবার যেই এতটুকু অঙ্কুর দেখা দেয় অম্‌নি দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে, তখন তাকে কোনো-মতে আঁচল দিয়ে বুক দিয়ে প্রাণ দিয়ে চাপা দেবার আর সময় পাওয়া যায় না।

মনে করচি কিছুই ভাব্‌ব না, অসাড় হয়ে চুপ করে পড়ে থাকব, তার পরে মাথার উপরে যা এসে পড়ে পড়ুক্‌গে! পশু দিনের মধ্যেই ত যা হবার তা হয়ে যাবে—জানাশোনা, হাসাহাসি, কাঁদাকাটি, প্রশ্ন, প্রশ্নের জবাব, সবই!

কিন্তু অমূল্যর সেই আত্মোৎসর্গের-দীপ্তিতে-সুন্দর বালকের মুখখানি যে কিছুতে ভুল্‌তে পারচি নে। সে ত চুপ করে বসে ভাগ্যের প্রতীক্ষা করে নি—সে যে ছুটে গেল বিপদের মাঝখানে। আমি নারীর অধম তাকে প্রণাম করি,—সে আমার বালক দেবতা,—

সে আমার কলঙ্কের বোঝা একেবারে খেলাচ্ছলে কেড়ে নিতে এসেচে ;—সে আমার মার নিজের মাথায় নিয়ে আমাকে বাঁচাবে, ভগবানের এমন ভয়ানক দয়া আমি সইব কেমন করে ? বাছা আমার, তোমাকে প্রণাম, ভাই আমার, তোমাকে প্রণাম,—নির্ম্মল তুমি, সুন্দর তুমি, বীর তুমি, নির্ভীক তুমি, তোমাকে প্রণাম—জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হয়ে আমার কোলে এস এই বর আমি কামনা করি।

এর মধ্যে চারদিকে নানা গুজব জেগে উঠচে, পুলিস আনাগোনা করচে, বাড়ির দাসী চাকররা সবাই উদ্বিগ্ন। ক্ষেমা দাসী আমাকে এসে বল্লে, ছোটরাণীমা, আমার এই সোনার পৈঁচে আর বাজুবন্ধ তোমার লোহার সিন্ধুকে তুলে রেখে দাও।—ঘরের ছোটরাণীই দেশ জুড়ে এই দুর্ভাবনার জাল তৈরি করে নিজে তার মধ্যে আটকা পড়ে গেছে একথা বলি কার কাছে ? ক্ষেমার গয়না থাকোর জমানো টাকা আমাকে ভালোমানুষের মত নিতে হল। আমাদের গয়লানী একটা টিনের বাক্সোয় করে একটি বেনারসী কাপড় এবং তার আর-আর দামী সম্পত্তি আমার কাছে রেখে গেল—বল্লে, রাণীমা, এই বেনারসী কাপড় তোমারই বিয়েতে আমি পেয়েছিলুম।

কাল যখন আমারই ঘরের লোহার সিন্ধুক খোলা হবে তখন এই ক্ষেমা, থাকো, গয়লানী—থাক্‌, সে কথা কল্পনা করে হবে কি। বরঞ্চ ভাবি, কালকের দিনের পর আর-এক বৎসর কেটে গেছে, আবার আর-একটা তেসরা মাঘের দিন এসেচে। সেদিনও কি আমার সংসারের সব কাটা ঘা এমনি কাটাই থেকে যাবে ?

অমূল্য লিখেচে, সে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফিরবে। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে একা বসে চুপ করে থাকতে পারি নে। আবার পিঠে তৈরি করতে গেলুম। যা তৈরি হয়েচে তা যথেষ্ট, কিন্তু আরো করতে হবে। এত কে খাবে? বাড়ির সমস্ত দাসী চাকরদের খাইয়ে দেব। আজ রাত্রেই খাওয়াতে হবে। আজ রাত পর্য্যন্ত আমার দিনের সীমা। কালকের দিন আর আমার হাতে নেই।

পিঠের পর পিঠে ভাজচি, বিশ্রাম নেই। এক-একবার মনে হচ্চে যেন উপরে আমার মহলের দিকে কি-একটা গোলমাল চল্‌চে। হয় ত আমার স্বামী লোহার সিন্ধুক খুল্‌তে এসে চাবি খুঁজে পাচ্চেন না। তাই নিয়ে মেজরাণী দাসী চাকরকে ডেকে একটা তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়েচেন। না, আমি শুনব না, কিচ্ছু শুনব না, দরজা বন্ধ করে থাক্‌ব। দরজা বন্ধ করতে যাচ্চি এমন সময় দেখি থাকো তাড়াতাড়ি আস্‌চে—সে হাঁপিয়ে বল্লে, ছোটরাণীমা! আমি বলে উঠ্‌লুম, যা, যা, বিরক্ত করিস্ নে, আমার এখন সময় নেই।—থাকো বল্লে, মেজরাণীমার বোনপো নন্দবাবু কলকাতা থেকে এক কল এনেচেন সে মানুষের মত গান করে, তাই মেজরাণীমা তোমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েচেন!

হাস্‌ব, কি কাঁদব তাই ভাবি! এর মাঝখানেও গ্রামোফোন্! তা'তে যতবার দম দিচ্চে সেই থিয়েটারের নাকীসুর বেরচ্চে—ওর কোনো ভাবনা নেই! যন্ত্র যখন জীবনের নকল করে তখন তা এমনি বিষম বিদ্রূপ হয়েই ওঠে!

সন্ধ্যা হয়ে গেল। জানি, অমূল্য এলেই আমাকে খবর পাঠাতে

দেরি করবে না—তবু থাক্‌তে পারলুম না—বেহারাকে ডেকে বল্লুম, অমূল্যবাবুকে খবর দাও।—বেহারা খানিকটা ঘুরে এসে বল্লে, অমূল্যবাবু নেই।

কথাটা কিছুই নয়, কিন্তু হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় করে উঠ্‌ল। অমূল্যবাবু নেই—সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে এ কথাটা যেন কান্নার মত বাজল। নেই, সে নেই! সে সূর্য্যাস্তের সোনার রেখাটির মত দেখা দিলে—তার পরে আর সে নেই! সম্ভব অসম্ভব কত দুর্ঘটনার কল্পনাই আমার মাথার মধ্যে জমে উঠতে লাগল। আমিই তাকে মৃত্যুর মধ্যে পাঠিয়েছি, সে যে কোনো ভয় করে নি সে তারই মহত্ত্ব কিন্তু এর পরে আমি বেঁচে থাক্‌ব কেমন করে?

অমূল্যর কোন চিহ্নই আমার কাছে ছিল না—কেবল ছিল তার সেই ভাইফোঁটার প্রণামী—সেই পিস্তলটি। মনে হল এর মধ্যে দৈবের ইঙ্গিত রয়েচে। আমার জীবনের মূলে যে কলঙ্ক লেগেচে, বালক-বেশে আমার নারায়ণ সেটি ঘুচিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে রেখে দিয়েই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেচেন। কি ভালোবাসার দান! কি পাবন মন্ত্র তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন!

বাক্স খুলে পিস্তলটি বের করে দুই হাতে তুলে আমার মাথায় ঠেকালুম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের ঠাকুরবাড়ি থেকে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম।

রাত্রে লোকজনদের পিঠে খাওয়ানো গেল। মেজরাণী এসে বল্লেন, নিজে নিজেই খুব ধুম করে জন্মতিথি করে নিলি যাহোক্‌। আমাদের বুঝি কিছু করতে দিবি নে?—এই বলে তিনি তাঁর

সেই গ্রামোফোন্‌টাতে যত রাজ্যের নটীদের মিহি চড়া সুরের দ্রুত তানের কসরৎ শোনাতে লাগলেন; মনে হতে লাগল যেন গন্ধর্ব্বলোকের সুরওয়ালা ঘোড়ার আস্তাবল থেকে চীঁহি চীঁহি শব্দে হ্রেষাধ্বনি উঠচে।

খাওয়ানো শেষ করতে অনেক রাত হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল আজ রাতে আমার স্বামীর পায়ের ধূলো নেব। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি অকাতরে ঘুমচ্চেন। আজ সমস্ত দিন তাঁর অনেক ঘুরাঘুরি অনেক ভাবনা গিয়েচে। খুব সাবধানে মশারি একটুখানি খুলে তাঁর পায়ের কাছে আস্তে আস্তে মাথা রাখলুম। চুলের স্পর্শ লাগ্‌তেই ঘুমের ঘোরে তিনি তাঁর পা দিয়ে আমার মাথাটা একটু ঠেলে দিলেন।

পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে বস্‌লুম। দূরে একটা শিমুল গাছ অন্ধকারে কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে—তার সমস্ত পাতা ঝরে গিয়েছে—তারই পিছনে সপ্তমীর চাঁদ ধীরে ধীরে অস্ত গেল।

আমার হঠাৎ মনে হল আকাশের সমস্ত তারা যেন আমাকে ভয় করচে—রাত্রিবেলাকার এই প্রকাণ্ড জগৎ আমার দিকে যেন আড়চোখে চাইচে। কেননা আমি যে একলা। একলা মানুষের মত এমন সৃষ্টিছাড়া আর কিছুই নেই। যার সমস্ত আত্মীয় স্বজন একে একে মরে গিয়েচে সেও একলা নয়, মৃত্যুর আড়াল থেকেও সে সঙ্গ পায়। কিন্তু যার সমস্ত আপন মানুষ পাশেই রয়েচে তবু কাছে নেই, যে-মানুষ পরিপূর্ণ সংসারের সকল সঙ্গ থেকেই একেবারে খসে' পড়ে' গিয়েছে মনে হয় যেন অন্ধকারে তার মুখের দিকে চাইলে সমস্ত নক্ষত্রলোকের গায়ে

কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি যেখানে রয়েছি সেইখানেই নেই—যারা আমাকে ঘিরে রয়েছে আমি তাদের কাছে থেকেই দূরে। আমি চল্‌চি ফির্‌চি বেঁচে আছি একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে—যেন পদ্মপাতার উপরকার শিশিরবিন্দুর মত।

কিন্তু মানুষ যখন বদ্‌লে যায় তখন তার আগাগোড়া সমস্ত বদল হয় না কেন? হৃদয়ের দিকে তাকালে দেখ্‌তে পাই যা ছিল তা সবই আছে কেবল নড়ে-চড়ে গিয়েচে। যা সাজানো ছিল আজ তা এলোমেলো,—যা কণ্ঠের হারে গাঁথা ছিল আজ তা ধূলোয়। সেই জন্যই ত বুক ফেটে যাচ্চে। ইচ্ছা করে মরি, কিন্তু সবই যে হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে আছে—মরার ভিতরে ত শেষ দেখ্‌তে পাচ্চি নে। আমার মনে হচ্চে যেন মরার মধ্যে আরো ভয়ানক কান্না। যা-কিছু চুকিয়ে দেবার তা বাঁচার ভিতর দিয়েই চুকোতে পারি—অন্য উপায় নেই।

এবারকার মত একবার আমাকে মাপ কর, হে আমার প্রভু! যা-কিছুকে তুমি আমার জীবনের ধন বলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে সে-সমস্তকেই আমি আমার জীবনের বোঝা করে তুলেছি। আজ তা আর বহনও করতে পারচিনে ত্যাগ করতেও পারচিনে। আর-একদিন তুমি আমার ভোর-বেলাকার রাঙা আকাশের ধারে দাঁড়িয়ে যে বাঁশী বাজিয়েছিলে সেই বাঁশীটি বাজাও, সব সমস্যা সহজ হয়ে যাক্—তোমার সেই বাঁশীর সুরটি ছাড়া ভাঙাকে কেউ জুড়তে পারে না, অপবিত্রকে কেউ শুভ্র করতে পারে না। সেই বাঁশীর সুরে আমার সংসারকে তুমি নতুন করে সৃষ্টি কর। নইলে আমি আর কোনো উপায় দেখি নে।

মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগ্‌লুম—একটা কোনো-দয়া কোথাও থেকে চাই, একটা কোনো-আশ্রয়, একটু-ক্ষমার আভাস, একটা এমন আশ্বাস যে, সব চুকে যেতেও পারে। মনে মনে বল্লুম, আমি দিন রাত ধর্না দিয়ে পড়ে থাকব প্রভু—আমি খাব না, আমি জল স্পর্শ করব না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্ব্বাদ এসে পৌঁছয়।

এমন সময় পায়ের শব্দ শুন্‌লুম। আমার বুকের ভিতরটা দুলে উঠ্‌ল। কে বলে দেবতা দেখা দেন না! আমি মুখ তুলে চাইলুম না পাছে আমার দৃষ্টি তিনি সইতে না পারেন। এস, এস, এস,—তোমার পা আমার মাথায় এসে ঠেকুক্, আমার এই বুকের কাঁপনের উপরে এসে দাঁড়াও, প্রভু, আমি এই মুহূর্ত্তেই মরি!

আমার শিয়রের কাছে এসে বস্‌লেন। কে? আমার স্বামী! আমার স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই দেবতারই সিংহাসন নড়ে উঠেছে যিনি আমার কান্না আর সইতে পারলেন না। মনে হল মূর্চ্ছা যাব। তার পরে আমার শিরার বাঁধন যেন ছিঁড়ে ফেলে আমার বুকের বেদনা কান্নার জোয়ারে ভেসে বেরিয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তাঁর পা চেপে ধরলুম—ঐ পায়ের চিহ্ন চিরজীবনের মত ঐখানে আঁকা হয়ে যায় না কি?

এইবার ত সব কথা খুলে বল্লেই হত! কিন্তু এর পরে কি আর কথা আছে? থাক্‌গে আমার কথা!

তিনি আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। আশীর্ব্বাদ পেয়েছি। কাল যে-অপমান আমার জন্যে আসচে সেই অপমানের ডালি সকলের সাম্‌নে মাথায় তুলে নিয়ে আমার দেবতার পায়ে সরল হয়ে প্রণাম করতে পারব।

কিন্তু এই মনে করে আমার বুক ভেঙে যাচ্চে, আজ ন বছর আগে যে-নহবৎ বেজেছিল সে আর ইহজন্মে কোনোদিন বাজ্‌বেনা। এ ঘরে আমাকে বরণ করে এনেছিল যে! ওগো, এই জগতে কোন্ দেবতার পায়ে মাথা কুটে মরলে সেই বউ চন্দন চেলি পরে সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে? কত দিন লাগ্‌বে আর—কত যুগ, কত যুগান্তর—সেই ন বছর আগেকার দিনটিতে আর একটিবার ফিরে যেতে? দেবতা নতুন সৃষ্টি করতে পারেন কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে?

নিখিলেশের আত্মকথা

আজ আমরা কলকাতায় যাব। সুখ দুঃখ কেবলি জমিয়ে তুল্‌তে থাক্‌লে বোঝা ভারি হ'য়ে ওঠে। কেননা বসে থাকাটা মিথ্যে, সঞ্চয় করাটা মিথ্যে। আমি যে এই ঘরের কর্ত্তা এটা বানানো জিনিস্—সত্য এই যে আমি জীবনপথের পথিক। ঘরের কর্ত্তাকে তাই বারেবারে ঘা লাগ্‌বে—তারপরে শেষ আঘাত আছে মৃত্যু। তোমার সঙ্গে আমার যে মিলন সে মিলন চলার মুখে,—যতদূর পর্য্যন্ত একপথে চলা গেল ততদূর পর্য্যন্তই ভালো—তার চেয়ে বেশি টানাটানি করতে গেলেই মিলন হবে বাঁধন। সে-বাঁধন আজ রইল পড়ে—এবার বেরিয়ে পড়লুম—চল্‌তে চল্‌তে যেটুকু চোখে-চোখে মেলে, হাতে-হাতে ঠেকে সেইটুকুই ভালো। তার পরে? তারপরে আছে অনন্ত জগতের পথ, অসীম জীবনের বেগ,—তুমি আমাকে কতটুকু বঞ্চনা করতে পার, প্রিয়ে? সাম্‌নে যে বাঁশী বাজ্‌চে কান দিয়ে যদি শুনি ত শুনতে পাই, বিচ্ছেদের

সমস্ত ফাটলগুলোর ভিতর দিয়ে তার মাধুর্য্যের ঝরণা ঝরে পড়চে। লক্ষ্মীর অমৃত ভাণ্ডার ফুরোবে না বলেই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের পাত্র ভেঙে দিয়ে কাঁদিয়ে হাসেন। আমি ভাঙা পাত্র কুড়োতে যাব না, আমি আমার অতৃপ্তি বুকে নিয়েই সাম্‌নে চলে যাব।

মেজরাণীদিদি এসে বল্লেন, ঠাকুরপো, তোমার বইগুলো সব বাক্স ভরে গোরুর গাড়ি বোঝাই করে যে চল্ল তার মানে কি বল ত।

আমি বল্লুম, তার মানে ঐ বইগুলোর উপর থেকে এখনো মায়া কাটাতে পারিনি।

মায়া কিছু কিছু থাকলেই যে বাঁচি। কিন্তু এখানে আর ফিরবে না নাকি ?

আনাগোনা চল্‌বে কিন্তু পড়ে থাকা আর চল্‌বে না।

সত্যি না কি ? তাহলে একবার এস, একবার দেখ'সে কত জিনিসের উপরে আমার মায়া।—এই বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন।

তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি ছোটবড় নানা রকমের বাক্স আর পুঁটলি। একটা বাক্স খুলে দেখালেন, এই দেখ ঠাকুরপো, আমার পান-সাজার সরঞ্জাম। কেয়াখয়ের গুঁড়িয়ে বোতলের মধ্যে পুরেছি—এই সব দেখচ এক-এক টিন মসলা। এই দেখ তাস, দশপঁচিশও ভুলিনি, তোমাদের না পাই আমি খেলবার লোক জুটিয়ে নেবই। এই চিরুণী তোমারই স্বদেশী চিরুণী, আর এই—

কিন্তু ব্যাপারটা কি মেজরাণী ? এ সব বাক্সয় তুলেচ কেন ?

আমি যে তোমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্চি

সে কি কথা ?

ভয় নেই, ভাই, ভয় নেই, তোমার সঙ্গেও ভাব করতে যাব না, ছোটরাণীর সঙ্গেও ঝগড়া করব না। মরতেই ত হবে তাই সময় থাকতে গঙ্গাতীরের দেশে আশ্রয় নেওয়া ভালো—মলে তোমাদের সেই নেড়া-বটতলায় পোড়াবে সে কথা মনে হলে আমার মরতে ঘেন্না ধরে,—সেই জন্যেই ত এতদিন ধরে তোমাদের জ্বালাচ্চি।

এতক্ষণ পরে আমার এই বাড়ি যেন কথা কয়ে উঠল। আমার বয়স যখন ছয় তখন ন-বছর বয়সে মেজরাণী আমাদের এই বাড়িতে এসেচেন। এই বাড়ির ছাদে দুপুর-বেলায় উঁচু পাঁচিলের কোণের ছায়ায় বসে ওঁর সঙ্গে খেলা করেচি। বাগানে আমড়াগাছে চড়ে উপর থেকে কাঁচা আমড়া ফেলেচি তিনি নীচে বসে সেগুলি কুচি-কুচি করে তার সঙ্গে নুন লঙ্কা ধনেশাক মিশিয়ে অপথ্য তৈরি করেচেন। পুতুলের বিবাহের ভোজ উপলক্ষ্যে যে-সব উপকরণ ভাঁড়ার ঘর থেকে গোপনে সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল তার ভার ছিল আমারই উপরে, কেননা ঠাকুরমার বিচারে আমার কোনো অপরাধের দণ্ড ছিল না। তার পরে যে-সব সৌখীন জিনিসের জন্যে দাদার পরে তাঁর আবদার ছিল সে-আবদারের বাহক ছিলুম আমি,—আমি দাদাকে বিরক্ত করে করে যেমন করে হোক্ কাজ উদ্ধার করে আনতুম। তারপরে মনে পড়ে, তখনকার দিনে জ্বর হলে কবিরাজের কঠোর শাসনে তিন দিন কেবল গরম জল আর এলাচদানা আমার পথ্য ছিল—মেজরাণী আমার দুঃখ সইতে পারতেন না, কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে খাবার এনে

দিয়েচেন ; এক-একদিন ধরা পড়ে তাঁকে ভর্ৎসনাও সইতে হয়েচে। তার পরে বড়-হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের রং নিবিড় হয়ে উঠেচে—কত ঝগড়াও হয়েচে, বিষয়ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক ঈর্ষা, সন্দেহ এবং বিরোধও এসে পড়েচে, আবার তার মাঝখানে বিমল এসে পড়ে কখনো কখনো এমন হয়েচে, যে, মনে হয়েচে বিচ্ছেদ বুঝি আর জুড়বে না—কিন্তু তার পরে প্রমাণ হয়েচে অন্তরের মিল সেই বাইরের ক্ষতের চেয়ে অনেক প্রবল। এমনি করে শিশুকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত একটি সত্য সম্বন্ধ দিনে দিনে অবিচ্ছিন্ন হয়ে জেগে উঠেচে ; সেই সম্বন্ধের শাখা প্রশাখা এই বৃহৎ বাড়ির সমস্ত ঘরে আঙিনায় বারান্দায় ছাদে বাগানে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে সমস্তকে অধিকার করে দাঁড়িয়েচে।—যখন দেখ্‌লুম মেজরাণী তাঁর সমস্ত ছোট-খাট জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্স বোঝাই করে আমাদের বাড়ির থেকে যাবার মুখ করে দাঁড়িয়েচেন তখন এই চিরসম্বন্ধটির সমস্ত শিকড়গুলি পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠ্‌ল। আমি বেশ বুঝতে পারলুম কেন মেজরাণী, যিনি ন বছর বয়স থেকে আর এপর্য্যন্ত কখনও একদিনের জন্যও এ-বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাটান নি, তিনি তাঁর সমস্ত অভ্যাসের বাঁধন কেটে ফেলে অপরিচিতের মধ্যে ভেসে চল্লেন। অথচ সেই আসল কারণটির কথা মুখ ফুটে বল্‌তেই চান না—অন্য কত রকমের তুচ্ছ ছুতো তোলেন। এই ভাগ্যকর্ত্তৃক বঞ্চিত পতিপুত্রহীনা নারী সংসারের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র সম্বন্ধকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত অমৃত দিয়ে পালন করেচেন, তার বেদনা যে কত গভীর সে আজ তাঁর এই ঘরময় ছড়াছড়ি বাক্স পুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে যত স্পষ্ট করে

বুঝলুম এমন আর কোনো দিন বুঝি নি। আমি বুঝেছি টাকা-কড়ি ঘরদুয়ারের ভাগ নিয়ে ছোটখাট সামান্য সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে বিমলের সঙ্গে আমার সঙ্গে তাঁর যে বারবার ঝগড়া হয়ে গেছে তার কারণ বৈষয়িকতা নয়, তার কারণ তাঁর জীবনের এই একটিমাত্র সম্বন্ধে তাঁর দাবী তিনি প্রবল করতে পারেন নি—বিমল কোথা থেকে হঠাৎ মাঝখানে এসে এ'কে ম্লান করে দিয়েচে,—এইখানে তিনি নড়তে-চড়তে ঘা পেয়েচেন অথচ তাঁর নালিশ করবার জোর ছিল না। বিমলও একরকম করে বুঝেছিল আমার উপর মেজরাণীর দাবী কেবলমাত্র সামাজিকতার দাবী নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর,—সেইজন্যে আমাদের এই আশৈশবের সম্পর্কটির পরে তার এতটা ঈর্ষা। আজ বুকের দরজাটার কাছে আমার হৃদয় ধক্ ধক্ করে ঘা দিতে লাগ্‌ল। একটা তোরঙ্গের উপর বসে পড়লুম—বল্লুম, মেজরাণীদিদি, আমরা দুজনেই এই বাড়িতে যেদিন নতুন দেখা দিয়েচি সেই দিনের মধ্যে আর-একবার ফিরে যেতে বড় ইচ্ছে করে।

মেজরাণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন, না ভাই, মেয়ে-জন্ম নিয়ে আর নয়,—যা সয়েচি তা একটা-জন্মের উপর দিয়েই যাক্, ফের আর কি সয়?

আমি বলে উঠলুম, দুঃখের ভিতর দিয়ে যে মুক্তি আসে সেই মুক্তি দুঃখের চেয়ে বড়।

তিনি বল্লেন, তা হতে পারে, ঠাকুরপো, তোমরা পুরুষমানুষ, মুক্তি তোমাদের জন্যে। আমরা মেয়েরা বাঁধতে চাই, বাঁধা পড়তে চাই,—আমাদের কাছ থেকে তোমরা সহজে ছাড়া পাবে না গো। ডানা

যদি মেলতে চাও আমাদের সুদ্ধ নিতে হবে—ফেলতে পারবে না। সেই জন্যেই ত এই সব বোঝা সাজিয়ে রেখেচি—তোমাদের একেবারে হাল্কা হতে দিলে কি আর রক্ষা আছে!

আমি হেসে বল্লুম, তাই ত দেখচি—বোঝা বলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে। কিন্তু এই বোঝা বইবার মজুরি তোমরা পুষিয়ে দাও বলেই আমরা নালিশ করি নে।

মেজরাণী বল্লেন, আমাদের বোঝা হচ্চে ছোট জিনিসের বোঝা। যাকেই বাদ দিতে যাবে সেই বলবে আমি সামান্য, আমার ভার কতটুকুইবা,—এমনি করে হাল্কা জিনিস দিয়েই আমরা তোমাদের মোট ভারী করি। কখন্ বেরতে হবে ঠাকুরপো?

রাত্তির সাড়ে এগারোটায়—সে এখনো ঢের সময় আছে।

দেখ ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটি, আমার একটি কথা রাখ্তে হবে—আজ সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়ে নিয়ো—গাড়িতে রাত্তিরে ত ভালো ঘুম হবে না। তোমার শরীর এমন হয়েচে দেখ্লেই মনে হয় আর-একটু হলেই ভেঙে পড়বে। চল, এখনি তোমাকে নাইতে যেতে হবে।

এমন সময় ক্ষেমা মস্ত একটা ঘোমটা টেনে মৃদুস্বরে বল্লে, দারোগা-বাবু কাকে সঙ্গে করে এনেচে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মেজরাণী রাগ করে উঠে বল্লেন, মহারাজ চোর না ডাকাত যে দারোগা তার সঙ্গে লেগেই রয়েচে! বলে আয় গে, মহারাজ এখন নাইতে গেছেন।

আমি বল্লুম, একবার দেখে আসিগে—হয় ত কোনো জরুরি কাজ আছে।

মেজরাণী বল্লেন, না সে হবে না। ছোটরাণী কাল বিস্তর পিঠে তৈরি করেচে, দারোগাকে সেই পিঠে খেতে পাঠিয়ে তার মেজাজ ঠাণ্ডা করে রাখ্‌চি।—বলে তিনি আমাকে হাতে ধরে টেনে স্নানের ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমি ভিতর থেকে বল্লুম, আমার সাফ কাপড় যে এখনো—

তিনি বল্লেন, সে আমি ঠিক করে রাখব, ততক্ষণ তুমি স্নান করে নাও!

এই উৎপাতের শাসনকে অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই—সংসারে এ যে বড় দুর্লভ। থাক্‌গে, দারোগাবাবু বসে বসে পিঠে খাক্‌গে! না-হয় হল আমার কাজের অবহেলা!

ইতিমধ্যে সেই ডাকাতি নিয়ে দারোগা দুপাঁচ জনকে ধরা-পাকড়া করচেই। রোজই একটা না-একটা নিরীহ লোককে ধরে-বেঁধে এনে আসর গরম করে রেখেচে। আজও বোধ হয় তেমনি কোন্ এক অভাগাকে পাকড়া করে এনেছে। কিন্তু পিঠে কি একলা দারোগাই খাবে? সে ত ঠিক নয়। দরজায় দমাদম ঘা লাগালুম। মেজরাণী বাইরে থেকে বল্লেন, জল ঢালো, জল ঢালো, মাথা গরম হয়ে উঠেছে বুঝি?

আমি বল্লুম, পিঠে দুজনের মত সাজিয়ে পাঠিয়ো—দারোগা যাকে চোর বলে ধরেচে, পিঠে তারই প্রাপ্য—বেহারাকে বলে দিয়ো তার ভাগে যেন বেশি পড়ে।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্নান সেরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। দেখি দরজার বাইরে মাটির উপরে বিমল বসে। এ কি আমার

সেই বিমল, সেই তেজে অভিমানে ভরা গরবিণী? কোন্ ভিক্ষা মনের মধ্যে নিয়ে এ আমার দরজাতেও বসে থাকে? আমি একটু থম্‌কে দাঁড়াতেই সে উঠে মুখ একটু নীচু করে আমাকে বল্লে, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

আমি বল্লুম, তাহলে এস আমাদের ঘরে।

কোনো বিশেষ কাজে কি তুমি বাইরে যাচ্চ?

হাঁ, কিন্তু থাক্ সে কাজ—আগে তোমার সঙ্গে—

না, তুমি কাজ সেরে এস—তারপরে তোমার খাওয়া হলে কথা হবে।

বাইরে গিয়ে দেখি দারোগার পাত্র শূন্য—সে যাকে ধরে এনেচে সে তখনো বসে বসে পিঠে খাচ্চে।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম, এ কি, অমূল্য যে!

সে এক-মুখ পিঠে নিয়ে বল্লে, আজ্ঞে হাঁ,—পেট-ভরে খেয়ে নিয়েচি, এখন কিছু যদি না মনে করেন তাহলে যে ক'টা বাকি আছে রুমালে বেঁধে নিই।—বলে পিঠেগুলো সব রুমালে বেঁধে নিলে।

আমি দারোগার দিকে চেয়ে বল্লুম, ব্যাপারখানা কি?

দারোগা হেসে বল্লে, মহারাজ, চোরের হেঁয়ালি ত হেঁয়ালিই রয়ে গেছে, তার উপরে চোরাই মালের হেঁয়ালি নিয়ে মাথা ঘোরাচ্চি।

এই বলে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলে এক-তাড়া নোট সে আমার সাম্‌নে ধরলে। বল্লে, এই মহারাজের ছ হাজার টাকা।

কোথা থেকে বেরল ?

আপাতত অমূল্যবাবুর হাত থেকে। উনি কালরাত্রে আপনার চকুয়া কাছারির নায়েবের কাছে গিয়ে বল্লেন, চোরাই নোট পাওয়া গেছে।—চুরি যেতে নায়েব এত ভয় পায় নি যেমন এই চোরাই মাল ফিরে পেয়ে। তার ভয় হল সবাই সন্দেহ করবে এ নোট সেই লুকিয়ে রেখেছিল এখন বিপদের সম্ভাবনা দেখে একটা অসম্ভব গল্প বানিয়ে তুলেচে। সে অমূল্যবাবুকে খাওয়াবার ছল করে বসিয়ে রেখেই থানায় খবর দিয়েচে। আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েই ভোর থেকে ওঁকে নিয়ে পড়েচি। উনি বল্লেন, কোথা থেকে পেয়েচি সে আপনাকে বল্‌ব না। আমি বল্লুম, না বল্লে আপনি ত ছাড়া পাবেন না। উনি বলেন, মিথ্যে বল্‌ব। আমি বলি, আচ্ছা তাই বলুন। উনি বলেন, ঝোপের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেয়েচি। আমি বল্লুম, মিথ্যে কথা অত সহজ নয়। কোথায় ঝোপ, সেই ঝোপের মধ্যে আপনি কি দরকারে গিয়েছিলেন সমস্ত বলা চাই। উনি বল্লেন, সে সমস্ত বানিয়ে তোলবার আমি যথেষ্ট সময় পাব—সে জন্যে কিছু চিন্তা করবেন না।

আমি বল্লুম, হরিচরণবাবু, ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে মিছিমিছি টানাটানি করে কি হবে!

দারোগা বল্লেন, শুধু ভদ্রলোকের ছেলে নয়, উনি নিবারণ ঘোষালের ছেলে—তিনি আমার ক্লাস্‌-ফ্রেণ্ড ছিলেন। মহারাজ, আমি আপনাকে বলে দিচ্চি—ব্যাপারখানা কি? অমূল্য জান্‌তে পেরেচেন কে চুরি করেচে—এই বন্দেমাতরমের হুজুক উপলক্ষ্যে তাকে উনি চেনেন। নিজের ঘাড়ে দায় নিয়ে তাকে উনি বাঁচাতে

চান। এই সব হচ্চে ওঁর বীরত্ব। বাবা, আমাদেরও বয়েস একদিন তোমাদেরই মত ঐ আঠারো-উনিশ ছিল—পড়তুম রিপন কলেজে—একদিন ষ্ট্র্যাণ্ডে একটা গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে পাহারাওয়ালার জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রায় জেলখানার সদর দরজার দিকে ঝুঁকেছিলুম—দৈবাৎ ফস্‌কে গেছে।—মহারাজ এখন চোর ধরা-পড়া শক্ত হল কিন্তু আমি বলে রাখচি কে এর মূলে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কে?

আপনার নায়েব তিনকড়ি দত্ত আর ঐ কাসেম সর্দ্দার।

দারোগা তাঁর এই অনুমানের পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে যখন চলে গেলেন আমি অমূল্যকে বল্লুম, এই টাকাটা কে নিয়েছিল আমাকে যদি বল কারো কোনো ক্ষতি হবে না।

সে বল্লে, আমি।

কেমন করে? ওরা যে বলে ডাকাতের দল—

আমি একলা।

অমূল্য যা বল্লে সে অদ্ভুত। নায়েব রাত্রে আহার সেরে বাইরে বসে আঁচাচ্ছিল, সে জায়গাটা ছিল অন্ধকার। অমূল্যর দুই পকেটে দুই পিস্তল, একটাতে ফাঁকা টোটা আর একটাতে গুলি ভরা। ওর মুখের আধখানাতে ছিল কালো মুখোষ। হঠাৎ একটা বুল্‌স্‌-আই লণ্ঠনের আলো নায়েবের মুখে ফেলে পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করতেই সে হাঁউমাউ শব্দ করে মূর্চ্ছা গেল—দু চারজন বর্কন্দাজ ছুটে আস্‌তেই তাদের মাথার উপর পিস্তলের আওয়াজ করে দিলে, তারা যে-যেখানে পারলে ঘরের মধ্যে ঢুকে

দরজা বন্ধ করে দিলে। কাসেম সর্দ্দার লাঠি হাতে ছুটে এল, তার পা লক্ষ্য করে গুলি মারতেই সে বসে পড়ল। তারপরে ঐ নায়েবকে দিয়ে লোহার সিন্ধুক খুলিয়ে ছ-হাজার টাকার নোট গুলো নিয়ে আমাদের কাছারির এক ঘোড়া মাইল পাঁচ ছয় ছুটিয়ে সেই ঘোড়াটাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে পর-দিন সকালে আমার এখানে এসে পৌঁচেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, এ কাজ কেন করতে গেলে?

সে বল্লে, আমার বিশেষ দরকার ছিল।

তবে আবার ফিরিয়ে দিলে কেন?

যাঁর হুকুমে ফিরিয়ে দিলুম তাঁকে ডাকুন, তাঁর সাম্‌নে আমি বল্‌ব।

তিনি কে?

ছোট-রাণীদিদি।

বিমলকে ডেকে পাঠালুম। তিনি একখানি সাদা শাল মাথার উপর দিয়ে ফিরিয়ে গা ঢেকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লেন—পায়ে জুতোও ছিল না। দেখে আমার মনে হল বিমলকে এমন যেন আর কখনো দেখি নি—সকালবেলাকার চাঁদের মত ও যেন আপনাকে প্রভাতের আলো দিয়ে ঢেকে এনেচে।

অমূল্য বিমলের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, তোমার আদেশ পালন করে এসেচি দিদি। টাকা ফিরিয়ে দিয়েচি।

বিমল বল্লে, বাঁচিয়েচ, ভাই।

অমূল্য বল্লে, তোমাকে স্মরণ করেই একটি মিথ্যা কথাও বলি

নি। আমার বন্দেমাতরম্ মন্ত্র রইল তোমার পায়ের তলায়। ফিরে এসে এই বাড়িতে ঢুকেই তোমার প্রসাদও পেয়েচি।

বিমলা এ কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। অমূল্য পকেট থেকে রুমাল বের করে তার গ্রন্থি খুলে সঞ্চিত পিঠেগুলি দেখালে। বল্লে, সব খাই নি, কিছু রেখেচি—তুমি নিজের হাতে আমার পাতে তুলে দিয়ে খাওয়াবে বলে এইগুলি জমানো আছে।

আমি বুঝলুম এখানে আমার আর দরকার নেই; ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। মনে ভাবলুম আমি ত কেবল বকে বকেই মরি, আর ওরা আমার কুশপুত্তলির গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা পরিয়ে নদীর ধারে দাহ করে। কাউকে ত মরার পথ থেকে ফেরাতে পারিনে—যে পারে সে ইঙ্গিতেই পারে। আমাদের বাণীতে সেই অমোঘ ইঙ্গিত নেই। আমরা শিখা নই, আমরা অঙ্গার, আমরা নিবোনো, আমরা দীপ জ্বালাতে পারব না। আমার জীবনের ইতিহাসে সেই কথাটাই প্রমাণ হল, আমার সাজানো বাতি জ্বল্‌ল না।

আবার আস্তে আস্তে অন্তঃপুরে গেলুম। বোধ হয় আর-একবার মেজরাণীর ঘরের দিকে আমার মনটা ছুট্‌ল। আমার জীবনও এ-সংসারে কোনো একটা জীবনের বীণায় সত্য এবং স্পষ্ট আঘাত দিয়েছে এটা অনুভব করা আজ আমার যে বড় দরকার;—নিজের অস্তিত্বের পরিচয় ত নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না—বাইরে আর-কোথাও যে তার খোঁজ করতে হয়।

মেজরাণীর ঘরের সাম্‌নে আস্‌তেই তিনি বেরিয়ে এসে বল্লেন, এই যে, ঠাকুরপো, আমি বলি বুঝি তোমার আজও দেরী হয়। আর দেরী নেই, তোমার খাবার তৈরী রয়েচে এখনি আসচে।

আমি বল্লুম, ততক্ষণ সেই টাকাটা বের করে ঠিক করে রাখি।

আমার শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে মেজরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, দারোগা যে এল, সেই চুরির কোন আস্কারা হল না কি?

সেই ছ-হাজার টাকা ফিরে পাবার ব্যাপারটা মেজরাণীর কাছে আমার বল্‌তে ইচ্ছে হল না। আমি বল্লুম, সেই নিয়েই ত চল্‌চে।

লোহার সিন্ধুকের ঘরে গিয়ে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দেখি সিন্ধুকের চাবিটাই নেই। অদ্ভুত আমার অন্য-মনস্কতা! এই চাবির রিং নিয়ে আজ সকাল থেকে কতবার কত বাক্স খুলেচি আলমারি খুলেচি কিন্তু একবারও লক্ষ্যই করি নি যে সে চাবিটা নেই।

মেজরাণী বল্লেন, চাবি কই?

আমি তার জবাব না করে বৃথা এ-পকেট ও-পকেট নাড়া দিলুম—দশবার করে সমস্ত জিনিসপত্র হাঁট্‌কে খোঁজাখুঁজি করলুম। আমাদের বোঝবার বাকি রইল না যে, চাবি হারায় নি, কেউ একজন রিং থেকে খুলে নিয়েচে। কে নিতে পারে? এ ঘরে ত—

মেজরাণী বল্লেন, ব্যস্ত হোয়ো না, আগে তুমি খেয়ে নাও। আমার বিশ্বাস, তুমি অসাবধান বলেই ছোটরাণী ঐ চাবিটা বিশেষ করে তার বাক্সে তুলে রেখেচে।

আমার ভারি গোলমাল ঠেক্‌তে লাগল। আমাকে না-জানিয়ে বিমল রিং থেকে চাবি বের করে নেবে এ তার স্বভাব নয়।

আমার খাবার সময় আজ বিমলা ছিল না—সে তখন রান্নাঘর থেকে ভাত আনিয়ে অমূল্যকে নিজে বসে খাওয়াচ্ছিল। মেজরাণী তাকে ডাক্‌তে পাঠাচ্ছিলেন—আমি বারণ করলুম।

খেয়ে উঠেচি এমন সময় বিমল এল। আমার ইচ্ছা ছিল মেজরাণীর সাম্‌নে এই চাবি-হারানোর কথাটার আলোচনা না হয়। কিন্তু সে আর ঘটল না। বিমল আস্‌তেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরপোর লোহার সিন্ধুকের চাবি কোথায় আছে জানিস্‌?

বিমল বল্লে, আমার কাছে।

মেজরাণী বল্লেন, আমি ত বলেছিলুম! চারিদিকে চুরি ডাকাতি হচ্চে, ছোটরাণী বাইরে দেখাত ওর ভয় নেই কিন্তু ভিতরে ভিতরে সাবধান হতে ছাড়ে নি।

বিমলের মুখ দেখে মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগল—বল্লুম, আচ্ছা, চাবি এখ তোমার কাছেই থাক্‌, বিকেলে টাকাটা বের করে নেব।

মেজরাণী বলে উঠলেন, আবার বিকেলে কেন, ঠাকুরপো, এই-বেলা ওটা বের করে নিয়ে খাজাঞ্চির কাছে পাঠিয়ে দাও।

বিমল বল্লে, টাকাটা আমি বের করে নিয়েচি।

চম্‌কে উঠলুম।

মেজরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, বের করে নিয়ে রাখলি কোথায়?

বিমল বল্লে, খরচ করে ফেলেচি।

মেজরাণী বল্লেন, ওমা, শোন একবার! এত টাকা খরচ কল্লি কিসে?

বিমল তার কোনো উত্তর করলে না। আমিও তাকে কোনো

কথা জিজ্ঞাসা করলুম না—দরজা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেজরাণী বিমলকে কি-একটা বলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন; আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, বেশ করেচে নিয়েচে। আমার স্বামীর পকেটে বাক্সে যা-কিছু টাকা থাকত সব আমি চুরি করে লুকিয়ে রাখতুম, জানতুম সে-টাকা পাঁচভূতে লুটে খাবে। ঠাকুরপো, তোমারও প্রায় সেই দশা—কত খেয়ালেই যে টাকা ওড়াতে জান। তোমাদের টাকা যদি আমরা চুরি করি তবেই সে-টাকা রক্ষা পাবে। এখন চল একটু শোবে চল।

মেজরাণী আমাকে শোবার ঘরে ধরে নিয়ে গেলেন, আমি কোথায় চলেচি আমার মনেও ছিল না। তিনি আমার বিছানার পাশে বসে প্রফুল্ল মুখে বল্লেন, ওলো ও ছুটু, একটা পান দে ত ভাই। তোরা যে একেবারে বিবি হয়ে উঠলি! পান নেই ঘরে? না হয় আমার ঘর থেকেই আনিয়ে দেনা।

আমি বল্লুম, মেজরাণী, তোমার ত এখনো খাওয়া হয় নি।

তিনি বল্লেন, কোন্ কালে।

এটা একেবারে মিথ্যে কথা। তিনি আমার পাশে বসে যা-তা বকতে লাগলেন, কত রাজ্যের কত বাজে কথা। দাসী এসে দরজার বাইরে থেকে খবর দিলে বিমলের ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে। বিমল কোনো সাড়া দিলে না। মেজরাণী বল্লেন, ও কি, এখনো তোর খাওয়া হয় নি বুঝি? বেলা যে ঢের হল।—এই বলে জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেলেন।

সেই ছ-হাজার টাকার ডাকাতির সঙ্গে এই লোহার সিন্দুকের টাকা বের করে নেওয়ার যে যোগ আছে তা বুঝতে পারলুম।

কি রকমের যোগ সে কথা জান্‌তেও ইচ্ছা করল না—কোনোদিন সে প্রশ্নও করব না।

বিধাতা আমাদের জীবন-ছবির দাগ একটু ঝাপসা করেই টেনে দেন—আমরা নিজের হাতে সেটাকে কিছু-কিছু বদ্‌লে মুছে পূরিয়ে দিয়ে নিজের মনের মত একটা স্পষ্ট চেহারা ফুটিয়ে তুল্‌ব এই তাঁর অভিপ্রায়। সৃষ্টিকর্ত্তার ইসারা নিয়ে নিজের জীবনটাকে নিজে সৃষ্টি করে তুলব, একটা বড় আইডিয়াকে আমার সমস্তর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে দেখাব এই বেদনা বরাবর আমার মনে আছে।

এই সাধনাতে এতদিন কাটিয়েচি! প্রবৃত্তিকে কত বঞ্চিত করেচি নিজেকে কত দমন করেছি সেই অন্তরের ইতিহাস অন্তর্যামীই জানেন। শক্ত কথা এই যে, কারো জীবন একলার জিনিস নয় —সৃষ্টি যে করবে সে নিজের চারদিককে নিয়ে যদি সৃষ্টি না করে তবে ব্যর্থ হবে। মনের মধ্যে তাই একান্ত একটা প্রয়াস ছিল যে বিমলকেও এই রচনার মধ্যে টান্‌ব। সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাকে ভালো যখন বাসি তখন কেন পারব না এই ছিল আমার জোর।

এমন সময় স্পষ্ট দেখতে পেলুম নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চারিদিককে যারা সহজেই সৃষ্টি করতে পারে তারা এক-জাতের মানুষ, আমি সে জাতের না। আমি মন্ত্র নিয়েচি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারি নি। যাদের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েচি তারা আমার আর-সবই নিয়েচে কেবল আমার এই অন্তরতম জিনিসটি ছাড়া। আমার পরীক্ষা কঠিন হল। সব-চেয়ে যেখানে

সহায় চাই সব-চেয়ে সেখানেই একলা হলুম। এই পরীক্ষাতেও জিতব এই আমার পণ রইল। জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার দুর্গম পথ আমার একলারই পথ।

আজ সন্দেহ হচ্চে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁৎ-করে ঢালাই করব আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা ত ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে করে গড়ে তুল্‌তে গেলেই মরে-গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয়।

এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাৎ হয়ে গেচি তা জান্‌তেই পারিনি। বিমল নিজে যা হতে পারত তা আমার চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারেনি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ ক্ষইয়ে ফেলেচে। এই ছ-হাজার টাকা আজ ওকে চুরি করে নিতে হয়েচে,—আমার সঙ্গে ও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারে নি, কেননা ও বুঝেচে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলরূপে পৃথক। আমাদের মত এক-রোখা আইডিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে তারা মেলে, যারা মেলেনা তারা আমাদের ঠকায়। সরল মানুষকেও আমরা কপট করে তুলি। আমরা সহধর্ম্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।

আবার কি সেই গোড়ায় ফেরা যায় না? তা হলে একবার সহজের রাস্তায় চলি। আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোনো আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে চাইব না—কেবল আমার ভালো-বাসার বাঁশি বাজিয়ে বলব, তুমি আমাকে ভালোবাস, সেই ভালো-

বাসার আলোতে তুমি যা তারই পূর্ণ বিকাশ হোক্, আমার ফরমাস একেবারে চাপা পড়ুক—তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছ আছে তারই জয় হোক্, আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক।

কিন্তু আমাদের মধ্যেকার যে বিচ্ছেদটা ভিতরে ভিতরে জমছিল সেটা আজ এমনতর একটা ক্ষতর মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েচে যে, আর কি তার উপর স্বভাবের শুশ্রূষা কাজ করতে পারবে ? যে আব্রুর আড়ালে প্রকৃতি আপনার সংশোধনের কাজ নিঃশব্দে করে সেই আব্রু যে একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল! ক্ষতকে ঢাকা দিতে হয়, এই ক্ষতকে আমার ভালোবাসা দিয়ে ঢাকব---বেদনাকে আমার হৃদয় দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে বাইরের স্পর্শ থেকে আড়াল করে রাখব—একদিন এমন হবে যে, এই ক্ষতর চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকবে না। কিন্তু আর কি সময় আছে ? এতদিন গেল ভুল বুঝতে, আজকের দিন এল ভুল ভাঙতে, কতদিন লাগ্‌বে ভুল শোধরাতে! তার পরে ? তারপরে ক্ষত শুকোতেও পারে কিন্তু ক্ষতিপূরণ কি আর কোনো কালে হবে ?

একটা কি খট্‌ করে উঠল—ফিরে তাকিয়ে দেখি বিমল দরজার কাছ থেকে ফিরে যাচ্চে। বোধ হয় দরজার পাশে এসে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল—ঘরে ঢুকবে কি না-ঢুকবে ভেবে পাচ্ছিল না—শেষে ফিরে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ডাকলুম, বিমল! সে থমকে দাঁড়াল, তার পিঠ ছিল আমার দিকে। আমি তাকে হাতে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলুম।

ঘরে এসেই মেঝের উপর পড়ে মুখের উপর একটা বালিস

আঁকড়ে ধরে তার কান্না! আমি একটি কথা না বলে তার হাত ধরে মাথার কাছে বসে রইলুম।

কান্নার বেগ থেমে গিয়ে উঠে বসতেই আমি তাকে আমার বুকের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলুম। সে একটু জোর করে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর বার বার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল। আমি পা সরিয়ে নিতেই সে দুই হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে গদ্গদ স্বরে বল্লে, না, না, না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না—আমাকে পূজো করতে দিও।

আমি তখন চুপ করে রইলুম। এ পূজায় বাধা দেবার আমি কে! যে-পূজা সত্য সে-পূজার দেবতাও সত্য,—সে-দেবতা কি আমি, যে, আমি সঙ্কোচ করব?

বিমলার আত্মকথা

চল, চল, এইবার বেরিয়ে পড়,—সকল ভালোবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেচে সেই সাগর-সঙ্গমে। সেই নির্ম্মল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পঙ্কের ভার মিলিয়ে যাবে। আর আমি ভয় করিনে,—আপনাকেও না, আর-কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেচি—যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই-আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেচেন।

আজ রাত্রে কলকাতায় যেতে হবে। এতক্ষণ অন্তর বাহিরের

নানা গোলমালে জিনিসপত্র গোছাবার কাজে মন দিতে পারি নি। এইবার বাক্সগুলো টেনে নিয়ে গোছাতে বস্লুম। খানিক বাদে দেখি আমার স্বামীও আমার পাশে এসে জুট্লেন। আমি বল্লুম, না, ও হবে না,—তুমি যে একটু ঘুমিয়ে নেবে আমাকে কথা দিয়েচ!

আমার স্বামী বল্লেন, আমিই যেন কথা দিয়েচি কিন্তু আমার ঘুম ত কথা দেয় নি—তার যে দেখা নেই।

আমি বল্লুম, না সে হবে না—তুমি শুতে যাও!

তিনি বল্লেন, তুমি একলা পারবে কেন?

খুব পারব!

আমি না হলেও তোমার চলে এ জাঁক তুমি করতে চাও কর কিন্তু তুমি না হলে আমার চলে না। তাই একলা-ঘরে কিছুতেই আমার ঘুম এল না।

এই বলে তিনি কাজে লেগে গেলেন। এমন সময় বেহারা এসে জানালে, সন্দীপবাবু এসেচেন, তিনি খবর দিতে বল্লেন।

খবর কাকে দিতে বল্লেন সে কথা জিজ্ঞাসা করবার জোর ছিল না। আমার কাছে একমুহূর্ত্তে আকাশের আলোটা যেন লজ্জাবতী লতার মত সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

আমার স্বামী বল্লেন, চল বিমল শুনে আসি সন্দীপ কি বলে। ও ত বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল আবার যখন ফিরে এসেচে তখন বোধ হয় বিশেষ কোনো কথা আছে।

যাওয়ার চেয়ে না যাওয়াটাই বেশি লজ্জা বলে স্বামীর সঙ্গে বাইরে গেলুম। বৈঠকখানার ঘরে সন্দীপ দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো

ছবি দেখছিল। আমরা যেতেই বলে উঠ্‌ল—তোমরা ভাবচ লোকটা ফেরে কেন? সৎকার সম্পূর্ণ শেষ না হলে প্রেত বিদায় হয় না।

এই বলে চাদরের ভিতর থেকে সে একটা রুমালের পুঁটুলি বের করে টেবিলের উপরে খুলে ধরলে। সেই গিনিগুলো। বল্লে, নিখিল, ভুল কোরোনো, ভেবনা হঠাৎ তোমাদের সংসর্গে পড়ে সাধু হয়ে উঠেছি। অনুতাপের অশ্রুজল ফেল্‌তে ফেল্‌তে এই ছ-হাজার টাকার গিনি ফিরিয়ে দেবার মত ছিঁচকাদুনে সন্দীপ নয়। কিন্তু—

এই বলে সন্দীপ কথাটা আর শেষ করলে না। একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে চেয়ে বল্লে, মক্ষিরাণী, এতদিন পরে সন্দীপের নির্ম্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেচে—রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেচি সে নিতান্ত ফাঁকি নয়—তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই। সেই আমার সর্ব্বনাশিনা কিন্তুর হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখলুম পৃথিবীতে কেবলমাত্র তারই ধন আমি নিতে পারব না—তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব, দেবী! এই নাও!—

বলে সেই গয়নার বাক্সটিও বের করে টেবিলের উপর রেখে সন্দীপ দ্রুত চলে যাবার উপক্রম করলে। আমার স্বামী তাকে ডেকে বল্লেন, শুনে যাও, সন্দীপ!

সন্দীপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে, আমার সময় নেই নিখিল। খবর পেয়েছি মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মত লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে রাখবার মৎলব করেচে।

কিন্তু আমার বেঁচে থাকার দরকার। উত্তরের গাড়ি ছাড়তে আর পঁচিশ মিনিট মাত্র আছে। অতএব এখনকার মত চল্লুম—তার পরে আবার একটু অবকাশ পেলে তোমাদের সঙ্গে বাকি সমস্ত কথা চুকিয়ে দেব। যদি আমার পরামর্শ নাও, তুমিও বেশি দেরি কোরো না। মক্ষিরাণী, বন্দে প্রলয়রূপিনীং হৃৎপিণ্ডমালিনীং!

এই বলে সন্দীপ প্রায় ছুটে চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। গিনি আর গয়নাগুলো যে কত তুচ্ছ সে আর-কোনো-দিন এমন করে দেখ্‌তে পাইনি। কত জিনিস সঙ্গে নেব, কোথায় কি ধরাব, এই কিছু আগে তাই ভাবছিলুম এখন মনে হল কোনো জিনিসই নেবার দরকার নেই—কেবল বেরিয়ে চলে যাওয়াটাই দরকার।

আমার স্বামী চৌকি থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বল্লেন, আর ত বেশি সময় নেই এখন কাজগুলো সেরে নেওয়া যাক্!

এমন সময় চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সঙ্কুচিত হলেন—বল্লেন, মাপ কোরো মা, খবর দিয়ে আস্‌তে পারি নি। নিখিল, মুসলমানের দল ক্ষেপে উঠেচে। হরিশকুণ্ডুর কাছারি লুট হয়ে গেছে। সে-জন্যে ভয় ছিল না কিন্তু মেয়েদের উপর তারা যে অত্যাচার আরম্ভ করেচে সে ত প্রাণ থাক্‌তে সহ্য করা যায় না!

আমার স্বামী বল্লেন, আমি তবে চল্লুম।

আমি তাঁর হাত ধরে বল্লুম, তুমি গিয়ে কি করতে পারবে? মাষ্টারমশায়, আপনি ওঁকে বারণ করুন।

চন্দ্রনাথবাবু বল্লেন, মা, বারণ করবার ত সময় নেই।

আমার স্বামী বল্লেন, কিচ্ছু ভেবোনা বিমল।

জানলার কাছে গিয়ে দেখ্‌লুম, তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। হাতে তাঁর কোনো অস্ত্রও ছিল না।

একটু পরেই মেজরাণী ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকেই বল্লেন, করলি কি, ছুটু, কি সর্ব্বনাশ করলি? ঠাকুরপোকে যেতে দিলি কেন? —বেহারাকে বল্লেন, ডাক্ ডাক্ শীগ্‌গির দেওয়ানবাবুকে ডেকে আন্।

দেওয়ানবাবুর সাম্‌নে মেজরাণী কোনোদিন বেরন নি। সেদিন তাঁর লজ্জা ছিল না। বল্লেন, মহারাজকে ফিরিয়ে আন্‌তে শিগ্‌গির সওয়ার পাঠাও।

দেওয়ানবাবু বল্লেন, আমরা অনেক মানা করেচি, তিনি ফিরবেন না।

মেজরাণী বল্লেন, তাঁকে বলে পাঠাও, মেজরাণীর ওলাউঠো হয়েচে—তার মরণকাল আসন্ন।

দেওয়ান চলে গেলে মেজরাণী আমাকে গাল দিতে লাগ্‌লেন, রাক্ষুসী, সর্ব্বনাশী! নিজে মরলিনে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি।

দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানলার সামনে পশ্চিম-দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত সজ্‌নে গাছটার পিছনে সূর্য্য অস্ত গেল। সেই সূর্য্যাস্তের প্রত্যেক রেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্চি। অস্তমান সূর্য্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুইভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল, একটা প্রকাণ্ড পাখীর ডানা মেলার মত,—তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে-থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল আজকের দিনটা যেন হুহু করে উড়ে চলেচে রাত্রের সমুদ্র পার হবার জন্যে।

অন্ধকার হয়ে এল। দূর গ্রামে আগুন লাগলে থেকে থেকে যেমন তার শিখা আকাশে লাফিয়ে উঠ্‌তে থাকে—তেমনি বহুদূর থেকে এক-একবার এক-একটা কলরবের ঢেউ অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন ফেঁপে উঠতে লাগ্‌ল।

ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠল। আমি জানি মেজরাণী সেইঘরে গিয়ে জোড়হাত করে বসে আছেন। আমি এই রাস্তার ধারের জানলা ছেড়ে এক পা কোথাও নড়তে পারলুম না। সাম্‌নেকার রাস্তা গ্রাম, আরো দূরেকার শস্যশূন্য মাঠ এবং তারও শেষ-প্রান্তে গাছের রেখা ঝাপ্‌সা হয়ে এল। রাজবাড়ির বড় দিঘিটা অন্ধের চোখের মত আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকের ফটকের উপরকার নবৎখানাটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কি-যেন-একটা দেখতে পাচ্চে।

রাত্রিবেলাকার শব্দ যে কতরকমের ছদ্মবেশ ধরে তার ঠিকানা নেই। কাছে কোথায় একটা ডাল নড়ে মনে হয় দূরে যেন কে ছুটে পলাচ্চে। হঠাৎ বাতাসে একটা দরজা পড়ল মনে হল সেটা যেন সমস্ত আকাশের বুক ধড়াস্‌ করে ওঠার শব্দ।

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারের কালো গাছের সারের নীচে দিয়ে আলো দেখ্‌তে পাই তার পরে আর দেখ্‌তে পাইনে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনি, তরাপরে দেখি ঘোড়সোয়ার রাজবাড়ির গেট থেকেই বেরিয়ে ছুটে চল্‌চে।

কেবলি মনে হতে লাগ্‌ল আমি মরলেই সব বিপদ কেটে যাবে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি সংসারকে আমার পাপ নানা-দিক থেকে মারতে থাকবে। মনে পড়ল সেই পিস্তলটা বাক্সের

মধ্যে আছে। কিন্তু এই পথের ধারের জানলা ছেড়ে পিস্তল নিতে যেতে পা সরল না, আমি যে আমার ভাগ্যের প্রতীক্ষা করচি।

রাজবাড়ির দেউড়ির ঘণ্টায় ঢং ঢং করে দশটা বাজল।

তার খানিক পরে দেখি রাস্তায় অনেকগুলি আলো অনেক ভিড়। অন্ধকারে সমস্ত জনতা এক হয়ে জুড়ে গিয়ে মনে হল একটা প্রকাণ্ড কালো অজগর এঁকেবেঁকে রাজবাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকতে আস্‌চে।

দেওয়ানজি দূরে লোকের শব্দ শুনে গেটের কাছে ছুটে গেলেন। সেই সময় একজন সওয়ার এসে পৌঁছতেই দেওয়ানজি ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, জটাধর, খবর কি?

সে বল্লে, খবর ভালো নয়।

প্রত্যেক কথা উপর থেকে স্পষ্ট শুন্‌তে পেলুম।

তার পরে কি চুপি চুপি বল্লে, শোনা গেল না।

তার পরে একটা পাল্কী আর তারই পিছনে একটা ডুলি ফটকের মধ্যে ঢুক্‌ল। পাল্কীর পাশে পাশে মথুর ডাক্তার আস্‌ছিলেন। দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবু কি মনে করেন?

ডাক্তার বল্লেন, কিছু বলা যায় না। মাথায় বিষম চোট লেগেছে।

আর অমূল্যবাবু?

তাঁর বুকে গুলি লেগেছিল—তাঁর হয়ে গেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাপ্ত

চেয়ে দেখা

এইক্ষণে
মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়নবাতায়নে
যে-তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত আলোতে
সে তোমার দৃষ্টি যেন নানা দিন নানা রাত্রি হতে
রহিয়া রহিয়া
চিত্তে মোর আনিছে বহিয়া
নীলিমার অপার সঙ্গীত,
নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিত।

আজি মনে হয় বারেবারে
যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে
দেখিয়াছি কত দেখা
কত যুগে, কত লোকে, কত চোখে, কত জনতায়, কত একা।
সেই সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে
ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে,
বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতার ঝলক-ঝিকিমিকে।

কত নব নব অবগুণ্ঠনের তলে
দেখিয়াছ কত ছলে
চুপে চুপে
এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে
জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলি-লগনে।
তাই আজি নিখিল গগনে
অনাদি মিলন তব অনন্ত বিরহ
এক পূর্ণ বেদনায় ঝঙ্কারি উঠিছে অহরহ।

তাই যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভীড়।
তাই আজি দক্ষিণ পবনে
ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

শিলাইদা — শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭ই ফাল্গুন ১৩২২।

আর্য্যসভ্যতার সহিত বঙ্গ-সভ্যতার যোগাযোগ

ভারতবর্ষের উত্তরাপথের প্রাচীনসভ্যতা মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ যে আর্য্যসভ্যতা আমি আমার পূর্ব্ব-প্রবন্ধে তাই প্রমাণ করবার চেষ্ট করেছি। এবং এ কথাও সর্ব্বলোকবিদিত যে, আমরা নিজেদের সেই সভ্যতার উত্তরাধিকারী-স্বরূপে গণ্য মান্য এবং ধন্য মনে করি। আমাদের বল-বুদ্ধি-ভরসা সব ঐ আর্য্য-শব্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমরা কি-অর্থে এবং কি-পরিমাণে আর্য্যধর্ম্মী, সে বিষয়ে আমাদের মনে একটি যথাসম্ভব স্পষ্ট ধারণা থাকা, আমি বাঙ্গালীর পক্ষে শ্রেয়স্কর মনে করি। আর্য্য এবং বাহ্যধর্ম্মসকলের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার অনধিকার-চর্চ্চা কর্‌বার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের স্বধর্ম্মের উৎপত্তির নির্ণয় করা।

বাঙ্গালীজাতি আর্য্যজাতি কি না, তাই নিয়ে দেখ্‌তে পাই পণ্ডিতে পণ্ডিতে মহা মতভেদ আছে। আমরা আর্য্যবংশীয় কিনা সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে এবং সে সন্দেহের বৈধ কারণও আছে। কি প্রাচীন শাস্ত্রমতে কি অর্ব্বাচীন বৈজ্ঞানিক মতে বাঙ্গালী যে আর্য্যজাতি বলে গণ্য নয়—এ-কথা সকলেই জানেন। শাস্ত্রমতে এক দ্বিজব্যতীত অপর-কেউ বংশমর্য্যাদা হিসেবে আর্য্যত্বের দাবী কর্‌তে পারেন না—এবং বাঙ্গালীজাতির মধ্যে দ্বিজের সংখ্যা যে কত অল্প তা বিশ্বসুদ্ধ লোক জানে। অপর পক্ষে ethnologists-দের মতে হাজারে ন-শ-নিরনব্বই জন বাঙ্গালী দ্রবিড়-মোগল-বংশীয়। কিন্তু এর থেকে বাঙ্গালীর

আর্য্যত্ব অপ্রমাণ হয় না। কেননা নৃতত্ত্ববিদেরা অদ্যাবধি এমন কোনও মাপকাঠি নির্ম্মাণ করতে পারেন নি যার সাহায্যে কোনও জাতির বংশনির্ণয় করা যেতে পারে। অপরপক্ষে ভাষার প্রমাণ যদি গ্রাহ্য হয় তাহলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বাঙ্গালীজাতি মূলতঃ আর্য্যজাতি। বাঙ্গলাভাষা যে আর্য্যভাষা এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। বর্ত্তমান বাঙ্গালীজাতির যে অনার্য্যদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে এ সত্য অস্বীকার করা যায় না—এবং তা অস্বীকার করবার কোনও আবশ্যকতা নেই। কেননা ভারতবর্ষে এমন কোনও জাতি নেই—যাদের শিরায় অনার্য্য রক্তের লেশমাত্রও নেই। একালের দ্বিজমাত্রেই যে খাঁটি আর্য্য এবং অ-দ্বিজ মাত্রেই যে খাঁটি অনার্য্য এরূপ বিশ্বাসের মূলে কোনও বৈধ কারণ নেই। পুরাকালে বহু আর্য্য যে দ্বিজত্ব-ভ্রষ্ট হয়েছিলেন এবং বহু অনার্য্য যে দ্বিজত্ব-লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সত্য কথা এই যে, আমরা ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা সামাজিক হিসেবে যে-যাই হই, শারীরিক হিসেবে সবাই বর্ণসঙ্কর।

এ সত্ত্বেও আমরা যে আর্য্যসভ্যতার যথার্থ উত্তরাধিকারী এবং আমাদের স্বধর্ম্ম যে আর্য্যধর্ম্ম এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। সভ্যতা হচ্ছে মনের বস্তু। সুতরাং এ কথা যদি সত্যও হয় যে, প্রাচীন আর্য্যদের সঙ্গে বাঙ্গালীর রক্তের সম্পর্ক এক পাই, তাহলেও আর্য্যসভ্যতার সঙ্গে বাঙ্গালী-হিন্দুর মনের সম্পর্ক পোনোরো-আনা-তিন-পাই। অতএব আমাদের পক্ষে আর্য্যত্বের দাবী করা অসঙ্গত নয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে জাতীয় মানবই হ'ন তাঁরা আর্য্যভাষা আর্য্যধর্ম্ম আর্য্যআচার এবং আর্য্যজ্ঞানের অধীনতা

স্বীকার করেছিলেন। সুতরাং আমরা দেহে না হলেও মনে আর্য্যজাতির বংশধর। এ সত্যের উপর কোনও ethnologist হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

আমরা আর্য্যসভ্যতার উত্তরাধিকারী একথা সত্য হলেও উক্ত সত্বে আমরা যা লাভ করেছি তার মূল্য কত তাও একটু যাচিয়ে দেখা দরকার। আর্য্যসভ্যতা ভারতবর্ষে 'ফেল্' করেছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সমগ্র ভারতবর্ষে একটি ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করতে পরেন নি—Legal হিসাবেও নয়, spiritual হিসেবেও নয়। এক মোটামুটি শীলগত ঐক্যছাড়া তাঁরা অপর কোনও বিষয়ে ভারতবাসীদের ঐক্যসাধন করতে পারেন নি। বৈদিক orthodoxyর সঙ্গে বাহ্য heresyর সংঘর্ষের ফলে, এদেশে কোনও একটি গোটা আর্য্যধর্ম্ম গড়ে ওঠে নি;—নানা খণ্ড বিখণ্ডে তা বিভক্ত হয়ে পড়েছে, এবং সেই সকল খণ্ডধর্ম্ম অনার্য্য আচার, অনার্য্য মনোভাবকে নিজের অন্তর্ভূত করে নিতে বাধ্য হয়েছে। এককথায় ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার evolution নয় dissolutionএর দায় আমাদের উপরে এসে বর্ত্তেছে। আমরা যা পেয়েছি তা পূর্ণ সভ্যতা নয়—চূর্ণ সভ্যতা। ভারতবাসী এখন অগণ্য সম্প্রদায়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে এবং আচারে বিচারে এইসকল খণ্ডসমাজ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন। ফলে কে যে হিন্দু তা আমরা জানি, অথচ হিন্দুত্বের সামান্য লক্ষণ এবং ধর্ম্ম যে কি তা কেউ বলতে পারেন না। অর্থাৎ ইংরাজি লজিকের ভাষায় বলতে হলে, হিন্দু শব্দের denotation আছে connotation নেই। এই অনৈক্যের মধ্যে কোথায়ও একটা ঐক্য আবিষ্কার করবার আকাঙ্ক্ষাও আমা-

দের পক্ষে স্বাভাবিক। এই প্রবৃত্তিবশতঃ, যে-ঐক্য বর্ত্তমানে নেই সেই-ঐক্য আমরা ভারতবর্ষের অতীতে অনুসন্ধান করি। কিন্তু এ অনুসন্ধান নিষ্ফল; কেননা সেকালেও ভারতবাসীরা আর্য্যে অনার্য্যে জড়িয়ে একটি বিরাটপুরুষ হয়ে উঠতে পারেন নি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে এদেশে অতীতে শান্তি ছিল না; যা ছিল তা হচ্ছে লড়াই। দেশে দেশে রাজায় রাজায় জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যুগে যুগে যে শুধু লড়াই চলেছিল, প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রশাসন, প্রশস্তি প্রভৃতি একবাক্যে এই-কথারই সাক্ষ্য দেয়। সেকালে বাহুবল বলো বুদ্ধিবল বলো সকলই পরস্পরের হিংসার কার্য্যে অপব্যয় করা হয়েছে। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"—এ-কথা হচ্ছে ভারতবর্ষের পীড়িত ব্যথিত হৃদয়ের কাতরোক্তি। কিন্তু এ কথার উপর একটি জাতীয় সভ্যতা গড়ে তোলা যায় না—কেননা এ শুধু নিষেধ বাক্য। বিশ্বের অন্তরে একটি অনাদি অনন্ত "হাঁ"র চেহারা না দেখলে মানুষ বাড়া দূরে থাক বাঁচতেও পারে না। সুতরাং বৈদিকধর্ম্মের সঙ্কীর্ণভাব প্রতিবাদস্বরূপে বৌদ্ধ জৈন চার্ব্বাক প্রভৃতি মতের সার্থকতা আছে—কিন্তু জাতীয় জীবন গঠনের শক্তিতে তা বঞ্চিত; কেননা ও-সকল ধর্ম্ম বিশ্বের অন্তরে শুধু একটি অনাদি অনন্ত "না"র মূর্ত্তি দেখতে পায়। নাস্তিকতা শূন্যবাদ স্যাৎবাদ প্রভৃতি, heresy হিসেবেই, মানব-সমাজের দেহ ও মনের পক্ষে বলকারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। কিন্তু ভারতবর্ষের কপালের দোষে তার এমন দিনও গিয়েছে যখন এই ঔষধই তার পথ্য হয়ে উঠেছিল।

সে যাই হোক্, জাতীয়সভ্যতা গঠন কর্‌বার শক্তি একমাত্র বৈদিকধর্ম্মেই ছিল, কেননা—সেধর্ম্ম পূর্ণাবয়ব এবং রাজসিক। Religion, Morality এবং Law বৈদিকধর্ম্মে এ-তিনের কোনটিই উপেক্ষিত হয় নি। এ ধর্ম্ম-মতে ব্যক্তি এবং সমাজ, ইহলোক এবং পরলোক পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষে এক-ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করবার ক্ষমতা একমাত্র এই ধর্ম্মেরই ছিল। তবে যে, বৈদিক-আর্য্যেরা আর্য্যসভ্যতার ঐক্যস্থাপন করতে অক্ষম হয়েছিলেন, তার একটি কারণ, তাঁদের আভিজাত্যের অহঙ্কার; আর-একটি—তাঁদের জাতি-বিরোধ। ভারতবর্ষের মানসিক-রাজ্যেও কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে। কি দৈহিক কি মানসিক উভয় বলেই আর্য্যেরা অনার্য্যদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং অনার্য্যদের উপর নিজেদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভুত্বস্থাপন করা এঁদের পক্ষে অতি সহজ ছিল। এর ফলে সাংসারিক এবং মানসিক—এ উভয়ক্ষেত্রেই একাধিপত্য কর্‌বার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর এঁদের মনে এত প্রাধান্য লাভ করেছিল যে, কোনরূপ বাহ্যআচার কিম্বা বাহ্যমতের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করা এঁদের ধাতে ছিল না। বৈদিক-ধর্ম্ম দ্বিজ-সর্ব্বস্ব এবং ব্রাহ্মণ-প্রধান। ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রের ত কথাই নেই, বেদান্তের জ্ঞানেও শূদ্রের অধিকার নেই। এ ধর্ম্মের সঙ্গে বাহ্য-ধর্ম্মসকলের সর্ব্বপ্রধান প্রভেদ এই যে, সে-সকল ধর্ম্মে ব্রাহ্মণের স্থান নেই এবং তাতে শূদ্র যবন সকলেরি অধিকার ছিল। সুতরাং বেদধর্ম্ম এবং বাহ্যধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের ঘোর শত্রু হয়ে উঠে-ছিল। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে এই দুই শত্রুপক্ষের যুগ-

যুগান্তরের লড়ালড়িই ভারতবর্ষে আর্য্যসভ্যতার অধঃপতনের প্রথম কারণ।

তার পর, এই বৈদিক-ধর্ম্মের অন্তরেও এমন বিরোধ ছিল যে, তার সমন্বয় ক'রে তাকে এক-ধর্ম্মে পরিণত করাও সেকালে সম্ভবপর হয়নি। এই বিরোধের কারণ এই যে, এ ধর্ম্ম অপৌরুষেয়; অর্থাৎ নানান মুনির নানান মতের নামই শ্রুতি। কোনও বিশেষ পুরুষকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে মতের ঐক্য থাকে, কেননা তা এক ব্যক্তিরই মত। প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ-ধর্ম্মে কর্ম্ম এবং জ্ঞান পরস্পর পৃথক হয়ে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গ অবলম্বন করলে। আত্মা গমন করলেন অরণ্যে—আর দেহ পড়ে থাকল গৃহে। এর ফলে জীবন আত্মা-হীন এবং আত্মা নির্জ্জীব হয়ে পড়ল। দেহ ও আত্মা একবার পৃথক হয়ে গেলে তাদের পুনর্ব্বার সমন্বয় করা মানুষের সাধ্যের অতীত। বেদপন্থীরা এই অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা কখনও করেন নি। বরং তাঁরা নিজের নিজের কোট্ বজায় রাখবার জন্য নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতের মীমাংসা করতেই ব্যস্ত ছিলেন। এ মীমাংসার উদ্দেশ্য স্বপক্ষের বিরোধের সমন্বয় করা। কর্ম্ম এবং জ্ঞান এ উভয় কাণ্ডেই নেতি নেতি করে মীমাংসা করে হয়েছিল। ফলে ইতি দাঁড়াল এই যে—ব্রহ্মবাদ শূন্যবাদের কোঠায় এবং মন্ত্রাত্মক দেবতাবাদ নাস্তিকতার কোঠায় গিয়ে পড়ল; অর্থাৎ একদিকে থাকল—ভক্তিহীন ক্রিয়াহীন জ্ঞান, আর-একদিকে থাকল—জ্ঞানহীন ভক্তিহীন ক্রিয়া। এ জ্ঞান এবং এ ক্রিয়া দুইই চলৎ-শক্তি-রহিত; কেননা এর ভিতর ভক্তি নেই অর্থাৎ মানব হৃদয় নেই, অতএব রক্তের চলাচল নেই। এই

হচ্ছে ভারতবর্ষের আর্য্যসভ্যতার গতি স্থগিত হয়ে যাবার অপর কারণ।

সুতরাং আমরা উত্তরাধিকারী-সত্বে যা লাভ করেছি তা হচ্ছে আর্য্যসভ্যতার ভাঙ্গা ঘর। সেই ঘরে কায়-ক্লেশে মনের সুখে বাস করাতে আর্য্য-মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হয় না। আমরা যদি বৈদিক আর্য্যদের আত্মার উত্তরাধিকারী হতুম তাহলে সভ্যতার যে-ঘর মাথা-ভারি হওয়ার দরুন, অর্দ্ধেক না উঠতেই ভেঙ্গে পড়েছে সেই-ঘর আবার গড়ে তুলতে চেষ্টা করতুম, এবং তার জন্য দরকার, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের জীবনে সমন্বয় করা,—দর্শনে না। মীমাংসা-দর্শনের পথ সব চোরাগলি, তার ভিতর একবার প্রবেশ করলে, মীমাংসকেরা যেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তার থেকে এক-পাও বেশি অগ্রসর হবার যো নেই,—জীবনে ফিরে আসবারও কোনও উপায় নেই। বৈদিক এবং বাহ্যধর্ম্ম-সকলের সমন্বয় খালি এক ক্ষেত্রে হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রের ইংরাজি নাম Metaphysical nihilism.

আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মসকলের নবীন-সমন্বয়কারীরা আশা করি এই কথাটি মনে রাখবেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কন্‌গ্রেসের আইডিয়াল্‌

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই বন্দরে কন্‌গ্রেসের জন্ম হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে তা সাবালক হয়। তার পর-বৎসর সুরাট নগরীতে তার মৃত্যু হয়। এ বৎসর আবার তার জন্মস্থানে তার পুনর্জ্জন্ম হয়েছে।

এবার কিন্তু কন্‌গ্রেসের ধড়ে প্রাণ আসে নি, তার প্রাণে ধড় এসেছে। সকলেই জানেন, সুরাটে কন্‌গ্রেসের মৃত্যু হয়নি, তার অপমৃত্যু ঘটেছিল, আর সে যেমন-তেমন অপমৃত্যু নয়—একসঙ্গে খুন এবং আত্মহত্যা। এদেশে কারও অপমৃত্যু ঘটলে তার আত্মার ততদিন সদ্গতি হয় না যতদিন-না তা আবার একটি নূতন দেহে প্রবেশ লাভ করতে পারে। কন্‌গ্রেসের সূক্ষ্ম শরীর তাই এ-কয়-বৎসর একটি স্থূল শরীরের তল্লাসে এদেশে ওদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অতঃপর বোম্বাই-ধামে তা লাভ করেছে। গত কন্‌গ্রেসে বিশ-হাজার লোক জমায়েৎ হয়েছিল।

কন্‌গ্রেসওয়ালাদের মতে কিন্তু কন্‌গ্রেসের কস্মিনকালেও মৃত্যু হয়নি। সুরাটে শুধু স্বরাট পাগল হয়ে কন্‌গ্রেসকে জখম করে, নিজে করেছিলেন আত্মহত্যা। তার পর, যেহেতু সে স্বরাট কন্‌গ্রেসেই জন্মলাভ করেছিল, সেই জন্য তার ভূত তার জন্মদাতার স্কন্ধে ভর-করবার চেষ্টায় ফিরছিল। সেই ভূতের ভয়ে কন্‌গ্রেস

এতদিন ঘরের দুয়োর বন্ধ করে বসেছিল। এই বন্ধ ঘরের দূষিত বায়ুতেই তার শরীর কাহিল হয়ে গিয়েছিল। অথচ কন্‌গ্রেস এই ভূতের উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনও উপায় বার করতে পারে নি। এবার নব মন্ত্রের বলে স্বরাটের ভূত—ভবিষ্যৎ হয়ে গেছে। তাই কন্‌গ্রেসের দেহটি আবার নাদুস্‌নুদুস্‌ হয়ে উঠেছে। এককথায় কন্‌গ্রেস এবার বেঁচে ওঠে নি—বেঁচে গিয়েছে।

সে যাই হো'ক। কন্‌গ্রেসের এবার ভোল ফিরেছে এবং সেই সঙ্গে তার বোল ফিরেছে। এতদিন কন্‌গ্রেস ছিল বড়দিনের দুর্গোৎসব। তিনদিন ধরে "ধনং দেহি মানং দেহি" বলে দুসন্ধ্যা ইংরাজিতে মন্ত্র আওড়ান এবং সেই উপলক্ষ্যে খানাপিনা নাচ-তামাসা আমোদ-আহ্লাদ এবং তার পরে বিসর্জ্জন এবং তার পরে কন্‌গ্রেসওয়ালাদের পরস্পর কোলাকুলি করে, গৃহাভিমুখে যাত্রা—এই ছিল কন্‌গ্রেসের হাল ও চাল।

ভবিষ্যতে শুন্‌ছি কন্‌গ্রেসের সপ্তমী অষ্টমী নবমী থাক্‌বে কিন্তু দশমীতেই সব শেষ হবে না। তার পর বারোমাস ধরে কন্‌গ্রেস তার স্বধর্ম্ম প্রচার করবে। অর্থাৎ কন্‌গ্রেস এবার জাতীয়-রাজনৈতিক-শিক্ষা-পরিষদে পরিণত হল। কন্‌গ্রেসের এ সংকল্প অতি সাধু-সংকল্প সন্দেহ নেই—কিন্তু যে বিষয়ে সন্দেহ আছে তা হচ্ছে এই যে, এ সংকল্প কার্য্যে পরিণত হবে কি না।

প্রথমতঃ রাজনীতি বল্‌তে যা বোঝায় তা দেশসুদ্ধ লোককে

বোঝানো কঠিন। ও-পদার্থ আমরা ইউরোপ থেকে আমদানি করেছি। সে দেশে একালে ও-বস্তু হচ্ছে তাই, যার ভিতর একদিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে রাজাও নেই নীতিও নেই; আবার আর-একদিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে ও-দুইই আছে। এই দুটো দিক যাতে একসঙ্গে চোখে পড়ে এমন-করে দেশের চোখ-ফোটানোর জন্য যে জ্ঞানাঞ্জন শলাকার আবশ্যক, তা দেশী-ভাষা নয়। ব্রহ্ম যে একাধারে সগুণ এবং নির্গুণ এ সত্য বোঝাতে হলে যেমন সংস্কৃত ভাষার সাহায্য চাই, তেমনি রাজনীতি যে একসঙ্গে রাজমন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র হতে পারে এ সত্য বোঝাতে হলে ইংরাজির সাহায্য চাই।

কন্‌গ্রেস অবশ্য এতে পিছপাও হবে না। কেননা কন্‌গ্রেসের পাণ্ডারা ঐ এক ইংরাজি ভাষাই জানেন এবং ঐ এক ইংরাজি ভাষাই মানেন। তবে তাঁদের কথা বোঝে এমন লোক দেশে ক'টি? অতএব তাঁরা যদি দেশকে রাজনৈতিক-শিক্ষা দিতে বসেন ত ফলে দাঁড়াবে এই যে, কন্‌গ্রেসওয়ালারাই পালা করে পরস্পর পরস্পরের গুরু শিষ্য হবেন। সুতরাং যতদিন না ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি লোক ইংরাজি-শিক্ষিত হয়ে ওঠে, ততদিন এই রাজনৈতিক-শিক্ষার কার্য্যটা মুলতবি রাখাই কর্ত্তব্য। সে শিক্ষা যে শুধু নিষ্ফল হবে তাই নয়, তার কুফলও হতে পারে। শিক্ষা দিতে গিয়ে হয় ত কন্‌গ্রেসকে দুদিন পরে দেশের লোককে বল্‌তে হবে—"উল্টা বুঝিলি রাম!" এ বিপদ যে আছে তার প্রমাণও আছে। আর এরূপ উল্টা বোঝাটা রামের পক্ষে আরামের

নয়। এবং সে অবস্থায় কন্‌গ্রেসের পক্ষে তাকে ভ্যাবাগঙ্গারাম বলাটাও সঙ্গত নয়।

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় রাজনৈতিক-শিক্ষার জন্য একটা জাতীয় রাজনৈতিক-আদর্শ থাকা আবশ্যক। একটা আইডিয়াল্‌ যে থাকা চাই-ই চাই এ কথা কন্‌গ্রেসও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। এস্থলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কন্‌গ্রেস কি আজও তেমন কোন রাজনৈতিক-আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন? তাহলে কন্‌গ্রেস-ওয়ালারা উচ্চকণ্ঠে উত্তর দেবেন—অবশ্য পেয়েছি। এবং সে আদর্শের নাম হচ্ছে—"সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য।"

নিত্য দেখ্‌তে পাই যে, একদলের মতে ভারতবর্ষে স্বরাজকতার অর্থ হচ্ছে অরাজকতা, আর-একদলের মতে অরাজকতার অর্থই হচ্ছে স্বরাজকতা। এই দুটি হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক গগনের শুক্ল আর কৃষ্ণ পক্ষ। কন্‌গ্রেস অবশ্য এই দুই মতই সমান অগ্রাহ্য করেন; কেননা এই দুয়ের মধ্যস্থ দল হচ্ছে কন্‌গ্রেস। এ মতে শুদ্ধ-স্বরাজ্য সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ হতে পারে কিন্তু "সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য" সম্বন্ধে হতে পারে না। কেননা সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য যে খাপ খাওয়ানো যেতে পারে তার উদাহরণ ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া সাউথ-আফ্রিকা প্রভৃতি। সুতরাং যার এত নজির আছে সেই আদর্শের পক্ষে ওকালতি করায় বাধা নেই; অতএব এ আদর্শ বিদ্যাসঙ্গতও বটে বুদ্ধিসঙ্গতও বটে; কেননা যদি বর্ত্তমানের উপাদান নিয়ে ভবিষ্যতের মূর্ত্তি গড়্‌তে হয়

তাহলে এ-ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ হতে পারে না। তবে এই আদর্শকে বিপক্ষ-পক্ষ হেসে এই প্রশ্ন করেন যে—

"তুমি কোন গগনের ফুল ?
তুমি কোন বামনের চাঁদ ?"

এর উত্তরে স্বয়ং প্রশ্নকর্ত্তাই বলেন যে, এ আদর্শ ইংরাজি-শিক্ষিত ভারতবর্ষের চিদ্-আকাশের ফুল এবং ইংরাজি-শিক্ষিত ভারত-বর্ষের অমাবস্যার চাঁদ।

এ কথা শুনে কন্‌গ্রেস বলেন, এ ভবিষ্যতের আদর্শ এবং সে ভবিষ্যৎও এত দূর-ভবিষ্যৎ যে, বর্ত্তমানের ধূলো যাঁদের চোখে ঢুকেছে সেই সকল অন্ধলোকেই এর সাক্ষাৎ পান না বলে, এর অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন না। এ আদর্শ ভারতবর্ষের কল্পনার ধন। এ ত হাতে নাগাল পাবার জিনিষ নয়—মনশ্চক্ষে দূরবীন্ কশে এ আদর্শ দেখ্‌তে হয়। কন্‌গ্রেসের সকল বাণীই যে ভবিষ্যদ্বাণী, এ জ্ঞান থাক্‌লে বিপক্ষ-পক্ষ কন্‌গ্রেসের কথা শুনে আর হাস্‌ত না।

ভবিষ্যতে কি হতে পারে আর না হতে পারে সে বিষয়ে ত্রিকালজ্ঞ স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কেউ কিছু বল্‌তে পারেন না। সুতরাং দূর-ভবিষ্যতে যে ঐ আদর্শ চাঁদ ভারতবাসীর হাতে আসবে না এবং তাদের মাথায় ঐ আকাশকুসুমের পুষ্পবৃষ্টি হবে না একথা জোর করে কে বল্‌তে পারে! তবে এখন ঐ চাঁদকে ডেকে "আয় আয় আমাদের মাথায় টী দিয়ে যা"—আর ঐ

আকাশকুসুমকে ডেকে—"যেখানে আছ সেখানেই থাকো, দেখো যেন ঝরে আমাদের গায়ে পড়ো না"—একথা বলা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। কেননা বেশি আলোয় আমাদের চোখ ঝলসে যায় আর আমরা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাই।

তবে কথা হচ্ছে এই যে, বর্ত্তমানকে আমরা একেবারেই উপেক্ষা করতে পারি নে, কেননা এ পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যা সম্বন্ধ তা বর্ত্তমানেরই সম্বন্ধ। "চোখ বুঁজলেই অন্ধকার"—এ প্রবাদ ত সকলেই জানেন। সুতরাং আমাদের খোলাচোখের জন্যও একটা আদর্শ থাকা দরকার। আমরা চাই সেই ফুল যার দ্বারা মার নিত্যপূজা চল্‌বে আর সেই চাঁদ যার আলোতে আমরা রাত্তিরে পথ দেখ্‌তে পাব। বলা বাহুল্য যে, এদেশে এখন রাত্তির, আর আমরা জাতকে-জাত রাত-কানা।

অতএব কন্‌গ্রেসের পক্ষে জাতীয়-রাজনৈতিক-শিক্ষা-পরিষৎ হবার পূর্ব্বে জাতীয়-রাজনৈতিক-আদর্শ-অনুসন্ধান-সমিতি হওয়া কর্ত্তব্য।

ইতিমধ্যে আমি একটি আটপৌরে আদর্শ দেশের হাতে ধরে দিতে চাই। আমার কথা এই—এস আমরা ঘরে বসে নিজের নিজের চরকায় বিলেতি তেল দেই, তাহলেই সকলে মিলে ভারতমাতার চর্‌কায় স্বদেশী তেল দেওয়া হবে, এবং তাতে মা আমাদের যে কাটনা কাটবেন তার সূতো মাকড়সার সূতোর চাইতেও সূক্ষ্ম হবে—এবং সেই সূতোর জাল বুনে সেই ফাঁদে আমরা আকাশের চাঁদ ধরব।

বীরবল।

মধ্যাহ্নে

তোমাতে আমাতে দেখা শুভ শুভ্রক্ষণে,—
নিভৃত মধ্যাহ্নসুপ্ত নিঝুম ভুবনে।
অলস হৃদয়ে জাগে রূপের স্বপন,—
আঁখি খুলে দেখি তব মধুর আনন—
ধ্যান-অবসানে যথা ভক্তের নয়নে
আবির্ভূত দেব-মূর্ত্তি উন্মদ কিরণে!
কথা কও—আঁখি সনে জুড়াক্ শ্রবণ,—
—মধুবাণী তিক্তবাণী যাহা চাহে মন।
রূপসীর তিরস্কার প্রাণে মিষ্ট বাজে,
মধু-মুখ রাঙা ঠোঁটে ঠোঁট-নাড়া সাজে!
হাসিতেছ! কর-পদ্ম দাও মম করে,
বসন্ত জাগ্রত—ছায়া সুপ্ত পথ পরে।
স্নিগ্ধ বায়ু, চল যথা ছায়া তরুতলে
আস্তীর্ণ শ্যামল শয্যা কাননের কোলে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

সবুজ পত্র

ছাত্রশাসন তন্ত্র

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের সহিত কোনো কোনো য়ুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা লইয়া কোনো কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি। তার একটা কারণ, ব্যাপারটা দেখিতেও ভাল হয় নাই, শুনিতেও ভাল নয়, আর একটা কারণ, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কটার মধ্যে যেখানে কিছু ব্যথা আছে সেখানে নাড়া দিতে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু কথাটাকে চাপা দিলে চলিবে না। চাপা থাকেও নাই—বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনে-মনে বা কানে-কানে বা মুখে-মুখে সকলেই এর বিচার করিতেছে।

বিকৃতি ভিতরে জমিতে থাকিলে একদিন সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। লাল হইয়া শেষকালে ফাটিয়া পড়ে। তখনকার মত সেটা সুদৃশ্য নয়।

বাহিরে ফুটিয়া পড়াটাকেই দোষ দেওয়া বিশ্ববিধানকে দোষ দেওয়া—এমনতর অপবাদে বিশ্ববিধাতা কান দেন না। ভিতরে ভিতরে জমিতে দেওয়া লইয়াই আমাদের নালিশ চলে।

যাক্, বাহির যখন হইয়াছেই তখন বিচার করিয়া কোনো একটা জায়গায় শাস্তি না দিলে নয়। এইটেই সঙ্কটের সময়। জিনিসটা ভদ্ররকমের নহে এটা ঠিক। ইহার আক্রোশটা প্রকাশ করিব কার উপরে? প্রায় দেখা যায় সহজে যার উপরে জোর খাটে শাসনের ধাক্কাটা তারই উপরে পড়ে। ঘরের গৃহিণী যেখানে বৌকে মারিতে ভয় পায় সেখানে ঝিকে মারিয়া কর্ত্তব্য পালন করে।

বিচারসভা বসিয়াছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনো মিশনারি কলেজের কর্ত্তা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবদার প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা শুনিতেও হঠাৎ সঙ্গত বোধ হয়। কারণ, ছাত্রেরা অধ্যাপকদের অসম্মান করিলে সেটা যে কেবল অপরাধ হয় তাহা নহে সেটা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা যাইবে এটা মানবপ্রকৃতির ধর্ম্ম। তাহার উল্টা দেখিলে বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির প্রতিকার করিতে হইবে সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু প্রতিকারের প্রণালী স্থির করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা চাই স্বভাব ওলটায় কিসে।

কাগজে দেখিতে পাই অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, যে-ভারতবর্ষে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধ সেখানে এমনতর ঘটনা বিশেষভাবে গর্হিত। শুধু গর্হিত এ কথা বলিয়া পার পাইব না, চিরকালীন এই সংস্কার অস্থিমজ্জার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও

ব্যবহারে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে কেন এর একটা সত্য উত্তর বাহির করিতে হইবে।

বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটি খাপছাড়া খেয়াল একথা মানি না। ছেলেরা যে-বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে সুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার তর্ক করিবার বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্ম্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানব-সংস্রবের জোর তার পরে যতটা খাটে এমন আর কোনো সময়েই নয়।

এই বয়সটাই মানুষের জীবন মানুষের সঙ্গপ্রভাবেই গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সকলের চেয়ে অনুকূল, স্বভাবের এই সত্যটিকে সকল দেশের লোকেই মানিয়া লইয়াছে। এই জন্যই আমাদের দেশে বলে "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ"—তার মানে, এই বয়সেই ছেলে যেন বাপকে পুরাপুরি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারে শাসনের কল বলিয়া নহে—কেননা, মানুষ হইবার পক্ষে মানুষের সংস্রব এই বয়সেই দরকার। এই জন্যই সকল দেশেই য়ুনিভর্সিটিতে ছাত্ররা এমন একটুখানি সম্মানের পদ পাইয়া থাকে যাহাতে অধ্যাপকদের বিশেষ কাছে তারা আসিতে পারে এবং সেই সুযোগে তাদের জীবনের পরে মানব-সংস্রবের হাত

পড়িতে পায়। এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলিকে আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে—এই কাজটি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই। সেই জন্যই এই বয়সে আত্মসম্মানের সম্বন্ধে দরদ বড় বেশি হয়। চিবাইয়া খাইবার বয়স আসিলে বেশ একটু জানান্ দিয়া দাঁত ওঠে তেমনি মনুষ্যত্বলাভের যখন বয়স আসে তখন আত্মসম্মানবোধটা একটু ঘটা করিয়াই দেখা দেয়।

এই বয়ঃসন্ধির কালে ছাত্ররা মাঝে মাঝে এক-একটা হাঙ্গাম বাধাইয়া বসে। যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেখানে এই সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মত ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়—কেননা তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া উঠে।

বিধাতার নিয়ম অনুসারে বাঙালী ছাত্রদেরও এই বয়ঃসন্ধির কাল আসে, তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন একদিকে আত্মশক্তির অভিমুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায় তেমনি আর একদিকে যেখানে তারা কোনো মহত্ত্ব দেখে, যেখান হইতে তারা শ্রদ্ধা পায়, জ্ঞান পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায় সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। মিশনরি কলেজের বিধাতাপুরুষের বিধানে ঠিক এই বয়সেই তাহাদিগকে শাসনে পেষণে দলনে দমনে নির্জ্জীব জড়পিণ্ড করিয়া তুলিবার জাঁতাকল বানাইয়া তোলা জগদ্বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা।

জেলখানার কয়েদী নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিতে কারো বাধে না কেননা তাকে অপরাধী বলিয়াই

দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়। অপমানের কঠোরতায় মানুষের মনে কড়া পড়িয়া তাকে কেবলি অমানুষ করিতে থাকে সে হিসাবটা কেহ করিতে চায় না—কেননা, মানুষের দিক দিয়া তাকে হিসাব করাই হয় না। এইজন্য জেলখানার সর্দ্দারি যে করে সে, মানুষকে নয়, অপরাধীকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখে।

সৈন্যদলকে তৈরি করিয়া তুলিবার ভার যে লইয়াছে সে মানুষকে একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখিতে বাধ্য। লড়াইয়ের নিখুঁত কল বানাইবার ফরমাস তার উপরে। সুতরাং সেই কলের হিসাবে যে কিছু ত্রুটি সেইটে সে একান্ত করিয়া দেখে এবং নির্ম্মমভাবে সংশোধন করে।

কিন্তু ছাত্রকে জেলের কয়েদী বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা ত মনে ভাবিতে পারি না। আমরা জানি তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড় বিচিত্র করিয়া গড়া। এই জন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সারানো যায় না—অনেক দিক বাঁচাইয়া প্রকৃতির সাধ্যসাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয়। এমন লোকও আছে এ সম্বন্ধে যারা বিজ্ঞানকে খুবই সহজ করিয়া আনিয়াছে—তারা সকল ব্যাধিরই একটিমাত্র কারণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সে হচ্চে ভূতে পাওয়া। এবং তারা মিশনারি কলেজের ওঝাটির মত ব্যাধির ভূতকে মারিয়া ঝাড়িয়া গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়া চীৎকার করিয়া তাড়াইতে চায়। তাহাতে ব্যাধি যায় এবং প্রাণপদার্থের প্রায় পনেরো আনা তার অনুসরণ করে।

এ হইল আনাড়ির চিকিৎসা। যারা বিচক্ষণ তারা ব্যাধিটাকেই

স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না; চিকিৎসার সময় তারা মানুষের সমস্ত ধাতটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে; মানব প্রকৃতির জটিলতা ও সূক্ষ্মতাকে তারা মানিয়া লয় এবং বিশেষ কোনো ব্যাধিকে শাসন করিতে গিয়া সমস্ত মানুষকে নিকাশ করিয়া বসে না।

অতএব যাদের উচিত ছিল, জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জ্জেণ্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্ব্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন, যাঁরা জানেন শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা, যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও। তিনি শিশুদিগকে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। কেননা শিশুদের মধ্যেই পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা আছে। যে মানুষ বয়সে পাকা হইয়া অভ্যাসে সংস্কারে ও অহমিকায় কঠিন হইয়া গেছে সে মানুষ সেই পূর্ণতার ব্যঞ্জনা হারাইয়াছে—বিশ্বগুরুর কাছে আসা তার পক্ষেই বড় কঠিন।

ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে,—ভাবের আলোকে রসের বর্ষণে তাদের প্রাণ-কোরকের গোপন মর্ম্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই—তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেইজন্যই সৎগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করেন এবং ধৈর্য্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে ঊর্দ্ধের দিকে উদ্ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা

প্রভাতের অরুণরেখার মত অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না—যারা নিজের বিদ্যা, পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না। কাজেই ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্য তারাই রাজদরবারে কড়া আইন ও চাপ্‌রাসওয়ালা পেয়াদার দরবার করিয়া থাকে।

ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড় ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন। পৃথিবীতে অল্প লোকই আছে নিজের অন্তরের মহৎ আদর্শ যাহাদিগকে সত্য পথে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতের ঠেলাতেই তারা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া থাকে। বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে বলিয়াই তারা আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না।

এই জন্যই চারিদিকে যেখানে দাসত্ব মনিবের সেখানে দুর্গতি, শূদ্র যেখানে শূদ্র ব্রাহ্মণের সেখানে অধঃপতন। কঠোর শাসনের চাপে ছাত্রেরা যদি মানব-স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, সকল প্রকার অপমান, দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতা যদি তারা নির্জ্জীবভাবে নিঃশব্দে সহিয়া যায় তবে অধিকাংশ অধ্যাপকদিগকেই তাহা অধোগতির দিকে টানিয়া লইবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে

অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্ত্তব্য কখনই কেহ সাধন করিতে পারে না।

অপর পক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা-খুসি-তাই করিবে, আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে? আমার কথা এই, ছেলেরা যা-খুসি-তাই কখনই করিবে না। তারা ঠিক পথেই চলিবে যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতাসত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই—যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।

অপর পক্ষে একটি সঙ্গত কথা বলিবার আছে। য়ুরোপীয়ের পক্ষে ভারতবর্ষ বিদেশ, এখানকার আবহাওয়া ক্লান্তিকর, তাঁহাদের পানাহার উত্তেজক, আমরা তাঁহাদের অধীনস্থ জাতি, আমাদের বর্ণ ধর্ম্ম, ভাষা, আচার সমস্তই স্বতন্ত্র; তার উপরে, এদেশে প্রত্যেক ইংরেজই রাজশক্তি বহন করেন, সুতরাং রাজাসন তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে;—এই জন্য ছাত্রকে কেবলমাত্র ছাত্র বলিয়া দেখা তাঁর পক্ষে শক্ত, তাকে প্রজা বলিয়াও দেখেন। অতএব অতি সামান্য কারণেই অসহিষ্ণু হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙালি ছাত্রদের মানুষ করিবার ভার কেবল তাঁর নয়, ইংরেজ রাজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার ভারও তাঁর। অতএব একে তিনি ইংরেজ, তার উপর তিনি ইম্পীরিএল সার্ভিসের অধ্যাপক, তার উপরে তিনি রাজার অংশ,

তার উপরে তাঁর বিশ্বাস তিনি পতিত উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াই এদেশে আসিয়াছেন এমন অবস্থায় সকল সময়ে তাঁর মেজাজ ঠিক না থাকিতেও পারে। অতএব তিনি কিরূপ ব্যবহার করিবেন সে বিচার না করিয়া ছাত্রদেরই ব্যবহারকে আষ্টে পৃষ্ঠে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সমুদ্রকে বলিলে চলিবে না যে, তুমি এই পর্য্যন্ত আসিবে তার উর্দ্ধে নয়, তীরে যারা আছে তাহাদিগকেই বলিতে হইবে তোমরা হঠ, হঠ, আরো হঠ।

তাই বলিতেছি একথা সত্য বলিয়া মানিতেই হইবে, যে, নানা অনিবার্য্য কারণে ইংরেজ অধ্যাপক বাঙালি ছাত্রের সহিত বিশুদ্ধ অধ্যাপকের মত ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারেন না। কেম্ব্রিজে অক্সফোর্ডে ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের সম্বন্ধ কিরূপ, তর্কস্থলে আমরা সে নজির উত্থাপন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? সেখানে যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক এখানে যে তাহা নহে সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব স্বাভাবিকতায় যেখানে গর্ত্ত আছে সেখানে শাসনের ইঁটপাট্‌কেল দিয়া ভরাট করিবার কথাটাই সর্ব্বাগ্রে মনে আসে।

সমস্যাটা আমাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে এই কারণেই। এই জন্যই আমাদের স্বদেশীয় বিজ্ঞেরাও ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, বাপু, তোমরা কোনোমতে এগ্‌জামিন্‌ পাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাক, মানুষ হইবার দুরাশা মনে রাখিয়ো না।

এ বেশ ভাল কথা। কিন্তু সুবুদ্ধির কথা চিরদিন খাটে না —মানব প্রকৃতি সুবুদ্ধির পাকা ভিতের উপরে পাথরে গাঁথিয়া তৈরি হয় নাই। তাকে বাড়িতে হইবে, এই জন্যই সে কাঁচা।

এই জন্যই কৃত্রিম ঘেরটাকে সে খানিকটা দূর পর্য্যন্ত সহ্য করে, তার পরে প্রাণের বাড় আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, একদিন হঠাৎ বেড়া ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়ে। যে প্রাণ কচি তারি জয় হয়, যে বাঁধন পাকা সে টেঁকে না।

অতএব স্বভাবকে যদি কেবল একপক্ষেই মানি এবং অপর পক্ষে একেবারেই অগ্রাহ্য করি তবে কিছুদিন মনে হয় সেই একতরফা নিষ্পত্তিতে বেশ কাজ চলিতেছে। তার পরে একদিন হঠাৎ দেখিতে পাই কাজ একেবারেই চলিতেছে না। তখন দ্বিগুণ রাগ হয়—যা এতদিন ঠাণ্ডা ছিল তার অকস্মাৎ চঞ্চলতা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইতে থাকে এবং সেই কারণেই শাস্তির মাত্রা দণ্ডবিধির সহজ বিধানকে ছাড়াইয়া যায়। তার পর হইতে সমস্ত ব্যাপারটা এমনি জটিল হইয়া উঠে যে কমিশনের পঞ্চায়েৎ তার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পায় না; তখন বলিতে বাধ্য হয় যে, কুড়াল দিয়া কাটিয়া, আগুন দিয়া পোড়াইয়া, ষ্টীম-রোলার দিয়া পিষিয়া রাস্তা তৈরি কর।

কথাটা বেশ! কর্ণধার কানে ধরিয়া ঝিঁকা মারিতে মারিতে স্কুলের খেয়া পার করিয়া দিল, তারপরে লৌহ শাসনের কলের গাড়িতে প্রাণ-রসকে অন্তররুদ্ধ তপ্তবাষ্পে পরিণত করিয়া য়ুনিভার্সিটির শেষ ইষ্টেশনে গিয়া নামিলাম, সেখানে চাকরির বালুমরুতে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন জীবিকা-মরীচিকার পিছনে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিলাম, তারপরে সূর্য্য যখন অস্ত যায় তখন যমরাজের সদর গেটের কাছে গিয়া মাথার বোঝা নামাইয়া দিয়া মনে করিলাম জীবন সার্থক হইল—জীবনযাত্রার এমন নিরাপদ এবং শান্তিময় আদর্শ অন্য কোথাও নাই। এই

আদর্শ আমাদের দেশে যদি চিরদিন টেঁকা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে কোনো কথা বলিতাম না।

কিন্তু টিকিল না। তার কারণ, আমরা ত কেবলমাত্র খৃষ্টান-কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ এবং পতিত-উদ্ধারের দুঃসাধ্য ব্রত-ধারীদের কাছ হইতেই শিক্ষা পাই নাই। আমরা যে ইংলণ্ডের কাছ হইতে শিখিতেছি। সেও আজ একশো বছরের উপর হইয়া গেল। সে শিক্ষা ত বন্ধ্যা নহে। নূতন প্রাণকে সে জন্ম দিবেই। তারপরে সেই প্রাণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা যে-অন্নপানীয়ের দাবী করিবে তাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে কেহ পারিবে না।

মনে আছে ছেলেবেলা যখন ইংরেজি মাষ্টারের কাছে ইংরেজি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ মুখস্থ করিতে হইত তখন "I" শব্দের একটা প্রতিশব্দ বহুকষ্টে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, সে হচ্চে "Myself, —I, by myself I।" ইংরেজি এই "I" শব্দের প্রতিশব্দটি আয়ত্ত করিতে কিছুদিন সময় লাগিয়াছে। ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ওটা একরকম সড়গড় হইয়া আসিল। এখন মাষ্টারমশায় I হইতে ঐ myself টাকে কালির দাগে লাঞ্ছিত করিয়া রবারের ঘর্ষণে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমাদের খৃষ্টান হেডমাষ্টার বলিতেছেন, "আমাদের দেশে I শব্দের যে অর্থ তোমাদের দেশে সে অর্থ হইতেই পারেনা।" কিন্তু ওটাকে কণ্ঠস্থ করিতে যদি আমাদের দুইশো বছর লাগিয়া থাকে ওটাকে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত করিতে তার ডবল্ সময়েও কুলায় কিনা সন্দেহ করি। কেননা ঐ I শব্দের ইংরেজি মন্ত্রটা ভয়ঙ্কর কড়া—গুরু যদি গোড়া হইতেই ওটা সম্পূর্ণ চাপিয়া যাইতে পারিতেন ত কোনো বালাই থাকিত না—

এখন ওটা কান হইতে প্রাণের মধ্যে পৌঁছিয়াছে—এখন প্রাণটাকে মারিয়া ওটাকে উপ্‌ড়ানো যায়। কিন্তু প্রাণ বড় শক্ত জিনিস্‌।

ইংলণ্ড যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে আপন সম্পর্ক রাখিয়াছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে আপনি লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। যাহা তার সর্ব্বোচ্চ সম্পদ তাহা ইচ্ছা করিয়াই হউক ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক আমাদিগকে দিতেই হইবে। ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়, তার সঙ্গে প্রিন্সিপাল সাহেবের অভিপ্রায় মিলুক আর নাই মিলুক। তাই আজ আমাদের ছাত্রেরা কেবলমাত্র ইংরেজি কেতাবের ইংরেজি নোট কুড়ানোর উঞ্ছবৃত্তিতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে না—আজ তারা আত্মসম্মানকে বজায় রাখিতে চাহিবেই, আজ তারা নিজেকে কলের পুতুল বলিয়া ভুল করিতে পারিবে না, আজ তারা জেলের দারোগাকে নিজের গুরু বলিয়া মানিয়া শাসনের চোটে তাকে গুরুভক্তি দেখাইতে রাজি হইবে না। আজ যাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাকে গালি দিলেও তাহা মিথ্যা হইবে না এবং তার গালে চড় মারিলেও সে যে সত্য ইহাই আরো বেশী করিয়া প্রমাণ হইতে থাকিবে।

যে কথা লইয়া আজ আলোচনা চলিতেছে এ যদি একটা সামান্য ও সাময়িক আন্দোলনমাত্র হইত তাহা হইলে আমি কোনো কথাই বলিতাম না। কিন্তু ইহার মূলে খুব একটা বড় কথা আছে সেইজন্যই এই প্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকা অন্যায় মনে করি।

মানুষের ইতিহাস ভিন্ন দেশে ভিন্ন মূর্ত্তি ধরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও বিশেষত্ব আছে। সেই ইতিহাসের গোড়া হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি এ দেশ কোনো বিশেষ একটি জাতির

বা বিশেষ একটি সভ্যতার দেশ নয়। এদেশে আর্য্যসভ্যতাও যেমন সত্য, দ্রাবিড় সভ্যতাও তেমনি সত্য; এদেশে হিন্দুও যত বড় মুসলমানও তার চেয়ে নিতান্ত কম নয়। এইজন্যই এখানকার ইতিহাস নানা বিরোধের বাষ্প-সংঘাতে প্রকাণ্ড নীহারিকার মত ঝাপসা হইয়া আছে। এই ইতিহাসে আমরা নানাশক্তির আলোড়ন দেখিয়া আসিতেছি কিন্তু একটা অখণ্ড ঐতিহাসিক মূর্ত্তির উদ্ভাবন এখনো দেখি নাই। এই পরিব্যাপ্ত বিপুলতার মধ্য হইতে একটি নিরবচ্ছিন্ন "আমি"র সুস্পষ্ট ক্রন্দন জাগিল না।

স্ফটিক যখন দ্রব অবস্থায় থাকে তখন তাহা মূর্ত্তিহীন—আমরা সেই অবস্থায় অনেক দিন কাটাইলাম। এমন সময় সমুদ্রপার হইতে একটি আঘাত এই তরল পদার্থের উপর হইতে নীচে একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্তে সঞ্চারিত হইয়াছে—তাই অনুভব করিতেছি দানা বাঁধিবার মত একটা সর্ব্বব্যাপী আবেগ ইহার কণায় কণায় যেন নড়িয়া উঠিল। মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিবার একটা বেদনা ইহার সর্ব্বত্র যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

তাই দেখিতেছি ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমন আর্য্য আছে দ্রাবিড় আছে যেমন মুসলমান আছে, তেমনি ইংরেজও আসিয়া পড়িয়াছে। তাই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কেবল আমাদের ইতিহাস নহে তাহা ইংরেজেরও ইতিহাস। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে ইতিহাসের এই সমস্ত অংশগুলি ঠিকমত করিয়া মেলে, সমস্তটাই এক সজীব শরীরের অঙ্গ হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কোনো একটা অংশকে বাদ দিব সে আমাদের সাধ্য নাই। মুসলমানকে বাদ দিতে পারি নাই, ইংরেজকেও বাদ দিতে পারিব না। এ কেবল বাহুবলের অধিকারগত নহে, আমাদের ইতিহাসেরই

প্রকৃতিই এই—তাহা কোনো একজাতির ইতিহাস নয়, তাহা একটা মানব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস।

এই যে নানা যুগ, নানা জাতি ও নানা সভ্যতা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গড়িয়া তুলিতেছে আজ সেই ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের অনুগত করিয়া আমাদের অভিপ্রায়কে সজাগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আমাদের দেশ ইংলণ্ড নয়, ইটালি নয়, আমেরিকা নয়—সেখানকার মাপে কোনোমতেই আমাদের ইতিহাসকে ছাঁটা চলিবে না। এখানে একেবারে মূলে তফাৎ। ও সকল দেশ মোটের উপরে একটা ঐক্যকে লইয়াই নিজের ইতিহাস ফাঁদিয়াছে, আমরা অনৈক্য লইয়াই প্রথম হইতে সুরু করিয়াছি এবং আজ পর্য্যন্ত কেবল তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আমাদিগকে ভাবিতে হইবে এই লইয়াই আমরা কি করিতে পারি। বাহিরকে কেমন করিয়া বাহির করিয়া দিব স্বভাবতই অন্য ইতিহাসের এই ভাবনা, বাহিরকে কেমন করিয়া আপন করিয়া লইব স্বভাবতই আমাদের ইতিহাসের এই ভাবনা।

ইংরেজকে আমাদের দেশের পক্ষে আপন করিয়া না লইতে পারিলে আমাদের স্বাস্থ্য নাই কল্যাণ নাই। ইংরেজের শাসন যতক্ষণ আমাদের পক্ষে কলের শাসন থাকিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের সম্বন্ধ মানব-সম্বন্ধ না হইবে ততক্ষণ Pax Britanica আমাদিগকে শান্তি দিবে, জীবন দিবেনা। আমাদের অন্নের হাঁড়িতে জল চড়াইবে মাত্র চুলাতে আগুন ধরাইবে না। অর্থাৎ ততক্ষণ ইংরেজ ভারতবর্ষের সৃজন কার্য্যে বিশ্বকর্ম্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হইবে না, বাহির হইতে মজুরি করিয়া কেবল ইঁট কাঠ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া

যাইবে। ইহাকেই একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন the white man's burden। কিন্তু burden কেন হইতে যাইবে? এ কেন সৃজনকার্য্যের আনন্দ না হইবে? সৃষ্টিকর্ত্তার ডাকে ইংরেজ এখানে আসিয়াছে, তাকে সৃষ্টিকার্য্যে যোগ দিতেই হইবে। যদি আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারে তবেই সব দিকে ভাল, যদি না পারে তবে এই Land of regretsএর তপ্ত বালুকাপথ তাহাদের কঙ্কালে খচিত হইয়া যাইবে, তবু ভার বহিতেই হইবে। ভারত ইতিহাসের গঠনকাজে যদি তাহাদের প্রাণের যোগ না ঘটে কেবলমাত্র কাজের যোগ ঘটে তাহা হইলে ভারতবর্ষের বিধাতা বেদনা পাইবেন, ইংরেজও সুখ পাইবে না।

তাই ভারত ইতিহাসের প্রধান সমস্যা এই, ইংরেজকে পরিহার করা নয়, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধকে সজীব ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা। এতদিন পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান ও ভারতবর্ষের নানা বিচিত্র জাতিতে মিলিয়া এ দেশের ইতিহাস আপনা-আপনি যেমন-তেমন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ ইংরেজ আসার পর এই কাজে আমাদের চেতনা জাগিয়াছে। ইতিহাস রচনায় আজ আমাদের ইচ্ছা কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এই জন্যই ইচ্ছায় ইচ্ছায় মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব বাধিবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যাঁরা এ দেশের সঞ্জীবন মন্ত্রের তপস্বী, রাগদ্বেষে ক্ষুব্ধ হইলে তাঁদের চলিবে না। তাঁহাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিল করাই চাই। কারণ ইংরেজ ভারতের ইতিহাসধারাকে বাধা দিতে আসে নাই তাহাতে যোগ দিতেই আসিয়াছে। ইংরেজকে নহিলে ভারতইতিহাস পূর্ণ

হইতেই পারে না। সেই জন্যই আমরা কেবলমাত্র ইংরেজের আপিস চাই না, ইংরেজের হৃদয় চাই।

ইংরেজ যদি আমাদিগকে অবাধে অনায়াসে অবজ্ঞা করিতে পায় তাহা হইলেই আমরা তার হৃদয় হারাইব। শ্রদ্ধা আমাদিগকে দাবী করিতেই হইবে, আমরা খৃষ্টান প্রিন্সিপালের নিকট হইতেও একগালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে পারিব না।

ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর জীবনের সম্বন্ধ কোথায় সহজে ঘটিতে পারে? বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, রাজকীয় ক্ষেত্রেও নয়। তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যাদানের ক্ষেত্র। জ্ঞানের আদান-প্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্বোধিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।

আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইখানে ইংরেজ এমন একটি স্থান পাইতে পারিত যাহা সে রাজসিংহাসনে বসিয়াও পায় না। এই সুযোগ যখন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় তখন আক্ষেপের সীমা থাকে না।

ব্যর্থতার কারণ আমাদের ছাত্ররাই এ কথা আমি কিছুতেই মানিতে পারি না। আমাদের দেশের ছাত্রদের আমি ভাল করিয়াই জানি। ইংরেজ ছেলের সঙ্গে একটা বিষয়ে ইহাদের প্রভেদ আছে। ইহারা ভক্তি করিতে পাইলে আর কিছু চায় না। অধ্যাপকের কাছ হইতে একটুমাত্রও যদি ইহারা খাঁটি স্নেহ পায় তবে তাঁর কাছে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া দিয়া যেন বাঁচে

ছাড়িয়া বাঁচে। আমাদের ছেলেদের হৃদয় নিতান্তই শস্তা দামে পাওয়া যায়।

এইজন্যই আমার যে একটি বিদ্যালয় আছে সেখানে ইংরেজ অধ্যাপক আনিবার জন্য অনেক দিন হইতে উদ্যোগ করিয়াছি। বহুকাল পূর্ব্বে একজনকে আনিয়াছিলাম তিনি সুদীর্ঘ কাল ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় থাকিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁর অন্তঃকরণে পিত্তাধিক্য ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁর ক্লাসে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গালি দিতেন, তারা বাঙালীর ঘরে জন্মিয়াছে এই অপরাধ তিনি সহিতে পারিতেন না। সেই ছেলেরা যদিচ প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র নয়, তাদের বয়স নয় দশ বৎসর হইবে, তবু তারা তাঁর ক্লাসে যাওয়া ছাড়িল। হেডমাষ্টারের তাড়নাতেও কোনো ফল হইল না। দেখিলাম হিতে বিপরীত ঘটিল। এই মাষ্টারটিকে white man's burden হইতে সে যাত্রায় নিষ্কৃতি দিলাম।

কিন্তু আশা ছাড়ি নাই এবং আমার কামনাও সফল হইয়াছে। আজ ইংরেজগুরুর সঙ্গে বাঙালীছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে। এই পুণ্য মিলনটি সমস্ত ভারতক্ষেত্রে দেখিবার জন্য বিধাতা অপেক্ষা করিতেছেন। যে দুটি ইংরেজ আপস সেখানে আছেন তাঁরা নিজের ধর্ম্ম প্রচার করিতে যান নাই, তাঁরা পতিতউদ্ধারের দুঃসহ কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করেন নাই, তাঁরা গ্রীকদের মত বর্ব্বর জাতিকে সভ্যতায় দীক্ষিত করিবার জন্য ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন অভিমান মনে রাখেন না—তাঁরা তাঁদের পরম গুরুর মত করিয়াই দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়াছেন, ছেলেদের আসিতে দাও আমার কাছে—হোক্‌না তারা বাঙালীর ছেলে।—ছেলেরা তাঁদের

অত্যন্ত কাছে আসিতে লেশমাত্র বিলম্ব করে নাই—হোন্ না তাঁরা ইংরেজ। আজ এই কথা বলিতে পারি, এই দুটি ইংরেজের সঙ্গে আমার ছেলেদের যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহা তাহাদের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই ছেলেরা ইংরেজ-বিদ্বেষের বিষে জীবন পূর্ণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে না।

প্রথমে যে শিক্ষকটি আসিয়াছিলেন তিনি শিক্ষকতায় পাকা ছিলেন। তাঁর কাছে পড়িতে পাইলে ছেলেদের ইংরেজি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ দুরস্ত হইয়া যাইত। সেই লোভে আমি কঠোর শাসনে ছাত্রগুলিকে তাঁর ক্লাসে পাঠাইতে পারিতাম। মনে করিতে পারিতাম শিক্ষক যেমনি দুর্ব্যবহার করুন ছাত্রদের কর্ত্তব্য সমস্ত সহিয়া তাঁকে মানিয়া চলা। কিছুদিন তাদের মনে বাজিত, হয় ত কিছুদিন পরে তাদের মনে বাজিতও না—কিন্তু তাদের এক্‌সেণ্ট বিশুদ্ধ হইত। তা হউক, কিন্তু এই মানবের ছেলেদের কি ভগবান নাই? আমরাই কি চুল পাকিয়াছে বলিয়া তাদের বিধাতাপুরুষ? ইংরেজি ভাষায় বিশুদ্ধ এক্‌সেণ্টের জোরে সেই ভগবানের বিচারে আমি কি খালাস পাইতাম?

ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত বাঙালী ছাত্রদের সম্বন্ধ সরল ও স্বাভাবিক হওয়া বর্ত্তমানে বিশেষ কঠিন হইয়াছে। তার কারণ কি, একদিন ইংলণ্ডে থাকিতে, তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। রেলগাড়িতে একজন ইংরেজ আমার পাশে বসিয়াছিলেন—প্রথমটা আমাকে দেখিয়া তাঁর ভালোই লাগিল। এমন কি, তাঁর মনে হইল ইংলণ্ডে আমি ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছি। য়ুরোপের লোককে সাধু উপদেশ দিবার

অধিকার আমাদেরও আছে এ মত তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর কৌতূহল হইল আমি ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়াছি তাহা জানিবার জন্য। আমি বলিলাম আমি বাংলা দেশের লোক। শুনিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। কোনো দুষ্কর্ম্মই যে বাংলা দেশের লোকের অসাধ্য নহে তাহা তিনি তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

কোনো জাতির উপর যখন রাগ করি তখন সে জাতির প্রত্যেক মানুষ আমাদের কাছে একটা এব্‌স্ট্র্যাক্ট সত্তা হইয়া উঠে। তখন সে আর বিশেষ্য থাকে না, বিশেষণ হয়। আমার সহযাত্রী যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন আমি বাঙালী, ততক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মত ব্যবহার করিতেছিলেন, সুতরাং আদব-কায়দার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু যেই তিনি শুনিলেন আমি বাঙালী অমনি আমার ব্যক্তিবিশেষত্ব বাষ্প হইয়া গিয়া একটা বিকট বিশেষণে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই বিশেষণটি অভিধানে যাকে বলে, "নিদারুণ"। বিশেষণ-পদার্থের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার কথা মনেই হয় না। কেননা, ওটা অপদার্থ বলিলেই হয়।

রাশিয়ানের উপর ইংরেজের যখন রাগ ছিল তখন রাশিয়ান-মাত্রেই তার কাছে একটা বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ইংরেজি কাগজে প্রায়ই দেখিতে পাই রাশিয়ানের ধর্ম্মপরতা সহৃদয়তার সীমা নাই। মানুষকে বিশেষণ হইতে বিশেষ্যের কোঠায় ফেলিবামাত্র তার মানবধর্ম্ম প্রকাশ হইয়া পড়ে—তখন তার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করিতে আর বাধে না।

বাঙালী আজ ইংরেজের কাছে বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য

বাঙালীর বাস্তব সত্তা ইংরেজের চোখে পড়া আজ বড়ই কঠিন। এইজন্যই ইচ্ছা করিয়াছিলাম বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধে বাঙালী যুবকদিগকে ভলণ্টিয়াররূপে লড়িতে দেওয়া হয়। ইংরেজের সঙ্গে একযুদ্ধে মরিতে পারিলে বাঙালীও ইংরেজের চোখে বাস্তব হইয়া উঠিত, ঝাপসা থাকিত না, সুতরাং তার পর হইতে তাকে বিচার করা সহজ হইত।

সে সুযোগ ত চলিয়া গেল, এখনো আমরা অস্পষ্টতার আড়ালেই রহিয়া গেলাম। অস্পষ্টতাকে মানুষ সন্দেহ করে। আজ বাংলাদেশে একজন মানুষও আছে কি, যে এই সন্দেহ হইতে মুক্ত?

যাই হউক আমাদের মধ্যে এই অস্পষ্টতার গোধূলি ঘনাইয়া আসিয়াছে;—এইটেই ছায়াকে বস্তু ও বস্তুকে ছায়া ভ্রম করিবার সময়। এখন পরে পরে কেবলি ভুল বোঝাবুঝির সময় বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু এই অন্ধকারটাকে কি কড়া শাসনের ধূলা উড়াইয়াই পরিষ্কার করা যায়? এখনি কি আলোকের প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? সে আলোক প্রীতির আলোক, সে আলোক সমবেদনার প্রদীপে পরস্পর মুখ-চেনাচেনি করিবার আলোক! এই দুর্যোগের সময়েই কি খৃষ্টান কলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের গুরুর চরিত ও উপদেশ স্মরণ করিবেন না? এখনি কি charityর প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? এই যে দেশব্যাপী সংশয় ঘনাইয়া উঠিয়া সত্যকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করিয়া তুলিতেছে ইহাকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া তুলিবার শক্তি তাঁদেরই হাতে যাঁরা উপরে আছেন। পৃথিবীর কুয়াশা কাটাইয়া দিবার ভার আকাশের সূর্য্যের। যখন বারিবর্ষণের প্রয়োজন একান্ত তখন যাঁরা বজ্রবর্ষণের পরামর্শ দিতেছেন

তাঁরা যে কেবলমাত্র সহৃদয়তা ও ঔদার্য্যের অভাব দেখাইতেছেন তাহা নহে তাঁরা ভীরুতার পরিচয় দিতেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ অন্যায় উপদ্রব ভয় হইতে; সাহস হইতে নয়।

উপসংহারে আমি এই কথা কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতে অনুনয় করি। যে-বিদ্যালয়ে ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে বাঙালী ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিতেছে সেই বিদ্যালয় হইতে নব-যুগের বাঙালী যুবক ইংরেজ-জাতির পরে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি বহন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে ইহাই আশা করিতে পারিতাম। যে-বয়সে যে-ক্ষেত্রে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোকে ও ভাবের বর্ষণে ছাত্রদের মধ্যে নবজীবনের প্রথম বিকাশ ঘটিতেছে সেই বয়সে ও সেই ক্ষেত্রেই ইংরেজগুরু যদি তাহাদের হৃদয়কে প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারেন তবেই এই যুবকেরা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধকে সজীব ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে পারিবে। এই শুভক্ষণে এবং এই পুণ্যক্ষেত্রে ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে বাঙালী ছাত্রের সম্বন্ধ যদি সন্দেহের, বিদ্বেষের ও কঠিন শাসনের সম্বন্ধ হয়, তবে আমাদের পরস্পরের ভিতরকার এই বিরোধের বিষ ক্রমশই দেশের নাড়ির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে, ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জাগত হইয়া অন্ধ-সংস্কারে পরিণত হইতে থাকিবে। সে অবস্থায় বাংলা দেশের রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে জঞ্জাল কেবলি বাড়িতে থাকিবে বলিয়া যে আশঙ্কা তাহাকেও আমি তেমন গুরুতর বলিয়া মনে করি না— আমার ভয় এই, যে, ইংরেজের কাছ হইতে আমরা যে-দান দিনে দিনে আনন্দে গ্রহণ করিতে পারিতাম সে-দান প্রত্যহ

আমাদের হৃদয়ের দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে থাকিবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে। জেলখানার কয়েদীরা হাতে বেড়ি পড়িয়া যে-অন্ন খাইতে বসে তাকে যজ্ঞের ভোজ বলা বিদ্রূপ করা। জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ। সেখানেও যে সকল কর্ত্তারা ভোক্তার জন্য আজ লোহার হাতকড়ি ফরমাস দিতেছেন তাঁরা কাল নিতান্ত ভালোমানুষটির মত আশ্চর্য্য হইয়া বলিবেন এত করিয়াও বাঙালীর ছেলের মন পাওয়া গেল না—কৃতজ্ঞতাবৃত্তি ইহাদের একেবারেই নাই, এবং তাঁরা রাত্রে শুইতে যাইবার সময় এবং প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রার্থনা করিবেন Father, do not forgive them!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চার-ইয়ারি কথা

আমরা সেদিন ক্লাবে তাস-খেলায় এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলুম যে রাত্তির যে কত হয়েছে সে-দিকে আমাদের কারও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ঘড়িতে দশটা বাজল শুনে আমরা চমকে উঠলুম। এ-রকম গলাভাঙ্গা ঘড়ি কলিকাতা সহরে আর দ্বিতীয় নেই। ভাঙ্গা কাঁশির চাইতেও তার আওয়াজ বেশি বাজর্খাই এবং সে আওয়াজের রেশ কানে থেকেই যায়; আর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ অসোয়াস্তি করে। এ ঘড়ির কণ্ঠ আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কিন্তু সেদিন কেন জানিনে তার খ্যানখ্যানানিটে যেন নূতন করে, বিশেষ করে, আমাদের কানে বাজল।

হাতের তাস হাতেই রেখে কি করব ভাবছি—এমন সময়ে সীতেশ শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুয়োরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন—"Boy, গাড়ী যোতনে বোলো।" পাশের ঘর থেকে উত্তর এল—"যো হুকুম!"

সেন বল্লেন—"এত তাড়া কেন? এ-হাতটা খেলেই যাও না।"

সীতেশ—বেশ! দেখছনা কত রাত হয়েছে! আমি আর এক-মিনিটও থাকব না। এম্‌নি ত বাড়ী গিয়ে বকুনি খেতে হবে!

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলেন—"কার কাছে?"

সীতেশ।—স্ত্রীর—

সোমনাথ উত্তর করলেন—"ঘরে স্ত্রী কি দুনিয়াতে একা তোমারই আছে, আর কারও নেই?"

সীতেশ।—তোমাদের স্ত্রীরা এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। বাড়ীতে তোমরা কখন্ আসো যাও, তাতে তাদের কিছু আসে যায় না।

সেন বল্লেন—"সে কথা ঠিক। তবে একদিন একটু দেরী হয়েছে তার জন্য......"

সীতেশ।—একটু দেরী? আমার মেয়াদ আটটা পর্য্যন্ত আর এখন দশটা। আর এ-ত একদিন নয়, প্রায় রোজই ত বাড়ী ফিরতে তোপ পড়ে যায়।

"আর রোজই বকুনি খাও।"

"খাইনে?"

"তাহলে সে বকুনি ত আর গায়ে লাগবার কথা নয়। এত দিনেও মনে ঘাঁটা পড়ে যায়নি?"

সীতেশ।—এখন ইয়ারকি রাখ, আমি চল্লুম—Good night!

এই কথা বলে তিনি ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছেন এমন সময় Boy এসে খবর দিলে যে, "কোচমানলোগ আবি গাড়ী যোৎনে নেই মাঙ্গতা। ও লোগ সমজ্‌তা দো দশ মিনট্‌মে জোর পানি আয়েগা, সায়েৎ হাওয়া ভি জোর করে গা। ঘোড়ালোগ আস্তা বলমে খাড়া খাড়া এইসাঁই ডরতা হ্যায়। রাস্তামে নিকালনেসে জরুর ভড়কেগা, সায়েৎ উখড় যায়েগা। কোই আধা ঘণ্টা দেখকে তব সোয়ারি দেনা ঠিক হ্যায়।"

এ কথা শুনে আমরা একটু উতলা হয়ে উঠলুম, কেননা একা সীতেশ নয়, আমাদের সকলেরই বাড়ী যাবার তাড়া ছিল। ঝড়বৃষ্টি আসবার আশু সম্ভাবনা আছে কিনা তাই দেখবার জন্য আমরা চারজনেই বারান্দায় গেলুম। গিয়ে আকাশের যে চেহারা দেখলুম

তাতে আমার বুক চেপে ধরলে, গায়ে কাঁটা দিলে। এ-দেশের মেঘলা দিনের এবং মেঘলা রাত্তিরের চেহারা আমরা সবাই চিনি; কিন্তু এ যেন আর-এক পৃথিবীর আর-এক আকাশ;—দিনের কি রাত্তিরের বলা শক্ত। মাথার উপরে কিম্বা চোখের সুমুখে কোথায়ও ঘন-ঘটা করে নেই, আশে-পাশে কোথায়ও মেঘের চাপ নেই; মনে হল যেন কে সমস্ত আকাশটিকে একখানি একরঙা মেঘের ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছে এবং সে রঙ কালোও নয়, ঘনও নয়; কেননা তার ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। ছাই-রঙের কাঁচের ঢাকনির ভিতর থেকে যে-রকম আলো দেখা যায় সেই-রকম আলো। আকাশ-জোড়া এমন মলিন, এমন মরা আলো আমি জীবনে কখনও দেখিনি। পৃথিবীর উপরে সে রাত্তিরে যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল। এ আলোর স্পর্শে পৃথিবী যেন অভিভূত স্তম্ভিত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। চারপাশে তাকিয়ে দেখি, গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর-দোর সব যেন কোনও আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় মরার মত দাঁড়িয়ে আছে; অথচ এই আলোয় সব যেন একটু হাস্‌ছে। মড়ার মুখে হাসি দেখলে মানুষের মনে যে-রকম কৌতূহলমিশ্রিত আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সে রাত্তিরের দৃশ্য দেখে আমার মনে ঠিক সেই-রকম কৌতূহল ও আতঙ্ক দুই একসঙ্গে সমান উদয় হয়েছিল। আমার মন চাচ্ছিল যে, হয় ঝড় উঠুক বৃষ্টি নামুক বিদ্যুৎ চমকাক্ বজ্র পড়ুক, নয় আরও ঘোর করে আসুক—সব অন্ধকারে ডুবে যাক্। কেননা প্রকৃতির এই আড়ষ্ট দম-আটকানো ভাব আমার কাছে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে অসহ্য থেকে অসহ্যতর হয়ে উঠছিল, অথচ আমি বাইরে থেকে চোখ তুলে নিতে পাচ্ছিলুম না;—

অবাক হয়ে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়েছিলুম, কেননা এই মেঘ-চোয়ানো আলোর ভিতর একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য ছিল।

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখি আমার তিনটি বন্ধুই যিনি যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তিনি তেমনিই দাঁড়িয়ে আছেন; সকলের মুখই গম্ভীর, সকলেই নিস্তব্ধ। আমি এই দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়ে দেবার জন্য চীৎকার করে বল্লুম—"Boy, চারঠো আধা peg লাও।" এই কথা শুনে সকলেই যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। সোমনাথ বল্লেন—"আমার জন্য peg নয়, Vermouth।" তার পর আমরা যে যার চেয়ার টেনে নিয়ে বসে অন্যমনস্ক ভাবে সিগ্রেট ধরালুম। আবার সব চুপ। যখন boy peg নিয়ে এসে হাজির হল তখন সীতেশ বলে উঠলেন্ "মেরা ওয়াস্তে আধা নেই—পূরা।"

আমি হেসে বল্লুম—"I beg your pardon, স্থূল পদার্থের সঙ্গে তরল পদার্থের এ ক্ষেত্রে সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ সে কথাটা ভুলে গিয়েছলুম।"

সীতেশ একটু বিরক্তির স্বরে উত্তর কল্লেন—"তোমাদের মত আমি বামন-অবতারের বংশধর নই।"

—"না অগস্ত্যমুনির; একচুমুকে তুমি সুরা-সমুদ্র পান করতে পার।"

এ কথা শুনে তিনি মহা বিরক্ত হয়ে বললেন—"দেখো রায়, ওসব বাজে রসিকতা এখন ভাল লাগছে না।" আমি কোনও উত্তর করলুম না, কেননা বুঝলুম যে, কথাটা ঠিক। বাইরের ঐ আলো আমাদের মনের ভিতরও প্রবেশ করেছিল, এবং সেই সঙ্গে আমাদের মনের রঙও ফিরে গিয়েছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে আমরা নতুন

ভাবের মানুষ হয়ে উঠেছিলুম। যে-সকল মনোভাব নিয়ে আমাদের দৈনিক জীবনের কারবার, সে-সকল মন থেকে ঝরে গিয়ে তার বদলে দিনের আলোয় যা-কিছু গুপ্ত ও সুপ্ত হয়ে থাকে তাই জেগে ও ফুটে উঠেছিল।

সেন বল্লেন—"যে রকম আকাশের গতিক দেখছি তাতে বোধ হয় এখানেই রাত কাটাতে হবে।"

সোমনাথ বল্লেন,—"ঘণ্টাখানেক না দেখে ত আর যাওয়া যায় না।"

তারপর সকলে নীরবে ধূমপান করতে লাগলুম।

খানিকক্ষণ পরে সেন আকাশের দিকে চেয়ে যেন নিজের মনে নিজের সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করলেন, আমরা একমনে তাই শুনতে লাগলুম।

সেনের কথা

দেখতে পাচ্ছ বাইরে যা-কিছু আছে, চোখের পলকে সব কি-রকম নিস্পন্দ, নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ হয়ে গেছে; যা জীবন্ত তাও মৃতের মত দেখাচ্ছে; বিশ্বের হৃৎপিণ্ড যেন জড়পিণ্ড হয়ে গেছে, তার বাক্‌রোধ নিশ্বাসরোধ হয়ে গেছে, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়েছে; মনে হচ্ছে যেন সব শেষ হয়ে গেছে,—এর পর আর কিছু নেই। তুমি আমি সকলেই জানি যে এ কথা সত্য নয়। এই দুষ্ট বিকৃত কলুষিত আলোর মায়াতে আমাদের অভিভূত করে রেখেছে বলেই আমাদের চোখে এখন যা সত্য তাও মিছে ঠেকছে। আমাদের মন, ইন্দ্রিয়ের এত অধীন যে, একটু রঙের বদলে আমাদের

থাকে বিশ্বের মানে বদ্‌লে যায়। এর প্রমাণ আমি পূর্ব্বেও পেয়েছি। আমি আর-একদিন এই আকাশে আর-এক আলো দেখেছিলুম যার মায়াতে পৃথিবী প্রাণে ভরপূর হয়ে উঠেছিল ;— যা মৃত তা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, যা মিছে তা সত্য হয়ে উঠেছিল।

সে বহুদিনের কথা। তখন আমি সবে M. A. পাশ করে বাড়ীতে বসে আছি ; কিছু করিনে, কিছু কর্‌বার কথা মনেও করিনে। সংসার চালাবার জন্য আমার টাকা রোজগার কর্‌বার আবশ্যক ছিল না, অভিপ্রায়ও ছিল না। আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান ছিল এবং তখনও আমি বিবাহ করিনি ; এবং কখনও যে করব এ কথাও আমার মনে স্বপ্নে স্থান পায়নি। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমাকে চাকরি কিম্বা বিবাহ করবার জন্য কোনরূপ উৎপাত কর্‌তেন না। সুতরাং কিছু না-করবার স্বাধীনতা আমার সম্পূর্ণ ছিল। এক-কথায় জীবনে তখন আমি ছুটি পেয়েছিলুম, এবং সে ছুটি আমি যত-খুসি তত দীর্ঘ কর্‌তে পারতুম। তোমরা হয়ত মনে করছ যে এরকম আরাম, এরকম সুখের অবস্থা তোমাদের কপালে ঘটলে, তোমরা আর তার বদল কর্‌তে চাইতে না। কিন্তু আমার পক্ষে এ অবস্থা সুখের ত নয়ই, আরামেরও ছিল না। প্রথমতঃ আমার শরীর তেমন ভাল ছিল না। কোনও বিশেষ অসুখ ছিল না অথচ একটা প্রচ্ছন্ন জড়তা ক্রমে ক্রমে আমার সমগ্র দেহটি আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। শরীরের ইচ্ছাশক্তি যেন দিন-দিন লোপ পেয়ে আসছিল, প্রতি অঙ্গে আমি একটি অকারণ একটি অসাধারণ শ্রান্তি বোধ করতুম। এখন বুঝি সে হচ্ছে কিছু না করবার শ্রান্তি। সে যাই হোক,

ডাক্তাররা আমার বুক পিঠ ঠুকে আবিষ্কার করলেন যে, আমার যা রোগ তা শরীরের নয়, মনের। কথাটি ঠিক, তবে মনের অসুখটা যে কি তা কোন ডাক্তার-কবিরাজের পক্ষে ধরা অসম্ভব ছিল—কেননা যার মন সেই তা ঠিক ধরতে পারত না। লোকে যাকে বলে দুশ্চিন্তা অর্থাৎ সংসারের ভাবনা তা আমার ছিল না, এবং কোনও স্ত্রীলোক আমার হৃদয় চুরি করে পালায়নি। হয়ত শুনলে বিশ্বাস করবে না, অথচ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, যদিচ তখন আমার পূর্ণ যৌবন তবুও কোন বঙ্গযুবতী আমার চোখে পড়ে নি। আমার মনের প্রকৃতি এতটা অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল যে, সে মনে কোনও অবলা সরলা ননিবালার প্রবেশাধিকার ছিলনা।

আমার মনে যে সুখ ছিলনা, সোয়াস্তি ছিলনা তার কারণই ত এই, যে, আমার মন সংসার থেকে আলগা হয়ে পড়েছিল। এর অর্থ এ নয় যে আমার মনে বৈরাগ্য এসেছিল; অবস্থা ঠিক তার উল্টো। জীবনের প্রতি বিরাগ নয়, আত্যন্তিক অনুরাগবশতঃই আমার মন চারপাশের সঙ্গে খাপছাড়া হয়ে পড়েছিল। আমার দেহ ছিল এদেশে, আর মন ইউরোপে। সে মনের উপর ইউ-রোপের আলো পড়েছিল এবং সে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেতুম যে এদেশে প্রাণ নেই; আমাদের কাজ, আমাদের কথা, আমাদের চিন্তা, আমাদের ইচ্ছা—সবই তেজোহীন, শক্তিহীন, ক্ষীণ, রুগ্ন, ম্রিয়মাণ এবং মৃতকল্প। আমার চোখে আমাদের সামাজিক জীবন একটি বিরাট পুতুল-নাচের মত দেখাত। নিজে পুতুল সেজে আর-একটি সালঙ্কারা পুতুলের হাত ধরে এই পুতুল-সমাজে নৃত্য করবার কথা মনে করতেও আমার ভয় হ'ত। জানতুম তার-চাইতে

মরণও শ্রেয়ঃ; কিন্তু আমি মর্‌তে চাইনি, আমি চেয়েছিলুম বাঁচতে, —শুধু দেহে নয়, মনেও বেঁচে উঠতে, ফুটে উঠতে, জ্বলে উঠতে। এই ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় আমার শরীর-মনকে জীর্ণ করে ফেলছিল, কেননা এই আকাঙ্ক্ষার কোনও স্পষ্ট বিষয় ছিল না, কোনও নির্দ্দিষ্ট অবলম্বন ছিল না। তখন আমার মনের ভিতরে যা ছিল তা একটি ব্যাকুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং সেই ব্যাকুলতা একটি কাল্পনিক একটি আদর্শ নায়িকার সৃষ্টি করেছিল। ভাবতুম যে, জীবনে সেই নায়িকার সাক্ষাৎ পেলেই আমি সজীব হয়ে উঠব। কিন্তু জানতুম এই মরার দেশে সে জীবন্ত রমণীর সাক্ষাৎ কখনো পাব না।

এ-রকম মনের অবস্থায় আমার অবশ্য চারপাশের কাজ-কর্ম্ম আমোদ-আহ্লাদ কিছুই ভাল লাগত না, তাই আমি লোকজন ছেড়ে ইউরোপীয় নাটক-নভেলের রাজ্যে বাস করতুম;—এই রাজ্যের নায়ক-নায়িকারাই আমার রাতদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল, এই কাল্পনিক স্ত্রীপুরুষেরাই আমার কাছে শরীরী হয়ে উঠেছিল; আর রক্তমাংসের দেহধারী স্ত্রী-পুরুষেরা আমার চারপাশে সব ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত। কিন্তু আমার মনের অবস্থা যতই অস্বাভাবিক হোক্, আমি কাণ্ডজ্ঞান হারাই-নি। আমার এ জ্ঞান ছিল যে, মনের এ বিকার থেকে উদ্ধার না পেলে, আমি দেহ-মনে অমানুষ হয়ে পড়্‌ব। সুতরং যাতে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট না হয় সে-বিষয়ে আমার পূরো নজর ছিল। আমি জানতুম যে শরীর সুস্থ রাখ্‌তে পার্‌লে মন সময়ে আপনিই প্রকৃতিস্থ হয়ে আস্‌বে। তাই আমি রোজ চার-পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে বেড়াতুম। আমার বেড়াবার সময় ছিল সন্ধ্যার পর; কোনদিন খাবার আগে, কোন-

দিন খাবার পরে। যেদিন খেয়ে-দেয়ে বেড়াতে বেরুতুম সেদিন বাড়ী ফির্তে প্রায় রাত এগারটা বারোটা বেজে যেত। এক রাত্তিরের একটি ঘটনা আমি আজও বিস্মৃত হই নি, বোধ হয় কখনও হতে পার্ব না, কেননা আজ পর্য্যন্ত আমার মনে তা সমান টাট্‌কা রয়েছে।

সেদিন পূর্ণিমা। আমি একলা বেড়াতে বেড়াতে যখন গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌঁছিলুম তখন রাত প্রায় এগারটা। রাস্তায় জন-মানব ছিল না তবু আমার বাড়ী ফির্তে মন সরছিল না, কেননা সেদিন যে-রকম জ্যোৎস্না ফুটেছিল সে-রকম জ্যোৎস্না কলিকাতায় বোধ হয় দু-দশবৎসরে এক-আধ দিন দেখা যায়। চাঁদের আলোর ভিতর প্রায়ই দেখা যায় একটা ঘুমন্ত ভাব আছে; সে আলো মাটিতে জলেতে ছাদের উপর গাছের উপর যেখানে পড়ে সেখানেই মনে হয় ঘুমিয়ে যায়। কিন্তু সে রাত্তিরে আকাশে অলোর বান ডেকেছিল। চন্দ্রলোক হতে অসংখ্য অবিরত অবিরল ও অবিচ্ছিন্ন একটির-পর-একটি তারপর আর-একটি জ্যোৎস্নার ঢেউ পৃথিবীর উপর এসে ভেঙ্গে পড়ছিল। এই ঢেউ-খেলানো জ্যোৎস্নায় দিগদিগন্ত ফেনিল হয়ে উঠেছিল—সে ফেনা শ্যাম্পেনের ফেনার মত আপন-হৃদয়ের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, তারপরে হাসির আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। আমার মনে এ আলোর নেশা ধরেছিল, আমি তাই নিরুদ্দেশ-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, মনের ভিতর একটি অস্পষ্ট আনন্দ ছাড়া আর কোনও ভাব, কোনও চিন্তা ছিল না।

হঠাৎ নদীর দিকে আমার চোখ পড়্‌ল। দেখি, সারি-সারি জাহাজ

এই আলোয় ভাস্‌ছে। জাহাজের গড়ন যে এমন সুন্দর তা আমি পূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করি নি। তাদের ঐ লম্বা ছিপছিপে দেহের প্রতি-রেখায় একটি একটানা গতির চেহারা সাকার হয়ে উঠেছিল; যে গতির মুখ অসীমের দিকে, আর যার শক্তি অদম্য এবং অপ্রতিহত। মনে হল, যেন কোনও সাগর-পারের রূপকথার রাজ্যের বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীরা উড়ে এসে এখন পাখা-গুটিয়ে জলের উপর শুয়ে আছে—এই জ্যোৎস্নার সঙ্গে-সঙ্গে তারা আবার পাখা-মেলিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাবে। সে দেশ ইউরোপ—যে ইউরোপ তুমি-আমি চোখে দেখে এসেছি সে ইউরোপ নয়, কিন্তু সেই কবি-কল্পিত রাজ্য যার পরিচয় আমি ইউরোপীয় সাহিত্যে লাভ করেছিলুম। এই জাহাজের ইঙ্গিতে সেই রূপকথার রাজ্য, সেই রূপের রাজ্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে এল। আমি উপরের দিকে চেয়ে দেখি আকাশ জুড়ে হাজার-হাজার জ্যাস্‌মিন্‌ হথরণ্‌ প্রভৃতি স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠছে, ঝরে পড়্‌ছে,—চারিদিকে সাদা ফুলের বৃষ্টি হচ্ছে। সে ফুল, গাছপালা সব ঢেকে ফেলেছে, পাতার ফাঁক দিয়ে ঘাসের উপরে পড়েছে, রাস্তা-ঘাট সব ছেয়ে ফেলেছে। তার পর আমার মনে হল যে, আমি আজ রাত্তিরে কোন মিরাণ্ডা কি ডেসডিমনা, বিয়াট্রিস কি টেসার দেখা পাব এবং তার স্পর্শে আমি বেঁচে উঠব, জেগে উঠব, অমর হব। আমি কল্পনার চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেলুম যে, আমার সেই চির-কাঙ্ক্ষিত eternal feminine সশরীরে দূরে দাঁড়িয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

ঘুমের ঘোরে মানুষ যেমন সোজা-একদিকে চলে যায় আমি

তেমনি ভাবে চল্‌তে চল্‌তে যখন লাল রাস্তার পাশে এসে পড়লুম তখন দেখি দূরে যেন একটি ছায়া পায়চারি কর্‌ছে। আমি সেই-দিকে এগুতে লাগলুম। ক্রমে সেই ছায়া শরীরী হয়ে উঠতে লাগল; সে যে মানুষ সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রইল না। আমি তার দিকে এগুতে লাগলুম। যখন অনেকটা কাছে এসে পড়েছি তখন সে পথের ধারে একটি বেঞ্চিতে বস্‌ল। আরও কাছে এসে দেখি, বেঞ্চিতে যে বসে আছে সে একটি ইংরাজ-রমণী—পূর্ণযৌবনা অপূর্ব্বসুন্দরী! এমন রূপ মানুষের হয় না;—সে যেন মূর্ত্তিমতী পূর্ণিমা! আমি তার সমুখে থমকে দাঁড়িয়ে নির্ণেমেষে তার দিকে চেয়ে রইলুম। দেখি সেও একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। যখন তার চোখের উপর আমার চোখ পড়্‌ল তখন দেখি তার চোখদুটি আলোয় জ্বলজ্বল করছে; মানুষের চোখে এমন জ্যোতি আমি জীবনে আর-কখনও দেখি নি! সে আলো তারার নয়, চন্দ্রের নয়, সূর্য্যের নয়, —বিদ্যুতের। সে আলো জ্যোৎস্নাকে আরও উজ্জ্বল করে তুললে, চন্দ্রালোকের বুকের ভিতর যেন তাড়িত সঞ্চারিত হল। বিশ্বের সূক্ষ্মশরীর সেদিন একমুহূর্ত্তের জন্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছিল। এ জড়জগৎ সেই-মুহূর্ত্তে প্রাণময় মনোময় হয়ে উঠেছিল। আমি সেদিন ইথারের স্পন্দন চর্ম্মচক্ষে দেখেছি; আর দিব্য-চক্ষে দেখ্‌তে পেয়েছি যে আমার আত্মা ইথারের সঙ্গে এক-সুরে একতানে স্পন্দিত হচ্ছে। এ সবই সেই রাত্তিরের সেই আলোর মায়া। এই মায়ার প্রভাবে শুধু বহির্জ্জগতে নয়, আমার অন্তর-জগতেরও সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছিল। আমার দেহমন মিলে-

মিশে এক-হয়ে একটি মূর্ত্তিমতী বাসনার আকার ধারণ করেছিল এবং সে হচ্ছে ভালবাসবার এবং ভালবাসা-পাবার বাসনা। আমার মন্ত্রমুগ্ধ মনে জ্ঞান বুদ্ধি এমন কি চৈতন্য পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছিল।

কতক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি আমার দিকে চেয়ে, আমি অচেতন পদার্থের মত দাঁড়িয়ে আছি দেখে, একটু হাসলে। সেই হাসি দেখে আমার মনে সাহস এল, আমি সেই বেঞ্চিতে তার পাশে বসলুম—গা ঘেঁসে নয়, একটু দূরে। আমরা দুজনেই চুপ করে ছিলুম। বলা বাহুল্য, তখন আমি চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখছিলুম; সে স্বপ্ন যে-রাজ্যের সে-রাজ্যে শব্দ নেই; যা আছে তা শুধু নীরব অনুভূতি। আমি যে স্বপ্ন দেখছিলুম তার প্রধান প্রমাণ এই যে, সে-সময় আমার কাছে সকল অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠেছিল। এই কলিকাতা-সহরে কোন বাঙ্গালী রোমিয়োর ভাগ্যে কোনও বিলাতি জুলিয়েট যে জুটতে পারেনা—এ জ্ঞান তখন সম্পূর্ণ হারিয়ে বসেছিলুম।

আমার মনে হচ্ছিল যে, ও-স্ত্রীলোকেরও হয়ত আমারই মত মনের সুখ ছিলনা এবং সে একই কারণে। এর মনও হয়ত এর চারপাশের বণিক-সমাজ হতে আলগা হয়ে পড়েছিল এবং এও, সেই অপরিচিতের আশায়, প্রতীক্ষায়, দিনের পর দিন বিষাদে অবসাদে কাটাচ্ছিল, যার কাছে আত্মসমর্পণ করে এর জীবনমন সরাগ সতেজ হয়ে উঠবে। আর আজকের এই কুহকী পূর্ণিমার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ডাকে আমরা দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমাদের এ মিলনের মধ্যে বিধাতার হাত আছে। অনাদিকালে এ মিলনের সূচনা হয়েছিল এবং অনন্তকালেও তার সমাধা হবে না। এই সত্য আবিষ্কার করবামাত্র আমি আমার সঙ্গিনীর দিকে

মুখ ফেরালুম। দেখি, কিছুক্ষণ আগে যে চোখ হীরার মত জ্বলছিল এখন তা নীলার মত সুকোমল হয়ে গেছে ;—একটি গভীর বিষাদের রঙে তা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে ;—এমন কাতর, এমন করুণ দৃষ্টি আমি মানুষের চোখে আর-কখনও দেখিনি। সে চাহনিতে আমার হৃদয়মন একবারে গ'লে উথলে উঠল ; আমি আস্তে তার একখানি জ্যোৎস্নামাখা হাত আমার হাতের কোলে টেনে নিলুম ; সে হাতের স্পর্শে আমার সকল শরীর শিহরিত হয়ে উঠল, সকল মনের মধ্য দিয়ে একটি আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। আমি চোখ-বুজে আমার অন্তরে এই নব-উচ্ছ্বসিত প্রাণের বেদনা অনুভব করতে লাগলুম।

হঠাৎ সে তার হাত আমার হাত থেকে সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল! চেয়ে দেখি সে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। একটু এদিক্-ওদিক চেয়ে সে দক্ষিণদিকে দ্রুতবেগে চল্‌তে আরম্ভ করলে। আমি পিছনদিকে তাকিয়ে দেখি ছ-ফুট-এক-ইঞ্চি লম্বা একটি ইংরেজ চার-পাঁচজন চাকর সঙ্গে করে মেয়েটির দিকে জোরে হেঁটে চল্‌ছে। মেয়েটি দু-পা এগুচ্ছে আবার মুখ ফিরিয়ে দেখছে, আবার এগুচ্ছে আবার দাঁড়াচ্ছে। এমনি করতে করতে ইংরাজটি যখন তার কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হল অমনি সে দৌড়ুতে আরম্ভ করলে। পিছনে পিছনে এরা-সকলেও দৌড়ুতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে একটি চীৎকার শুনতে পেলুম! সে চীৎকার ধ্বনি যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি বিকট! সে চীৎকার শুনে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল ;—আমি যেন ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম, আমার নড়বার-চড়বার শক্তি রইল না।

তারপর দেখি চার-পাঁচ-জনে চেপে ধরে তাকে আমার দিকে টেনে আন্‌ছে ; ইংরাজটি সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে। মনে হল, এ অত্যাচারের হাত থেকে একে উদ্ধার কর্‌তেই হবে—এই পশুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতেই হবে! এই মনে করে আমি যেমন সেই-দিকে এগুতে যাচ্ছি অমনি মেয়েটি হো হো করে হাস্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। সে অট্টহাস্য চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ; সে হাসি তার কান্নার চাইতে দশগুণ বেশি বিকট, দশগুণ বেশি মর্ম্মভেদী। আমি বুঝলুম যে মেয়েটি পাগল,—একেবারে উন্মাদ পাগল, পাগলা-গারদ থেকে কোনও সুযোগে পালিয়ে এসেছিল, রক্ষকেরা তাকে ফের ধরে নিয়ে যাচ্চে।

এই আমার প্রথম-ভালবাসা আর এই আমার শেষ-ভালবাসা। এর পরে ইউরোপে কত ফুলের-মত কোমল, কত তারার-মত উজ্জ্বল স্ত্রীলোক দেখেছি ; ক্ষণিকের জন্য আকৃষ্টও হয়েছি কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমার মন নরম হবার উপক্রম হয়েছে সেইমুহূর্ত্তে ঐ অট্টহাসি আমার কানে বেজেছে, অমনি আমার মন পাথর হয়ে গেছে। আমি সেই-দিন থেকে চিরদিনের জন্য eternal feminineকে হারিয়েছি, কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।

এই বলে সেন তাঁর কথা শেষ কর্‌লেন। আমরা সকলে চুপ করে রইলুম। এতক্ষণ সীতেশ চোখবুজে একখানি আরাম-চৌকির উপর তাঁর ছ-ফুট দেহটি বিস্তার করে লম্বা হয়ে শুয়ে-ছিলেন ; তাঁর হস্তচ্যুত আধহাত লম্বা ম্যানিলা চুরুটটি মেজের উপর পড়ে সধূম দুর্গন্ধ প্রচার করে তার অন্তরের প্রচ্ছন্ন আগুনের

অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছিল। আমি মনে করেছিলুম সীতেশ ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ জলের ভিতর থেকে একটা বড় মাছ যেমন ঘাই-মেরে ওঠে তেমনি সীতেশ এই নিস্তব্ধতার ভিতর থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে খাড়া হয়ে বসলেন। সেদিনকের সেই রাত্তিরের ছায়ায় তাঁর প্রকাণ্ড দেহ অষ্টধাতুতে গড়া একটি বিরাট বৌদ্ধমূর্ত্তির মত দেখাচ্ছিল। তারপর সেই মূর্ত্তি অতি মিহি মেয়েলি গলায় কথা কইতে আরম্ভ করলেন। ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্যের যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সীতেশের ঠিক কথা তার পুনরাবৃত্তি নয়।

সীতেশের কথা

তোমরা সকলেই জান, আমার প্রকৃতি সেনের ঠিক উল্টো। স্ত্রীলোক দেখলে আমার মন আপনিই নরম হয়ে আসে। কত সবল শরীরের ভিতর কত দুর্ব্বল মন থাকতে পারে, তোমাদের মতে, আমি তার একটি জল-জ্যান্ত উদাহরণ। বিলেতে আমি মাসে একবার-করে নূতন করে ভালবাসায় পড়্‌তুম; তার জন্য তোমরা আমাকে কত-না ঠাট্টা করেছ এবং তার জন্য আমি তোমাদের সঙ্গে কত-না তর্ক করেছি। কিন্তু এখন আমি আমার নিজের মন বুঝে দেখেছি যে, তোমরা যা বল্‌তে তা ঠিক। আমি যে সেকালে, দিনে একবার-করে ভালবাসায় পড়ি নি, এতেই আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। স্ত্রীজাতির দেহ এবং মনের ভিতর এমন-একটি শক্তি আছে যা আমার দেহমনকে নিত্য টানে। সে আকর্ষণী শক্তি

কারও বা চোখের চাহনিতে থাকে, কারও বা মুখের হাসিতে কারও বা গলার স্বরে কারও বা দেহের গঠনে। এমন-কি স্ত্রী-অঙ্গের কাপড়ের রঙে গহনার ঝঙ্কারেও আমার বিশ্বাস যাদু আছে। মনে আছে একদিন একজনকে দেখে আমি কাতর হয়ে পড়ি, সেদিন সে ফলসাই-রঙের কাপড় পরেছিল—তারপরে তাকে আর-একদিন আশমানি-রঙের কাপড়-পরা দেখে আমি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলুম। এ রোগ আমার আজও সম্পূর্ণ সারে নি। আজও আমি মলের শব্দ শুন্‌লে কান খাড়া করি, রাস্তায় কোন বন্ধ-গাড়িতে খড়খড়ি তোলা রয়েছে দেখলে আমার চোখ আপনিই সেদিকে যায়; গ্রীক Statueর মত গড়নের কোনও হিন্দুস্থানী রমণীকে পথে-ঘাটে পিছন-থেকে দেখলে আমি ঘাড়-বাঁকিয়ে একবার তার মুখটি দেখে নেবার চেষ্টা করি। তা ছাড়া সেকালে আমার মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমি হচ্ছি সেই-জাতের পুরুষমানুষ, যাদের প্রতি স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই অনুরক্ত হয়। এ-সত্ত্বেও আমি যে নিজের কিম্বা পরের সর্ব্বনাশ করি নি তার কারণ Don Juan হবার মত সাহস ও শক্তি আমার শরীরে আজও নেই,. কখন ছিলও না। দুনিয়ার যত সুন্দরী আজও রীতিনীতির কাচের আলমারির ভিতর পোরা রয়েছে, অর্থাৎ তাদের দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না। আমি যে ইহজীবনে এই আলমারির একখানা আয়নাও ভাঙিনি তার কারণ ও-বস্তু ভাঙলে প্রথমতঃ বড় আওয়াজ হয়—তার ঝনঝনানি পাড়া মাথায় কোরে তোলে; দ্বিতীয়তঃ তাতে হাত-পা কাটবার ভয়ও আছে। আসল কথা, সেন eternal feminine একের ভিতর পেতে চেয়েছিলেন—আমি অনেকের

ভিতর। ফল সমানই হয়েছে। তিনিও তা পাননি, আমিও পাই নি। তবে দুজনের ভিতর তফাৎ এই যে, সেনের মত কঠিন মন কোনও স্ত্রীলোকের হাতে পড়্‌লে, সে তাতে বাটালি দিয়ে নিজের নাম খুদে রেখে যায়, কিন্তু আমার মত তরল মনে, স্ত্রীলোকমাত্রেই তার আঙ্গুল ডুবিয়ে যা-খুসি হিজিবিজি করে দাঁড়ি টান্‌তে পারে, সেই-সঙ্গে সে-মনকে ক্ষণিকের তরে ঈষৎ চঞ্চল করে তুল্‌তে পারে—কিন্তু কোনও দাগ রেখে যেতে পারে না; সে অঙ্গুলিও সরে যায়—তার রেখাও মিলিয়ে যায়; তাই আজ দেখ্‌তে পাই আমার স্মৃতিপটে একটি-ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোকের স্পষ্ট ছবি নেই। একটি দিনের একটি ঘটনা আজও ভুল্‌তে পারিনি, কেননা এক-জীবনে এমন ঘটনা দুবার ঘটে না।

আমি তখন লণ্ডনে। মাসটি ঠিক মনে নেই; বোধ হয় অক্টোবরের শেষ কিম্বা নভেম্বরের প্রথম। কেন-না এইটুকু মনে আছে যে তখন চিম্‌নিতে আগুন দেখা দিয়েছে। আমি একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সন্ধ্যে হয়েছে; —যেন সূর্য্যের আলো নিভে গেছে অথচ গ্যাসের বাতি জ্বালা হয় নি। ব্যাপারখানা কি বোঝবার জন্য জানলার কাছে গিয়ে দেখি রাস্তায় যত লোক চলেছে সকলের মুখই ছাতায় ঢাকা। তাদের ভিতর পুরুষ স্ত্রীলোক চেনা যাচ্ছে শুধু কাপড় ও চালের তফাতে। যারা ছাতার ভিতর মাথা গুঁজে কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে হনহন্ করে চলেছেন, বুঝলুম তাঁরা পুরুষ; আর যাঁরা ডানহাতে ছাতা ধরে বাঁহাতে গাউন হাঁটুপর্য্যন্ত তুলে ধরে কাঁদা-খোঁচার মত লাফিয়ে-লাফিয়ে চলেছেন, বুঝলুম তাঁরা স্ত্রীলোক।

এই থেকে আন্দাজ করলুম বৃষ্টি সুরু হয়েছে ; কেন না এ-বৃষ্টির ধারা এত সূক্ষ্ম যে তা চোখে দেখা যায় না, আর এত ক্ষীণ যে তা কানে শোনা যায় না।

ভাল কথা, এ জিনিষ কখন নজর করে দেখেছ কি যে বর্ষার দিনে বিলেতে কখনও মেঘ করে না, আকাশটা শুধু আগাগোড়া ঘুলিয়ে যায়, এবং তার ছোঁয়াচ লেগে গাছপালা সব নেতিয়ে পড়ে, রাস্তাঘাট কাদায় প্যাচপ্যাচ করে ? মনে হয় যে এ বর্ষার আধখানা উপর থেকে নামে আর আধখানা নীচে থেকেও ওঠে, আর দুইয়ে মিলে আকাশময় একটা বিশ্রী অস্পৃশ্য নোংরা ব্যাপারের সৃষ্টি করে। সকালে উঠেই দিনের এই চেহারা দেখে যে একদম মন-মরা হয়ে গেলুম সে কথা বলা বাহুল্য। এ রকম দিনে ইংরাজরা বলেন, তাঁদের খুন কর্‌বার ইচ্ছে যায় ; সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের যে আত্মহত্যা কর্‌বার ইচ্ছে হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

আমার একজনের সঙ্গে Richmond যাবার কথা ছিল, কিন্তু এমন-দিনে ঘর থেকে বেরোবার প্রবৃত্তি হল না। কাজেই ব্রেকফাষ্ট খেয়ে Times নিয়ে পড়তে বসলুম। আমি সেদিন ও-কাগজের প্রথম অক্ষর থেকে শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত পড়লুম ; এক কথাও বাদ দেই নি। সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করি যে, Times-এর শাঁসের চাইতে তার খোসা, তার প্রবন্ধের চাইতে তার বিজ্ঞাপন ঢের বেশি মুখরোচক। তার আর্টিকেল পড়লে মনে যা হয় তার নাম রাগ ; আর তার আডভার্টিস্‌মেণ্ট পড়লে মনে মনে যা হয় তার নাম লোভ। সে যাই হোক, কাগজ-পড়া

শেষ হতে-না-হতেই দাসী লাঞ্চ এনে হাজির করলে; যেখানে বসেছিলুম সেইখানে বসেই তা শেষ কল্লুম। তখন দুটো বেজেছে। অথচ বাইরের চেহারার কোনও বদল হয় নি, কেননা এই বিলেতি বৃষ্টি ভাল করে পড়তেও জানে না, ছাড়তেও জানে না। তফাতের মধ্যে দেখি যে, আলো ক্রমে এত কমে এসেছে যে বাতি না জ্বেলে ছাপার অক্ষর আর পড়বার যো নেই।

আমি কি কর্‌ব ঠিক করতে না পেরে ঘরের ভিতর পায়চারি করতে সুরু করলুম, ক্ষাণিকক্ষণ পরে তাতেও বিরক্তি ধরে এল। ঘরের গ্যাস জ্বেলে আবার পড়তে বসলুম। প্রথমে নিলুম আইনের বই —Anson-এর contract। এক-কথা দশবার করে পড়লুম অথচ offer এবং acceptance-এর এক বর্ণও মাথায় ঢুকল না। আমি জিজ্ঞেস কল্লুম "তুমি এতে রাজি?" তুমি উত্তর কর্‌লে "আমি ওতে রাজি।"—এই সোজা জিনিষটেকে মানুষ কি জটিল করে তুলেছে এই দেখে মানুষের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়্‌লুম। মানুষে যদি কথা দিয়ে কথা রাখত তাহলে এই সব পাপের বোঝা আমাদের আর বইতে হত না। তার খুরে দণ্ডবৎ করে Ansonকে সেল্‌ফের সর্বোচ্চ থাকে তুলে রাখলুম। নজরে পড়ল সুমুখে একখানা পুরোনো Punch পড়ে রয়েছে। তাই নিয়ে ফের বসে গেলুম। সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেদিন Punch পড়ে হাসি পাওয়া দূরে থাক, রাগ হতে লাগল। এমন কলে-তৈরী রসিকতাও যে মানুষে পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে এই ভেবে অবাক হলুম। দিব্যচক্ষে দেখতে পেলুম যে, পৃথিবীর এমন দিনও আসবে, যখন Made in Germany এই ছাপমারা রসিকতাও বাজারে দেদার কাটবে। সে

যাই হোক, আমার চৈতন্য হল যে এদেশের আকাশের মত এদেশের মনেও বিদ্যুৎ কালে-ভদ্রে এক-আধবার দেখা দেয়—তাও আবার যেমন ফ্যাকাসে, তেমনি এলো। যেই এই কথা মনে হওয়া অমনি Punchখানি চিম্‌নির ভিতর গুঁজে দিলুম, তার আগুন আনন্দে হেসে উঠল। একটি জড়পদার্থ Punchএর মান রাখলে দেখে খুসী হলুম।

তার পর চিম্‌নির দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট-দশেক আগুন পোহালুম। তার পর আবার একখানি বই নিয়ে পড়্‌তে বসলুম। এবার নভেল। খুলেই দেখি ডিনারের বর্ণনা। টেবিলের উপর সারি সারি রূপোর বাতিদান, গাদা গাদা রূপোর বাসন, ডজন ডজন হীরের মতন পল-কাটা চকচকে ঝকঝকে কাঁচের গেলাস। আর, সেই-সব গেলাসের ভিতর স্পেনের ফ্রান্সের জর্ম্মানির মদ,—তার কোনটির রঙ চুনির, কোনটির পান্নার, কোনটি পোখরাজের। এ নভেলের নায়কের নাম Algernon, নায়িকার Millicent। একজন Dukeএর ছেলে, আর একজন millionaireএর মেয়ে, রূপে Algernon বিদ্যাধর, Millicent বিদ্যাধরী। কিছুদিন হল পরস্পর পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হয়েছেন এবং সে-প্রণয় অতি পবিত্র, অতি মধুর, অতি গভীর। এই ডিনারে Algernon বিবাহের offer কর্‌বেন, Millicent তা accept কর্‌বেন—contract পাকা হয়ে যাবে।

সে-কালের কোনও বর্ষার দিনে কালিদাসের আত্মা যেমন মেঘ-চড়ে অলকায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, এই দুর্দ্দিনে আমার আত্মাও তেমনি কুয়াসায় ভর করে এই নভেল-বর্ণিত এই রূপোর-

রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হল। কল্পনার চক্ষে দেখলুম সেখানে একটি যুবতী, বিরহিণী যক্ষ-পত্নীর মত, আমার পথ-চেয়ে বসে আছে। আর তার রূপ! তা বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নেই। সে যেন হীরামাণিক-দিয়ে সাজানো সোনার প্রতিমা। বলা বাহুল্য যে চারচক্ষুর মিলন হবা-মাত্রই আমার মনে ভালবাসা উথলে উঠল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার মনপ্রাণ তার হাতে সমর্পন কল্লুম। সে সস্নেহে সাদরে তা গ্রহণ করলে। ফলে যা পেলুম তা শুধু যক্ষকন্যা নয়, সেই সঙ্গে যক্ষের ধন। এমন সময় ঘড়িতে টং টং করে চারটে বাজল, অমনি আমার দিবাস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে দেখি যেখানে আছি সে রূপকথার রাজ্য নয়, কিন্তু একটা সাঁতসেঁতে অন্ধকার জল-কাদার দেশ। আর একা ঘরে বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল; আমি টুপি ছাতা ওভারকোট নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

জানই ত, জলই হোক, ঝড়ই হোক্, লণ্ডনের রাস্তায় লোক চলাচল কখনই বন্ধ হয় না; সেদিনও হয় নি। যতদূর চোখ যায় দেখি, শুধু মানুষের স্রোত চলেছে—সকলেরই পরণে কালো কাপড়, মাথায় কালো টুপি, পায়ে কালো জুতো, হাতে কালো ছাতা। হঠাৎ দেখ্‌তে মনে হয় যেন অসংখ্য অগণ্য Daguerro typeএর ছবি বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে। এই লোকারণ্যের ভিতর, ঘরের চাইতে আমার বেশি একলা মনে হতে লাগল, কেননা এই হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যাকে আমি চিনি, যার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারি; অথচ সেই-মুহূর্তে মানুষের সঙ্গে কথা কইবার

জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মানুষ যে মানুষের পক্ষে কত আবশ্যক তা এই-রকম দিনে এই-রকম অবস্থায় পূরো বোঝা যায়।

নিরুদ্দেশ-ভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমি Holborn Circusএর কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হলুম। স্নমুখে দেখি একটি ছোট্ট পুরোনো বইয়ের দোকান, আর তার ভিতরে একটি জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ গ্যাসের বাতির নীচে বসে আছে। তার গায়ের ফ্রক-কোটের বয়েস বোধ হয় তার চাইতেও বেশি। যা বয়েস-কালে কালো ছিল এখন তা হল্‌দে হয়ে উঠেছে। আমি অন্যমনস্ক-ভাবে সেই দোকানে ঢুকে পড়লুম। বৃদ্ধটি শশব্যস্তে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। তার রকম দেখে মনে হল যে আমার মত সৌখিন পোযাক-পরা খদ্দের ইতিপূর্ব্বে তার দোকানের ছায়া কখনই মাড়ায় নি। এ-বই ও-বই সে-বইয়ের ধূলো ঝেড়ে সে আমার স্নমুখে নিয়ে এসে ধর্‌তে লাগল। আমি তাকে স্থির থাক্‌তে বলে নিজেই এখান-থেকে সেখান-থেকে বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে স্নরু করলুম। কোন বইয়ের বা পাঁচমিনিট ধরে ছবি দেখলুম, কোন বইয়ের বা দু-চার লাইন পড়েও ফেললুম। পুরোনো বই-ঘাঁটার ভিতর যে একটু আমোদ আছে তা তোমরা সবাই জানো। আমি এক-মনে সেই আনন্দ উপভোগ কচ্ছি এমন সময়ে হঠাৎ এই ঘরের ভিতর কি জানি কোথা-থেকে একটি মিষ্টি গন্ধ বর্ষার দিনে বসন্তের হাওয়ার মত ভেসে এল। সে গন্ধ যেমন ক্ষীণ তেমনি তীক্ষ্ণ,—এ সেই জাতের গন্ধ যা অলক্ষিতে তোমার বুকের ভিতর প্রবেশ করে, আর সমস্ত অন্তরাত্মাকে উতলা

করে তোলে। এ গন্ধ ফুলের নয়; কেন-না ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়, আকাশে চারিয়ে যায়; তার কোনও মুখ নেই। কিন্তু এ সেই-জাতীয় গন্ধ যা একটি সূক্ষ্মরেখা ধরে ছুটে আসে, একটি অদৃশ্য তীরের মত বুকের ভিতর গিয়ে বেঁধে। বুঝলুম এ গন্ধ হয় মৃগনাভি কস্তুরির, নয় পাচুলির অর্থাৎ রক্তমাংসের দেহ থেকে এ গন্ধের উৎপত্তি। আমি একটু ত্রস্ত-ভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, পিছনে গলা-থেকে-পা-পর্য্যন্ত গাগাগোড়া কালো কাপড়পরা একটি স্ত্রীলোক লেজে ভর দিয়ে সাপের মত ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার দিকে হাঁ-করে চেয়ে রয়েছি দেখে সে চোখ ফেরালে না। পূর্ব্বপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলে লোকে যে-রকম করে হাসে সেই-রকম মুখ-টিপে-টিপে হাস্‌তে লাগল, অথচ আমি হলপ করে বল্‌তে পারি যে, এ-স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার কস্মিনকালেও দেখা হয় নি। আমি এই হাসির রহস্য বুঝতে না পেরে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে তার দিকে পিছন ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে একখানি বই খুলে দেখতে লাগলুম। কিন্তু তার একছত্রও আমার চোখে পড়ল না। আমার মনে হতে লাগল যে, তার চোখ-দুটি যেন ছুরির মত আমার পিঠে বিঁধছে। এতে আমার এত অসোয়াস্তি করতে লাগল যে আমি আবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালুম। দেখি সেই মুখটেপা হাসি তার মুখে লেগেই রয়েছে। ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে এ-হাসি তার মুখের নয়, চোখের; ইস্পাতের মত নীল, ইস্পাতের মত কঠিন দুটি চোখের কোণ থেকে সে-হাসি ছুরির ধারের মত চিক্‌মিক্ করছে। আমি সে-দৃষ্টি এড়াবার

যতবার চেষ্টা করলুম আমার চোখ ততবার ফিরে সেই-দিকেই গেল। শুন্‌তে পাই, কোন কোন সাপের চোখে এমন আকর্ষণী শক্তি আছে, যার টানে গাছের পাখী মাটিতে নেমে আসে; হাজার পাখা-ঝাপটা দিয়েও তা উড়ে যেতে পারে না। আমার মনের অবস্থাও ঐ পাখীর মতই হয়েছিল।

বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যে আমার মনে নেশা ধরেছিল,—ঐ পাচুলির গন্ধ আর ঐ চোখের আলো এই দুইয়ে মিশে আমার শরীর-মন দুই উত্তেজিত করে তুলেছিল। আমার মাথার ঠিক ছিল না সুতরাং তখন যে কি কচ্ছিলুম তা আমি জানিনে। শুধু এইটুকু মনে আছে যে হঠাৎ তার গায়ে আমার গায়ের ধাক্কা লাগল। আমি মাপ চাইলুম; সে হাসিমুখে উত্তর করলে—"আমার দোষ। তোমার নয়।" তার গলার স্বরে আমার বুকের ভিতর কি-যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল, কেননা সে আওয়াজ বাঁশির নয়, তারের যন্ত্রের। তাতে জোয়ারি ছিল। এই কথার পর আমরা এমনভাবে পরস্পর কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলুম যেন আমরা দুজনে কতকালের বন্ধু। আমি তাকে এ-বইয়ের ছবি দেখাই, সে আর-একখানি বই টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে আমি তা পড়েছি কিনা। এই করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেল তা জানিনে। তার কথাবার্ত্তায় বুঝলুম যে তার পড়াশুনো আমার-চাইতে ঢের বেশি। জর্ম্মাণ ফ্রেঞ্চ ইটালিয়ান তিন ভাষার সঙ্গেই দেখলুম তার সমান পরিচয় আছে। আমি ফ্রেঞ্চ জানতুম তাই নিজের বিদ্যে-দেখাবার জন্যে একখানি ফরাসি কেতাব তুলে নিয়ে ঠিক তার মাঝখানে খুলে পড়তে লাগলুম; সে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দিয়ে

মুখ বাড়িয়ে দিয়ে দেখ্‌তে লাগল, আমি কি পড়ছি। আমার কাঁধে তার চিবুক, আমার গালে তার চুল স্পর্শ করছিল; সে স্পর্শে ফুলের কোমলতা, ফুলের গন্ধ ছিল; কিন্তু এই স্পর্শে আমার শরীর-মনে আগুণ ধরিয়ে দিলে।

ফরাসী বইখানির যা পড়ছিলুম তা হচ্ছে একটি কবিতা—

Puisque vous n´avez rien a´ me dire
Pourquoi venir aupres de moi
Pourquoi me faire ce sourire
Qui tournerait le tete ou roi."

এর মোটামুটি অর্থ এই—"যদি আমাকে তোমার বিশেষ কিছু বলবার না থাকে ত আমার কাছে এলেই বা কেন আর অমন করে হাসলেই বা কেন যাতে রাজারাজড়ারও মাথা ঘুরে যায়।"

আমি কি পড়ছি দেখে সুন্দরী ফিক্-করে হেসে উঠল। সে হাসির ঝাপ্‌টা আমার মুখে লাগল, আমি চোখে ঝাপসা দেখ্‌তে লাগলুম। আমার পড়া আর এগুলো না। ছোটছেলেতে যেমন কোন অন্যায় কাজ করতে ধরা পড়্‌লে শুধু হেলে-দোলে ব্যাঁকে-চোরে, অপ্রতিভভাবে এদিক ওদিক চায়, আর-কোনও কথা বল্‌তে পারে না, আমার অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল।

আমি বইখানি বন্ধ করে বৃদ্ধকে ডেকে তার দাম জিজ্ঞেস করলুম। সে বল্লে, এক শিলিং। আমি বুকের পকেট থেকে একটি মরোক্কোর পকেট-কেস বার করে দাম দিতে গিয়ে দেখি যে তার ভিতর আছে শুধু পাঁচটি গিনি;—একটিও সিলিং নেই। আমি এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে কোথায়ও একটি সিলিং পেলুম না।

এই সময়ে আমার নব-পরিচিতা নিজের পকেট থেকে একটি সিলিং বার করে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে আমাকে বল্‌লে—"তোমার আর গিনি ভাঙ্গাতে হবে না, ও-বইখানি আমি নেব।" আমি বল্লুম—"তা হবে না।" তাতে সে হেসে বল্‌লে—"আজ থাক্, আবার যেদিন দেখা হবে সেইদিনই তুমি টাকাটা আমাকে ফিরে দিয়ো।"

এরপরে আমরা দুজনেই বাইরে চলে এলুম। রাস্তায় এসেই আমার সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলে—"এখন তোমার বিশেষ-করে কোথায়ও যাবার আছে?" আমি বল্লুম—"না।"

—"তবে চলো Oxford circus পর্য্যন্ত আমাকে এগিয়ে দাও। লণ্ডনের রাস্তায় একা চল্‌তে হলে সুন্দরী স্ত্রীলোককে অনেক উপদ্রব সহ্য কর্‌তে হয়।"

এ প্রস্তাব শুনে আমার মনে হল, রমণীটি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস কল্লুম—"কেন?"

—"তার কারণ পুরুষমানুষ হচ্ছে বাঁদরের জাত। রাস্তায় যদি কোনও মেয়ে একা চলে, আর তার যদি রূপ যৌবন থাকে, তাহলে হাজার পুরুষের মধ্যে পাঁচশজন তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাবে, পঞ্চাশজন তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসবে, পাঁচজন গায়ে পড়ে আলাপ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে আর অন্ততঃ একজন এসে বল্‌বে, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

—"এই যদি আমাদের স্বভাব হয় ত কি ভরসায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছ?"

সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"তোমাকে আমি ভয় করিনে।"

—"কেন ?"

—"বাঁদর ছাড়া আর-এক জাতের পুরুষ আছে। তারা আমাদের রক্ষক।"

—"সে জাতটি কি ?"

—"যদি রাগ না করো ত বলি। কেননা কথাটা সত্য হলেও প্রিয় নয়।"

—"তুমি নিশ্চিন্তে বল্‌তে পারো—কেননা তোমার উপর রাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

—"সে হচ্ছে পোষা-কুকুরের জাত। এ জাতের পুরুষরা আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে, মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাকে, গায়ে হাত দিলে আনন্দে লেজ নাড়ায়, আর অপর-কোনও পুরুষ আমাদের কাছে আস্‌তে দেয় না। বাইরের-লোক দেখলেই প্রথমে গোঁ গোঁ করে, তারপর দাঁত বার করে, তাতেও যদি সে পিঠটান না দেয় তাহলে তাকে কামড়ায়।"

আমি কি উত্তর করব না ভেবে পেয়ে বল্লুম—"তোমার দেখছি আমার জাতের উপর ভক্তি খুব বেশি।"

সে আমার মুখের উপর তার চোখ রেখে উত্তর করলে—"ভক্তি না থাক, ভালবাসা আছে।" আমার মনে হল তার চোখ তার কথায় সায় দিচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা Oxford cricus-এর দিকে চলেছিলুম, কিন্তু বেশি-দূর অগ্রসর হতে পারি নি, কেননা দুজনেই খুব আস্তে হাঁটছিলুম।

তার শেষ-কথাগুলি শুনে আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম।

তারপর যা জিজ্ঞেস করলুম তার থেকে বুঝতে পারবে যে তখন আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কতটা লোপ পেয়েছিল।

আমি।—"তোমার সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হবে ?"

উত্তর এল—"কখনই না।"

—"এই যে একটু আগে বল্‌লে যে আবার যেদিন দেখা হবে..."

—"সে তুমি সিলিংটে নিতে ইতস্তত কর্‌ছিলে বলে।"

এই বলে সে আমার দিকে চাইলে। দেখি তার মুখে সেই-হাসি—যে-হাসির অর্থ আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারি নি।

আমি তখন নিশীথে-পাওয়া লোকের মত জ্ঞানহারা হয়ে চল্‌ছিলুম। তার সকল-কথা আমার কানে ঢুকলেও, মনে ঢুকছিল না।

তাই আমি তার হাসির উত্তরে বল্‌লুম—"তুমি না চাইতে পার কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চাই।"

—"কেন ? আমার সঙ্গে তোমার কোনও কাছ আছে ?"

—"শুধু দেখা-করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই!—আসল কথা এই যে, তোমাকে না-দেখে আমি আর থাকতে পারব না।"

—"এ-কথা যে-বইয়ে পড়েছ সেটি নাটক না নভেলে ?"

—"পরের বই থেকে বলছি নে, নিজের মন থেকে। যা বল্‌ছি তা সম্পূর্ণ সত্য।"

—"তোমার-বয়েসের লোক নিজের মন জানে না; মনের সত্য-মিথ্যে চিন্‌তেও সময় লাগে। ছোট ছেলের যেমন মিষ্টি দেখলেই খাবার লোভ হয়, বিশ-একুশ বৎসর বয়েসের বড় ছেলেদেরও তেমনি মেয়ে দেখ্‌লেই ভালবাসা হয়। ও সব হচ্ছে যৌবনের দুষ্টু ক্ষিধে।"

—"তুমি যা বলছ তা হয়ত সত্য। কিন্তু আমি জানি যে তুমি আমার কাছে আজ বসন্তের হাওয়ার মত এসেছ, আমার মনের মধ্যে আজ ফুল ফুটে উঠেছে।"

—"ও হচ্ছে যৌবনের season flower, দুদণ্ডেই ঝরে যায়—ও-ফুলে কোনও ফল ধরে না।"

—"যদি তাই হয় ত যে ফুল তুমি ফুটিয়েছ তার দিকে মুখ-ফেরাচ্ছ কেন? ওর প্রাণ দুদণ্ডের কি চিরদিনের তার পরিচয় শুধু ভবিষ্যতই দিতে পারে।"

এই কথা শুনে সে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। পাঁচমিনিট চুপ করে থেকে বল্‌লে—"তুমি কি ভাব্‌ছ যে তুমি পৃথিবীর পথে আমার পিছু-পিছু চিরকাল চল্‌তে পার্‌বে?"

—"আমার বিশ্বাস পার্‌ব।"

—"আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তা না জেনে?"

—"তোমার আলোই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

—"আমি যদি আলেয়া হই! তাহলে তুমি একদিন অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে শুধু কেঁদে বেড়াবে।"

আমার মনে এ কথার কোনও উত্তর জোগাল না। আমি নীরব হয়ে গেলুম দেখে সে বল্‌লে—"তোমার মুখে এমন-একটি সরলতার চেহারা আছে যে আমি বুঝতে পাচ্ছি যে তুমি এই-মুহূর্ত্তে তোমার মনের কথাই বল্‌ছ। সেই জন্যই আমি তোমার জীবন আমার সঙ্গে জড়াতে চাই নে। তাতে শুধু কষ্ট পাবে। যে কষ্ট আমি বহু লোককে দিয়েছি সে-কষ্ট আমি তোমাকে দিতে চাই নে;—প্রথমতঃ তুমি বিদেশী, তার পর তুমি নিতান্ত অর্ব্বাচীন।"

এতক্ষণে আমরা Oxford circus-এ এসে পৌঁছিলুম। আমি একটু উত্তেজিত ভাবে বল্‌লুম—"আমি নিজের মন দিয়ে জান্‌ছি যে তোমাকে হারানোর চাইতে আমার পক্ষে আর কিছু বেশি কষ্ট হতে পারে না। সুতরাং তুমি যদি আমাকে কষ্ট না দিতে চাও তাহলে বলো আবার কবে আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

সম্ভবতঃ আমার কথার ভিতর এমন একটা কাতরতা ছিল যা তা তার মন্‌কে স্পর্শ কর্‌লে। তার চোখের দিকে চেয়ে বুঝলুম যে তার মনে আমার প্রতি একটু মায়া জন্মেছে। সে বল্লে—"আচ্ছা তোমার কার্ড দাও, আমি তোমাকে চিঠি লিখব।"

আমি অমনি আমার পকেট-কেস থেকে একখানি কার্ড বার করে তার হাতে দিলুম। তারপর আমি তার কার্ড চাইলে সে উত্তর দিলে—"সঙ্গে নেই।" আমি তার নাম জানবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলুম, সে কিছুতেই তা বল্‌তে রাজি হল না। শেষটা অনেক কাকুতি-মিনতি কর্‌বার পর বল্‌লে—"তোমার একখানি কার্ড দাও তার গায়ে লিখে দিচ্ছি; কিন্তু তোমায় কথা দিতে হবে সাড়ে-ছটার আগে তুমি তা দেখ্‌বে না।"

তখন ছটা বেজে বিশ মিনিট। আমি দশ মিনিট ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে প্রতিশ্রুত হলুম। সে তখন আমার পকেট-কেসটি আমার হাত থেকে নিয়ে আমার দিকে পিঠ-ফিরিয়ে একখানি কার্ড বার করে তার উপর পেন্সিল দিয়ে কি লিখে আবার সেখানি পকেট-কেসের ভিতর রেখে কেসটি আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েই পাশে যে ক্যাবখানি দাঁড়িয়ে ছিল তার উপর লাফিয়ে উঠে সোজা মার্বেল আর্চের দিকে হাঁকাতে বল্‌লে। দেখতে-না-

দেখ্‌তে ক্যাবখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি Regent street-এ ঢুকে প্রথম যে restaurant চোখে পড়ল তার ভিতর প্রবেশ করে এক পাইণ্ট শ্যাম্পেন নিয়ে বসে গেলুম। মিনিটে মিনিটে ঘড়ি দেখ্‌তে লাগলুম। দশমিনিট দশঘণ্টা মনে হল। যেই সাড়ে-ছটা বাজা অমনি আমি পকেট-কেস খুলে যা দেখলুম তাতে আমার ভালবাসা আর শ্যাম্পেনের নেশা একসঙ্গে ছুটে গেল। দেখি কার্ডখানি রয়েছে, গিনি ক'টি নেই। কার্ডের উপর অতি সুন্দর স্ত্রীহস্তে এই-কটি কথা লেখা ছিল—

"পুরুষমানুষের ভালবাসার চাইতে তাদের টাকা আমার ঢের বেশি আবশ্যক। যদি তুমি আমার কখনও খোঁজ না করো তাহলেই যথার্থ বন্ধুত্বের পরিচয় দেবে।"

আমি অবশ্য তার খোঁজ নিজেও করিনি, পুলিশ-দিয়েও করাই নি। শুনে আশ্চর্য্য হবে সেদিন আমার মনে রাগ হয় নি, দুঃখ হয়েছিল, তাও আবার নিজের জন্য নয়, তার জন্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

*
* *

যে কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,—
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখি সম্মুখেই
দেখিনু সহস্রবার
দুয়ারে আমার।
অপরিচিতের এই চিরপরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে;
নদীর এপারে ঢালু তটে
চাষী করিতেছে চাষ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধ-জাগা নয়নের মত।

পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন আঁকা
চলেছে মাঠের ধারে—ফসল ক্ষেতের যেন মিতা—
নদী সাথে কুটীরের বহে কুটুম্বিতা।

৮ ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম ওই শূন্য মাঠ
ওই খেয়াঘাট
ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখি কাকলী-কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা—এই সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি।
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো, এই হাওয়া,
এইমত অস্ফুটধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ বেদনায় এ জীবন বারেবারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

পদ্মা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৮ই ফাল্গুন, ১৩২২

ছাত্রের পত্র

বিগত পৌষ-মাসের "সবুজ পত্রে" পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়দ্বয়ের যে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠে বঙ্গবাসীর বিশেষতঃ ছাত্র-সমাজের যুগপৎ আশা ও আনন্দ বাড়িয়া গিয়াছে, এ কথা বলা বাহুল্য। এত দিন ধরিয়া আমরা শিক্ষার ত্রুটির কথা শুনিয়া আসিতেছি; কত লোকে আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর উপর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছেন; কিন্তু কেহই নূতন পন্থা-নির্দ্দেশ করেন নাই। আজ যে বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক একত্র হইয়া শিক্ষার সুপথের দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে আমরা ধন্য হইয়াছি।

মাতৃভাষা, শিক্ষার রাজপথ না হইলেও প্রশস্ত পথ—এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; কিন্তু পূজনীয় শীলমহাশয় এমন দু'একটি কথা বলিয়াছেন যাহার উত্তরে দু-একটি কথা আমাদের পক্ষ হইতে বলা আবশ্যক। অধ্যাপক শীল মহাশয় লিখিয়াছেন—'অতি অল্প সংখ্যক পরীক্ষার্থী ইতিহাসের প্রশ্নের বাঙ্গলায় উত্তর দেয়।' এ কথা সত্য। কিন্তু ইহার কারণ কি? অভিভাবক ও স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের মাতৃভাষার প্রতি অনাস্থাই ইহার কারণ,—ছাত্রদের অভক্তি নহে। কর্ত্তৃপক্ষেরা এ বিষয়ে আমাদের উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, প্রতিবন্ধকতা করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহারা আবার বাংলায় চিঠিপত্র লেখাও পছন্দ করেন না। ইংরাজিতে

চিঠি না লেখায় আমি একবার পত্রের উত্তর পাই নাই; এবং তজ্জন্য বিশেষ ভৎর্সিতও হইয়াছিলাম। দোষ দিব কার? বিধি বাংলার প্রতি বাম। আধুনিক ছাত্র-সমাজের আর যাহাই দোষ থাকুক, দেশকে ও মাতৃভাষাকে তাহারা পূর্ব্বের মত বিদেশীর চক্ষে দেখে না। কিন্তু যেখানে গুরুজন প্রতিবন্ধক সেখানে উপায় কি? এ বিষয়ে শিক্ষার দরকার আমাদের যতখানি আমাদের কর্তৃপক্ষদেরও ততখানি বলিয়া মনে হয়; যাঁহারা আমাদের পরিচালনের ভার লইয়াছেন তাঁহারা যদি পথ না জানেন তবে আমাদের খাদে পড়িতে হইবে এবং পড়িয়াও আছি।

আমাদের আদর্শ—"লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।" এবং আমাদের সেই লেখাপড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর নির্ভর করে—শিক্ষার উপরে নহে। এ অবস্থায় কিসে ডিগ্রী সুলভ হয় সেই বিষয়ে সকলেরি লক্ষ্য।

আমার নিবেদন এই যে, আমরা যে বাংলায় প্রশ্নের উত্তর লিখিব সে বাংলার standard কি? 4th class হইতে আজ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসরের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ধন Chaste Bengali (চোস্ত বাংলা?) রূপ পদার্থটির কোন সন্ধান পাইলাম না।

১৯১৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা প্রশ্নপত্রে রবীন্দ্রনাথের পুস্তক হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল তাহা এই—"যেদিন লেখবার ঝোঁক চাপে সেদিন হঠাৎ এত ভাব মনের মধ্যে এ'সে প'ড়ে যে দিশাহারা হ'য়ে যেতে হয়। এক সাথে কোকিল, পাপিয়া, হাঁস সকলগুলি ডাকতে আরম্ভ করে, আর বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ ছুটে এসে পড়ে। কতক যদি বা বলা হয়

ত অনেক প'ড়ে থাকে। একটা একটুখানি মানুষের মন পেরে উঠবে কেন?" এই বাক্য কয়টি chaste and elegant Bengali-তে লিখিতে হইবে প্রশ্নপত্রে এরূপ লেখা ছিল। যদি রবীন্দ্রনাথের ভাষা standardনা হয় তবে বাংলা যে কোন্ ধরণের হইবে তা আমাদের মত ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

আর একটি কথা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক প্রশ্নপত্রের উপরে লেখা থাকে—Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

বাঙ্গলার সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমাদের হাতে সংশোধিত হইয়া কেমন করিয়া Chaste and elegant Bengali হইবে এ রহস্য আমি বুঝিতে পারি না। 'প'ড়ে', 'এ'সে' এগুলিকে 'পড়িয়া' বা 'আসিয়া' লিখিলে যে elegant হইবে এ ধারণা যে আমার নাই তাহা আমি স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করি না।

বিশ্ববিদ্যালয় যদি আমাদের নিকট সংস্কৃত ভাষা চাহেন আমরা তাহাও লিখিতে পারি কিন্তু পূজ্যপাদ সাহিত্যরথীর ভাষাকে চোস্ত (?) করিতে আমরা অসমর্থ। লজ্জার বিষয় এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে রবীন্দ্রনাথের রচনার উপর স্কুলের ছাত্রদের হস্তক্ষেপ করিতে আদেশ করা হয়। ইংরাজি সাহিত্যের সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন Bentley ও Addison Milton-এর উপর কি মূর্খতার অত্যাচার করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার বিশ্ববিদ্যালয় যে ছাত্র-সমাজের উপর সেই কবি-পীড়নের ভার দিতেছেন ইহা দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠে।

সকলেই জানেন আমরা কলেজে পড়ি পাশ করিবার জন্য; শিক্ষালাভ আমাদের গৌণ উদ্দেশ্য। কাজেকাজেই পরীক্ষকবর্গের মনস্তুষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে আমরা কাটিয়া ছাঁটিয়া মাজিয়া ঘষিয়া সভ্যভব্য করিয়া তুলিতে বাধ্য হই। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক লাঞ্ছিত হন, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে মাতৃভাষায় কতদূর ব্যুৎপন্ন হইয়া ওঠে তা বলা বাহুল্য। সত্য কথা এই যে, আমাদের স্কুল কলেজে বাঙ্গলা শিক্ষা দিবার Form বজায় আছে—কিন্তু কাজে কিছুই হয় না।

শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

নামশূন্যা কন্যা

ছ' মাসের [illegible] কন্যা ! নাই তোর নামের বড়াই !
এক-রত্তি শিশিরের কণা হেরি কামিনী-কোরকে ;
এক-রত্তি জোনাকীর আলো হেরি যামিনী-অলকে !
রাঙা আনারের দানা, লিচু ও খেজুর-পানে চাই,
লুব্ধ নেত্রে, তাহাদের তনুতে তুলনা যদি পাই !
এক-রত্তি মুক্তা হেরি, অতি ক্ষুদ্র পরীর নোলকে,—
এইরূপে সারা-বিশ্বে ভ্রমে ভ্রমি অশ্রান্ত পুলকে,
ক্লান্ত আঁখি বলে শেষে 'কন্যার তুলনা বুঝি নাই' !
কোলে ল'য়ে দিদিরা কতই হাসে, আঁখি অনিমিক্,
বলে তারা "মোদের পুতুল সম তুই মনোরম।"
মৌলিক রসিক শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র খোকা,—কবি অনুপম,
বলে হেসে তাড়াতাড়ি "খুকি লাল লোজেঞ্জেস্ ঠিক্ !"
গৃহিণীরা হাসি বলে "কন্যা তুই পেয়ারার জেলি।"
বিস্মিতা উপমা কিন্তু ঘাড় নাড়ে, মুগ্ধ আঁখি মেলি !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

BOUND BY BOSE &
88, Girish Mukherjee Road
BHOWANIPORE
3. 6. 66.